বিশ্ব রাজনীতির ধারা

(প্রথম প্রবাহ)

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রকাশক
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি, এস, সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬

মহালয়া, ১৩৫৭

মূল্য—চার টাকা

মুদ্রাকর—
শ্রীপরাণচন্দ্র ঘোষ
পরাণ প্রেস
৫৭-২ কেশব সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

—গ্রন্থকারের নিবেদন—

বিশ্ব রাজনীতি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব সম্পন্ন ঘটনা সমূহের উপর লিখিত এই প্রবন্ধগুলি আনন্দবাজার পত্রিকার রবি বাসরীয় সংখ্যায় ও ঢাকা হইতে প্রকাশিত "সোনার বাংলা" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি আলোচনার জন্য 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় 'বিশ্ব রাজনীতির ধারা' শীর্ষক একটি বিশেষ স্তম্ভ নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাই তদ্বিষয়ক প্রবন্ধ সম্বলিত এই গ্রন্থখানিকে ওই নামেই অভিহিত করিলাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকাল হইতে কোরিয়া সংগ্রামের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত সংঘটিত আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রায় প্রতিটি ঘটনাই প্রবন্ধগুলিতে আলোচিত হইয়াছে। বিশ্ব রাজনীতির ধারা কোরিয়া যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া এক নূতন প্রণালিপথে মোড় ফিরিতে উদ্যত হইয়াছে, সে ধারার প্রথম প্রবাহ তাই এইখানে আসিয়াই স্তব্ধ হইল ; ইচ্ছা রহিল' অতঃপর নূতনখাতে প্রবাহিত পরবর্তী ধারার যথারীতি অনুবর্ত্তন করিব। ইতি—

কলিকাতা
৮-১০-৫০

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

বইখানির নাম 'বিশ্ব রাজনীতির ধারা' কিন্তু বইয়ের ভিতরে ভুল ক্রমে 'বিশ্ব রাজনীতি ধারা' ছাপা হইয়াছে। অনবধানতাজনিত এই ভুলের জন্য আমরা পাঠকবর্গের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। ইতি—

প্রকাশক

বিশ্ব রাজনীতির ধারা

ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনের ধারা

স্বাধীনতা যদি জাতি মাত্রেরই জন্মগত অধিকার হয়, তাহা হইলে পরশাসনের কবল হইতে বিপ্লবের সাহায্যে হৃত-স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের দাবীও তাহার সহজাত। সেই সহজ ও স্বাভাবিক দাবীর উপরে ভিত্তি করিয়াই ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলন গড়িয়া উঠে, তাহার প্রাণ-শক্তির প্রবহমান ধারা বেগও বিস্তৃতিলাভ করে এবং শাসকশক্তির কঠোরতম প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করিয়া অভীষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে অদম্য বেগে ধাবিত হয়।

ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ অবধি অসংখ্য মনীষার অশ্রান্ত ধারা যে সংগীত গাহিয়া গেলেন, রাজনীতিক্ষেত্রে উত্তর-সাধকরূপে তাহারই সুরে সাড়া দিয়া উঠিলেন সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, গোপালকৃষ্ণ, গোখেল, লালা লাজপৎ রায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ : অধঃপতিত জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ধর্ম ও রাজনীতি আসিয়া পরস্পরের কর ধারণ করিল। এক সম্প্রদায় সচেষ্ট হইলেন জাতির চিত্তে ধর্ম ও সংস্কৃতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা সঞ্চারিত করিতে, অপর সম্প্রদায় উদ্যোগী হইলেন বৈদেশিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থারবিপক্ষে দণ্ডায়মান

হইবার সাহস ও শক্তি জাগ্রত করিবার জন্য : উভয়পক্ষেতে যথা পক্ষিগণ চলে, ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাও তেমনি এই পক্ষদ্বয়ের উপর ভর করিয়া অসীম শূন্যে পাড়ি জমাইল।

পরবর্তীকালে—প্রত্যাসন্ন পববর্তীকালে সমগ্র ভারতকে বেষ্টন করিয়া বিপ্লববহ্নির যে বেড়াজাল রচিত হইবে—তাহার প্রথম যজ্ঞক্ষেত্র রচিত হইল শিবাজীর মহারাষ্ট্রের মাটিতে, তাহার প্রথম যজ্ঞানল প্রজ্বলিত করিবার পরম সৌভাগ্য অর্জন করিলেন শিবাজী বংশধর মারাঠি যুবকগণ। ভারতীয় বিপ্লব ইতিহাসে 'চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়' নামে পরিচিত দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার নামক দুই তরুণ মারাঠী যুবক মারাঠী যুবশক্তিকে দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের সুযোগ্য সৈনিকরূপে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ১৮৯৪ সালে পুণায় যে প্রতিষ্ঠান গঠন করেন—ভারতের ভাবী বিপ্লব আন্দোলনেব তাহাই প্রথম শক্তিকেন্দ্র! গোপন ও প্রকাশ্য—এই দ্বিবিধ কর্মপন্থা সম্মুখে রাখিয়া 'চাপেকার সঙ্ঘ' তাহার জীবনের পথে চলা সুরু করে। তাহার লক্ষ্য স্বাধীনতা এবং আদর্শ শিবাজী; সঙ্ঘের সদস্যবৃন্দ শিবাজী জীবনী হইতেই স্বাধীনতার প্রেরণা আহরণ করিতেন ও তাহা অর্জন করিবার সাহস ও শক্তি সংগ্রহ করিতেন। জনসাধারণকে স্বাধীনতার উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে 'চাপেকার সঙ্ঘ' ১৮৯৭ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন এবং সে উৎসবের উন্মাদনায় মারাঠী মনের নিরুদ্ধ আবেগ সহসা সংযম মুক্ত হইয়া বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মত বিপুল বেগে প্রবাহিত হইল। বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার 'কেশরী' পত্রিকায় 'চাপেকার সঙ্ঘে'র এই প্রবর্তনার উদ্দেশ্যে সস্নেহ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিলেন—স্বরচিত এক বীরত্বব্যাঞ্জক কবিতার মাধ্যমে। বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হইবার জন্য মারাঠী যুবশক্তির মানসিক প্রকৃতির সকল দিক দিয়া সম্পূর্ণ, এখন প্রয়োজন

শুধু শাসকশক্তির প্রতিরোধের সহিত তাহার সেই প্রথম সঙ্ঘাতের—যাহার আঘাতে বহ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইয়া অসন্তোষের বারুদস্তূপ স্পর্শ করিবে। ১৮৯৭ সালে পুণায় প্লেগের প্রকোপ উপলক্ষ করিয়া সরকারী কর্মচারীগণের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা ও নিপীড়ন সে সুযোগ অতি সত্বর আনয়ন করিল: প্লেগনিরোধ প্রচেষ্টার অজুহাতে সরকারী কর্মচারীগণ নাগরিকদিগকে যথেচ্ছভাবে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন এবং তাহারা বহিষ্কৃত হইবার পর সুরু হইল গৃহস্থের সর্বস্ব লুণ্ঠন; গৃহহারা ও আশ্রয়হীন নাগরিকগণ কিছুকাল পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের পরিত্যক্ত যথাসর্বস্ব নিঃশেষে লুণ্ঠিত হইয়াছে; ফলে প্লেগের মহামারী অপেক্ষা প্লেগ নিরোধকারী সরকারী কর্মচারিগণের দৌরাত্ম্য নাগরিকগণের পক্ষে অধিকতর ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিল। 'চাপেকার সঙ্ঘের' পক্ষে এই ব্যাপার নীরবে প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর হইল না: প্লেগ নিবারণ প্রচেষ্টার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মিঃ র‍্যাণ্ড দামোদর চাপেকারের হস্তে নিহত হইলেন, তাঁহার সঙ্গী লেফ্‌টন্যাণ্ট আয়ার্ষ্ট ও আততায়ীর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া দামোদর চাপেকারের প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদত্ত হইল। চাপেকার-সঙ্ঘ দামোদর চাপেকারের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। অনতিকাল মধ্যে পুণার প্রধান পুলিশ কর্মচারী আক্রান্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে সে আক্রমণ ব্যর্থ হইয়া যায়; কিন্তু যে দুইজন লোক দামোদর চাপেকারকে ধরাইয়া দিবার কার্যে পুলিশকে সাহায্য করে, 'চাপেকার সঙ্ঘের' হস্তে জীবনদান করিয়া তাহাদিগকে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। সরকার পক্ষ সেই অপরাধে সঙ্ঘের চারিজন সদস্যকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন এবং পঞ্চম ব্যক্তির প্রতি দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইল। এদিকে বালগঙ্গাধর তিলক কিন্তু

বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার বিভীষিকায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, তাঁহার কেশরী পত্রিকার মাধ্যমে জ্বলন্ত দেশপ্রেমের অগ্নিময় বাণী চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়াছেন। সন্ত্রাসবাদী সঙ্ঘের আকস্মিক আবির্ভাবে গবর্ণমেণ্ট স্বতঃই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিলকের নির্ভীক লেখনীকে তাই প্রীতির চক্ষে তাঁহারা দেখিতে পারিলেন না : বালগঙ্গাধর তিলকের বিরুদ্ধে অচিরে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনীত হইল, ফলে ১৮৯৭ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখে তিনি দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। মারাঠী বিপ্লব আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত প্রথম পর্যায়েব যবনিকাপাত হইল এইখানে।

মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক আন্দোলনের পরবর্ত্তী পর্যায় এবং বাঙ্গলার বিপ্লবী সংগঠনের সূত্রপাত সমসাময়িক। ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র যখন ১৯০১।২ সালে বাঙ্গলায় 'অনুশীলন সমিতি' গঠন করিতেছেন, মহারাষ্ট্রে বিনায়ক সাভারকার ঠিক সেই সময়েই 'মিত্র মেলার' ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন। প্রথমে বাঙ্গলার কথাই বলি :—ব্যারিষ্টার পি মিত্র অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন-তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া। দৈহিক, মানসিক ও অধ্যাত্মিক—এই ত্রিবিধ উন্নতির সাহায্যেই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভবপর এবং সে বিকাশ সার্থক করিতে হইবে এমন উপায়ে—যাহাতে কোন একটি বৃত্তির সমধিক প্রসারে অপর বৃত্তির সমুচিত প্রসার বাধাপ্রাপ্ত না হয়—ইহাই হইল অনুশীলনতত্ত্বের সার শিক্ষা। বাংলার যুব-শক্তিকে এই শিক্ষায় ও সাধনায় গড়িয়া তুলিবার সুমহান ব্রত লইয়াই অনুশীলন সমিতির উদ্ভব। তাই দেহচর্চ্চার জন্য একদিকে যেমন দেশময় গড়িয়া উঠিল বহুসংখ্যক ব্যায়ামাগার এবং ছোরা ও লাঠি খেলিবার আখড়া, অপরদিকে মানসিক অনুশীলনের জন্য তাহারই পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিল অসংখ্য পাঠাগার, আর আধ্যাত্মিক অনুশীলনের নিমিত্ত শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন, ধ্যান-

ধারণা-প্রত্যাহার ও প্রাণায়াম সমিতির সদস্য-মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সমিতির প্রতিষ্ঠাতা একথা অন্তর দিয়াই বিশ্বাস করিতেন যে, পরাধীন জাতির সাধনা নাই, শিক্ষা নাই, ধর্ম নাই, আধ্যাত্মিকতা নাই, ইহকাল নাই, পরকাল নাই; কাজেই সমিতির প্রবণতা যে স্বাধীনতা অর্জনের অভিমুখে সমধিক প্রধাবিত হইবে—ইহা খুবই স্বাভাবিক; ফলে স্বাধীনতা অর্জনই হইল ত্রিবিধ অনুশীলনের মূল লক্ষ্য, ত্রিবিধ সাধনার মুখ্য সিদ্ধি, অনুশীলনত্রয়ের যুক্তবেণীর পবিত্র সঙ্গমতীরে রচিত হইল স্বাধীনতার স্বপ্ন-তীর্থ।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে এবং শ্রীসতীশচন্দ্র বসুর সম্পাদকতায় কলিকাতায় যে অনুশীলন সমিতির প্রথম প্রতিষ্ঠা, দেখিতে দেখিতে শত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া তাহা সমগ্র বাংলা দেশ ছাইয়া ফেলিল। শ্রীঅরবিন্দ এই সময়ে বরোদায় অবস্থান করিতেছিলেন, তথাপি বাংলার এই নূতন কর্মোদ্যম তাঁহার দৃষ্টি এড়াইল না, সদ্যগঠিত অনুশীলন সমিতির সহিত সংস্পর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একখানি পত্রসহ কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন; অনতিকাল মধ্যে বারীন্দ্রকুমারও বরোদা হইতে কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইলেন এবং উভয়ে মিলিয়া রাজনৈতিক চিন্তা ও চর্চ্চার উদ্দেশ্যে পাঠাগার স্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন। অল্পকাল মধ্যে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ সমগ্র উত্তরবঙ্গে বিস্তৃতি লাভ করিল। তখন পর্যন্ত স্বতন্ত্র দল হিসাবে যুগান্তর পার্টি জন্মলাভ করে নাই। তখন পর্যন্ত ব্যারিষ্টার পি মিত্রই সমষ্টিগতভাবে সমগ্র সঙ্ঘের সর্বাধিনায়করূপে গণ্য হইতেন। উভয় অংশের মিলিত প্রচেষ্টায় সমিতির অসংখ্য শাখা প্রতিষ্ঠানে বাংলার বিভিন্ন জেলা আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং সেই সব প্রতিষ্ঠান একদিকে যেমন পাঠাগারগুলির সাহায্যে দেশের যুবসমাজকে ভারতের অতীত বীর্যবত্তার কীর্ত্তি কাহিনীর দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে লাগিল, বিশ্বের

বিভিন্ন দেশের বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা ও ভাবধারার সহিত ঘনিষ্ট পরিচয় স্থাপন করিতে লাগিল ; অপরদিকে ব্যায়াম সমিতিগুলির মাধ্যমে লাঠি, ছোরা ও তরবারি চালনায় পারদর্শিতা দানে প্রয়াসী হইল। শুধু তাহাই নয় কৃত্রিম যুদ্ধের আযোজন দ্বারা সে পারদর্শিতার মান যাচাই হইতে লাগিল।

ভাবী বিপ্লবকেন্দ্রে পরিণত হইবার সমূহ সম্ভাবনাপূর্ণ সমিতির এই শাখা প্রতিষ্ঠানগুলি যখন উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া আছে, এমন সময় সরকারী অবিমৃষ্যকারিতা ও অদূরদর্শিতা অতি সত্বর প্রত্যাশিত সে মহেন্দ্রক্ষণ তাহাদের সম্মুখে আনিয়া সমুপস্থিত করিল এবং সে সুযোগ সমাগত হইল বঙ্গ-ভঙ্গের রূপ পরিগ্রহ করিয়া। বাংলাদেশ পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে দ্বিধাবিভক্ত করিবার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইল ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে এবং সেই মুহূর্তে সুরু হইয়া গেল শাসক শক্তির বিরুদ্ধ ইচ্ছার সহিত জাগ্রত গণ-দাবীর সেই প্রত্যক্ষ সংঘাত—যাহার ফলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চিত অসন্তোষের বহ্নিস্তূপ স্পর্শ করিবে এবং অচিরকাল মধ্যে জ্বালাইয়া তুলিবে দেশব্যাপী বিপ্লব-বহ্নির অগ্নি-মেখলা। অখণ্ড বাংলার সমগ্র সত্তা এই উদ্ধত সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল ; সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ দেশবরেণ্য নেতা ও বিশ্ববিখ্যাত বাগ্মিগণ সে বিদ্রোহের বাণী বহন করিয়া লইয়া চলিলেন দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত অবধি, তাঁহাদের যুগ্মকণ্ঠের যুগ-শঙ্খে ধ্বনিয়া উঠিল সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান। তাঁহাদের প্রচার ও পরিচালনার কল্যাণে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অচিরে নিখিল ভারতীয় প্রশ্নরূপে পরিগণিত হইয়া উঠিল। জাতির ভাবোদ্বেল অন্তর যখন আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য, আপনার আশা ও আকাঙ্খার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি প্রদানের জন্য বাণী খুজিয়া মরিতেছে, সেই মুহূর্তে কে যেন তাহার কর্ণকুহরে মাতৃমন্ত্র গুঞ্জরণ করিল : বন্দে মাতরম! সার্দ্ধ

শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার তলে জাতীয় অন্তরে যে আবেগ এতদিন নিরুদ্ধ ছিল, সহসা তাহার অঙ্গে অঙ্গে জাগিয়া উঠিল নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের নৃত্য ছন্দের আনন্দ হিল্লোল : জনতার কণ্ঠে জাগিয়া উঠিল তাহারই প্রতিধ্বনি, কবি ও কথকের কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল তাহারই সুরমূর্চ্ছনা। শাসক শক্তির সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হইবার চিন্তা যদিও তখন কংগ্রেসের কল্পনাতীত, তথাপি এই জটিল জাতীয় সমস্যা, এই বিরাট জাতীয় জাগরণ সম্পর্কে নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হইল না। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সরকারী সিদ্ধান্ত ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে জনমতের চাপে পড়িয়া কংগ্রেসকে ১৯০৬ সালের কলিকাতা অধিবেশনে বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে সে আন্দোলন দ্বিধারায় প্রবাহিত হইয়া সমগ্র দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিল : একদিকে ধ্বংসাত্মক ধারায় জ্বলিয়া উঠিল বিলাতী বস্ত্র ও বস্তুর দেশব্যাপী বহ্ন্যুৎসব এবং অপর দিকে সৃজনের স্রোতে ফুটিয়া উঠিল জাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিচিত্র প্রসূন। গভর্ণমেণ্ট আন্দোলন দমিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের সমগ্র শক্তি লইয়া রাজপথে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সুরু হইল সভা ও শোভাযাত্রার উপরে সরকারী পুলিশের নির্বিচার আক্রমণ; বাংলার ছাত্র ও যুবশক্তি রাজরোষের সে রুদ্র আঘাত মাথা পাতিয়া লইল, জনতার রক্তে বাংলার রাজপথ রাঙ্গিয়া উঠিল।

সরকারী শাসন-পীড়নের পৈশাচিক তাণ্ডব সমিতির জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল : সমিতির নেতৃবর্গ দেখিলেন, জাতীয় আশা-আকাঙ্খা যেখানে শাসক-শক্তির হৃদয়হীন উপেক্ষায় এইভাবে আহত, গভর্ণমেণ্ট যেখানে তাঁহাদের অসঙ্গত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিধিসম্মত প্রতিবাদ স্বীকার করিতেও সম্মত নহেন এবং তাহা জ্ঞাপন করিতে গেলে সেখানে নিরীহ শিশু-নারী-বৃদ্ধ পর্যন্ত পুলিশী আক্রমণের আঘাত হইতে নিষ্কৃতি পায় না—সেখানে নিয়মানুগ আন্দোলন পরিচালনের মূল্য ও

মর্য্যাদা কতটুকু। সমিতির প্রকাশ্য কর্মতৎপরতা সেই মুহূর্তে বৈপ্লবিক গোপন সুরঙ্গ পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। সে পথ সুরু হইতে অনুসরণ করিবার নিমিত্ত আমরা পুনরায় ১৯০৩ সালে প্রত্যাবর্তন করি: তৎকালীন অনুশীলন সমিতির সহিত যুক্ত রহিয়াও বারীন্দ্রকুমার গুপ্ত-সমিতি গঠনের পথ সন্ধান করিতে থাকেন তখন হইতেই যতীন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সক্রিয় সহযোগিতায় সে দিক দিয়া কিছুটা পরিমাণ সাফল্যও অর্জন করেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও শ্রীঅরবিন্দের বাংলায় আগমনের পূর্বে দলকে দৃঢ় ও প্রশস্ত ভিত্তির উপর স্থাপন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। যে যুগান্তর পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া পরবর্তী-কালে যুগান্তর নামক স্বতন্ত্র বিপ্লবী দলের উদ্ভব হয়, তাহা প্রথম আত্ম-প্রকাশ করিল '৯০৬ সালের মার্চ মাসে। এখন হইতেই 'সন্ধ্যা' ও "যুগান্তর" হইল বাংলার বৈপ্লবিক ভাবধারার যুগ্ম বাহন এবং 'বন্দে মাতরম্' হইল কংগ্রেসের চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী অংশের মুখপত্র। ইতিমধ্যে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ বরোদার রাজপদ ত্যাগ করিয়া বাংলায় আসিয়া দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার আগমন সাধারণভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং বিশেষভাবে বিপ্লবী সমাজে চাঞ্চল্য জাগাইল; বারীন্দ্রকুমার তাঁহার বৈপ্লবিক গোপন সঙ্ঘ গঠনের অসমাপ্ত পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করিবার কার্যে এতদিনে একান্তভাবে মনোনিবেশ করিলেন। মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র দাস বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিবার নিমিত্ত ফ্রান্সে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু বাংলার বিপ্লবী সমাজ তখন অসহিষ্ণু, হেমচন্দ্র দাসের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় নিষ্ক্রিয় বসিয়া থাকা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। বিজ্ঞানের ছাত্ররূপে উল্লাসকর দত্ত সে দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, সুরু হইল বিস্ফোরক দ্রব্য লইয়া রাসায়নিক গবেষণা।

বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানরূপে যুগান্তর দল যখন আপনাকে সযত্ন

আয়াসে সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিতেছে, অনুশীলন সমিতি তখন কিন্তু নিশ্চিন্তে বসিয়া নাই। ব্যারিষ্টার পি মিত্র স্বয়ং ঢাকা গিয়া তথায় অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাকার্য স্বহস্তে সম্পন্ন করেন এবং সঙ্ঘের পরিপূর্ণ দায়িত্ব ও নেতৃত্ব ন্যস্ত করিয়া আসেন শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাসের হাতে। অত্যল্প-কালের মধ্যে ঢাকা সমিতিকে অদম্য কর্ম-প্রেরণায় পাইয়া বসিল এবং তাহারই তাড়নায় কশাহত হইয়া সে ক্ষিপ্র-গতিতে ছুটিয়া চলিল অভীষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে। সমিতির ব্যায়াম-কেন্দ্র, পাঠাগার এবং সেবা ও সৎকার প্রতিষ্ঠান ছাত্র ও যুবকগণকে দলে দলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সমিতির শাখা প্রশাখা সমগ্র পূর্ববঙ্গ অচির কাল মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া উত্তরবঙ্গ অভিমুখে বাহু প্রসারণ করিল। এই কারণে অত্যন্ত সঙ্গত ও স্বাভাবিক ভাবেই অনুশীলন সমিতির ভাঁরকেন্দ্র কলিকাতা হইতে স্থানচ্যুত হইয়া, ঢাকায় গিয়া তাহার স্বাভাবিক স্থৈর্য ফিরিয়া পাইল।

দুইটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের কর্মিবৃন্দ কর্ম-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার অধীর আগ্রহে অসহিষ্ণু রণতুরঙ্গের মত মুহুর্মুহু মৃত্তিকায় পদাঘাত করিতেছে। এখন প্রয়োজন শুধু উপলক্ষের এবং সে উপলক্ষ উপস্থিত হইতে বড বিলম্ব হইল না। বিপ্লবীদল কর্তৃক প্রথম বলিরূপে নির্বাচিত হইলেন কলিকাতার তদানীন্তন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ড। সন্ধ্যা সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও বন্দে মাতরম সম্পাদকরূপে শ্রীঅরবিন্দ রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া এই ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতেই আসামীরূপে দণ্ডায়মান হন; এই মিঃ কিংসফোর্ডই বিচারকরূপে সুশীল সেন নামক পঞ্চদশ বর্ষীয় এক তরুণ যুবককে আক্রমণকারী জনৈক পুলিশ ইনস্পেক্টারকে প্রহার করিবার অভিযোগে পনর ঘা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মিঃ কিংসফোর্ড যদিও ১৯০৮ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে কলিকাতা হইতে মজঃফরপুরে বদলি

হইয়া গেলেন, মুরারীপুকুরের বিপ্লব-কেন্দ্র কিন্তু তথাপি তাহাকে বিস্মৃত হইতে পারিল না : কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার জন্য ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে প্রেরিত হইলেন। মিঃ কিংসফোর্ডের সৌভাগ্যবশতঃ ভ্রমক্রমে কেনেডি পত্নী ও কন্যা নিহত হইলেন। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করিয়া পুলিশের হস্তে আত্ম-সমর্পণের হাত হইতে মুক্ত হইলেন। ক্ষুদিরাম ফাঁসীর মঞ্চে আত্মদান করিলেন।

মজঃফরপুরে বোমা বিদারণ শব্দে সহসা সরকারের চমক ভাঙ্গিল; সেই মুহূর্তে তাঁহাদের সমগ্র মনোযোগ ধাবিত হইল মুরারীপুকুরের উদ্যান অভিমুখে। তল্লাসীর ফলে তথায় কিছুই পাওয়া গেল না বটে, তবে ১৯০৮ সালে ২রা মে তারিখে সন্ধানসূত্রে আলিপুরে আবিষ্কৃত হইল বোমা প্রস্তুতের কারখানা। সরকারের শঙ্কিত দৃষ্টির সম্মুখে সেই ক্ষণে ফুটিয়া উঠিল সমূহ বিপদ সম্ভাবনাপূর্ণ এক আসন্ন ভাবীকাল। মুরারীপুকুর-সংশ্লিষ্ট যে সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও বিশিষ্ট কর্মিবৃন্দ এইসূত্রে ধৃত হইলেন, গবর্ণমেণ্ট আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা ও মাণিকতলা বোমার মামলা নামক দুইটি মামলা দায়ের করিয়া তাঁহাদিগকে আসামীরূপে উভয় মামলার মধ্যে বণ্টন করিয়া লইলেন। নরেন্দ্র গোস্বামী, আশুতোষ বিশ্বাস, সামসুল আলাম প্রভৃতি সরকারী চর ও বিশ্বাসঘাতকের দল বিপ্লবীর আক্রমণে প্রাণ হারাইল, অপর দিকে তেমনি সত্যেন কানাই প্রভৃতি বিপ্লবী ফাঁসীর মঞ্চে আত্মদান করিয়া শহীদের অমরতা অর্জন করিলেন।

দুই-দুইটি ষড়যন্ত্র মামলা ও তজ্জনিত ফাঁসী ও হত্যাকাণ্ডের দাপটে খাস কলিকাতা মহানগরী যখন সরগরম, অনুশীলন সমিতির কর্মতৎপরতায় তখন ঢাকা, ফরিদপুর এমন কি সমগ্র পূর্ববঙ্গ প্রকম্পিত। ১৯০৮ সালের ২রা জুন তারিখে ঢাকা মাণিকগঞ্জের বাররা গ্রামে শশী সরকারের বাড়ীতে যে দুঃসাহসিক ডাকাতি সংঘটিত হয়, তাহার ফলে গোয়েন্দা

বিভাগের দৃষ্টি ও মনোযোগ কলিকাতা হইতে ঢাকায় বিক্ষিপ্ত না হইয়া পারে নাই। এই ঘটনার পরে স্বল্প ব্যবধান সময়ের মধ্যে নরিয়া, রাজেন্দ্রপুর, মোহনপুর, রাজনগর প্রভৃতি স্থানে উপর্য্যুপরি অনেকগুলি ডাকাতি ঘটিয়া গেল, অবশ্য তাহারই মাঝে মাঝে দলীয় বিশ্বাসঘাতক এবং পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্ম্মচারীদিগের হত্যাকাণ্ড বিচ্ছিন্ন ঘটনা পরম্পরার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিয়া চলিল। গভর্ণমেণ্ট এই বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলিকে গ্রথিত করিয়া ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা রচনা করিলেন। মামলায় পুলিন দাস প্রমুখ সমিতির বহু বিশিষ্ট সদস্য বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। কিন্তু নেতাহীন সমিতি নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া নাই এবং বসিয়া যে ছিল না তাহা প্রমাণিত হইল বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার দ্বারা। ১৯১০ হইতে ১৯১২ সালের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত চৌদ্দটি ডাকাতির অভিযোগের উপর ভিত্তি করিয়া গভর্ণমেণ্ট এই ষড়যন্ত্র মামলা গঠন করিলেন এবং সে মামলায় ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী (মহারাজ), মদন ভৌমিক, প্রতুল গাঙ্গুলি ও রমেশ চৌধুরী প্রমুখ বারজন আসামী বিভিন্ন মেয়াদের কারা ও নির্ব্বাসন দণ্ডিত হইলেন। এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে উল্লিখিত ডাকাতি ছাড়াও কয়েকটি হত্যার অভিযোগও বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার অঙ্গীভূত ছিল। সরকার রচিত ষড়যন্ত্রজালের প্রসার ও পরিধির তুলনায় অভিযোগ ও অভিযুক্ত আসামীর সংখ্যা এত অধিক যে সমগ্র ব্যাপারটিকে একটি মাত্র মামলার আমলে আনিতে না পারিয়া আর একটি অতিরিক্ত মামলা দায়ের করিলেন এবং বরিশাল ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত মূল ও অতিরিক্ত উভয় মামলার সাহায্যে পরিচিত ও অপরিচিত বহু বিপ্লবী কর্ম্মীকে কারারুদ্ধ করিয়া ভাবিলেন, সমিতির বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার সম্ভবতঃ এইখানেই যবনিকাপাত হইল।

কিন্তু তাহা যে হইল না—সমিতির অব্যবহিত বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়া দিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঢাকা

অনুশীলন সমিতি অত্যল্প সময়ের মধ্যে বেগ ও ব্যাপ্তির দিক দিয়া বিপুল আয়তন লাভ করে, তাহার ফলে কলিকাতা সমিতির ভারকেন্দ্র অতি সত্বর ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ১৯১২ সালের গোড়ার দিকে কর্মতৎপরতার ধারা পুনরায় উজান বহিবার উপক্রম করিল। তাহার হেতু সম্ভবতঃ ত্রিবিধঃ বৈপ্লবিক ও গোয়েন্দা বিভাগীয় কর্মতৎপরতার ঘাত প্রতিঘাতের ফলে পূর্ববঙ্গের আবহাওয়া এমন উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, বিপ্লবী কর্মিগণের পক্ষে তথায় নিরাপদ অবস্থান অসম্ভব; দ্বিতীয়তঃ, সমিতির প্রসার ও প্রতিপত্তি এমন বিপুল আয়তন লাভ করিয়াছে যে, তাহা ধারণের পক্ষে পূর্ববঙ্গ আর পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রশস্ত ক্ষেত্র নয় এবং তৃতীয়তঃ বহির্ভারতীয় তথা বহির্বঙ্গীয় যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইলে কলিকাতা মহানগরীর মাধ্যম ব্যতীত তাহা সম্ভব নয়। অমৃত হাজরার পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালনাধীনে ১৯১২ সালের প্রথম দিকে কলিকাতা রাজাবাজারে একটি বোমার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইল। কলিকাতা সহসা কর্মমুখর হইয়া উঠিলঃ উপর্যুপরি কয়েকজন পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মচারী কলিকাতার রাজপথে আক্রান্ত ও নিহত হইলেন। এতদ্ব্যতীত মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, দিল্লী এবং লাহোর প্রভৃতি স্থানে দ্রুত পরম্পরায় বোমা বিস্ফারিত হইতে লাগিল। গোয়েন্দা বিভাগ সচকিত ও সক্রিয় হইয়া উঠিয়া এই সব কর্মতৎপরতার উৎস সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল এবং সূত্র অনুসরণ করিতে করিতে একদা সহসা আসিয়া উপস্থিত হইল রাজাবাজারের বোমার কারখানায়। সেখানে যেসব প্রস্তুত বোমা ও বোমার খোল পাওয়া গেল, রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল যে, দিল্লী-লাহোর প্রভৃতি স্থানে বিস্ফোরিত বোমা হইতে তাহা অভিন্ন। সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ প্রমাদ গণিলেনঃ শক্তিশালী বোমা অবশ্যই বিভীষিকার বস্তু, কিন্তু তাঁহাদিগকে তদপেক্ষা অধিক শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল—অনুশীলন সমিতির সহিত বহির্বঙ্গীয়

বিপ্লবী দলের এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। রাজাবাজার বোমা ষড়যন্ত্র মামলা সুরু হইল এবং তাহার অব্যবহিত ফল হইল এই যে, উক্ত মামলা সম্পর্কে অত্যুৎসাহী জনকয়েক পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মচারী বিপ্লবী দলের রোষে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইলেন।

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার দ্বিতীয় পর্যায় সুরু হইল বিনায়ক দামোদর সাভারকরের নেতৃত্বে। বস্তুতঃ সাভারকর পরিবারই সে বৈপ্লবিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর গণেশপন্থ ছিলেন প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যে মিলনের যোগসূত্র। চাপেকার ও নাটু ভ্রাতৃগণের নেতৃত্বে পরিচালিত কর্ম্মতৎপরতার উপর যবনিকাপাত হইয়াছে; মহারাষ্ট্রের প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের গণ-নেতা তিলক ও পারাঞ্জপে ধৃত ও কারারুদ্ধ হইয়াছেন; কি প্রকাশ্য, কি গোপন উভয়বিধ রাজনীতি ক্ষেত্রেই নেতৃত্বহীন ও কর্ম্মচাঞ্চল্যহীন একটা নিস্তব্ধ শূন্যতা থম্‌থম্‌ করিতেছে। এমন সময় তরুণ বিনায়ক সাভারকর নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে আসিয়া রঙ্গমঞ্চে স্থান গ্রহণ করিলেন। পুণা ফার্গুসান কলেজের ছাত্ররূপেই সাভারকর 'অভিনব ভারত' নামক যে সমিতি গঠন করেন দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই তাহা মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার প্রাণকেন্দ্র হইয়া উঠিল এবং সমগ্র মহারাষ্ট্রে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া মহারাষ্ট্রীয় যুবশক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশকে আকর্ষণ ও আত্মস্থ করিতে লাগিল। বাংলায় তখন বোমা লইয়া বহ্ন্যুৎসবের প্রাথমিক আয়োজন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং সে বোমার নির্মাণ প্রণালি মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লব সমিতির অবিদিত রহিল না। অপরদিকে আইরিশ ও রুশীয় বিপ্লবীগণও তখন স্ব স্ব ক্ষেত্রে কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠিয়াছেন এবং সেখান হইতে সে বোমা বিস্ফোরণের যে শব্দ হাওয়ায় ভারত অভিমুখে ভাসিয়া আসিতেছে তাহা শুনিয়াই মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবীগণ বুঝিলেন যে, বাংলায় ও মহারাষ্ট্রে

ব্যবহৃত বোমা হইতে সে দ্রব্যগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ; তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন, বৈপ্লবিক কর্ম্মতৎপরতা যদি অধিকতর সাফল্যের সহিত পরিচালিত করিতে হয় তাহা হইলে ভারতীয় বিপ্লবের ক্ষেত্রে এই নবতর বস্তুটির আবির্ভাব একান্ত আবশ্যক।

বিনায়ক সাভারকর ইতিমধ্যে কলেজের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া বিদ্যার্জনের পরবর্তী পথের সন্ধান করিতেছেন। সহসা ইউরোপ যাত্রার স্বপ্ন তাঁহার মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল: তিনি দেখিলেন, আধুনিকতম বোমা নির্মাণ পদ্ধতি যদি আয়ত্ত করিতে হয় তাহা হইলে ইউরোপীয় বিশেষ করিয়া রুশীয় বিপ্লব-সমিতিগুলির সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ ও পরিচয় স্থাপন করা প্রয়োজন এবং তাহা করিতে হইলে ব্যারিষ্টারী অধ্যয়নের জন্য বিলাত যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়াই যে তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য একথা উপলব্ধি করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। সে সুযোগ অতি সত্বর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, শ্যামজী কৃষ্ণ বর্ম্মা প্রদত্ত একটি বৃত্তি লাভ করিয়া তিনি বিলাত যাত্রা করিলেন। ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়াই তিনি সর্ব্বপ্রথমে মনোনিবেশ কবিলেন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির শাখা তথায় স্থাপন করিবার দিকে; সাভারকরের ব্যক্তিত্বের অনিবার্য্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারতীয় যুবকগণ দলে দলে সে প্রতিষ্ঠানে আসিয়া যোগ দিতে লাগিলেন, ফলে দেখিতে দেখিতে ইংলণ্ডের বিভিন্ন সহরে তাহার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে ইউরোপীয় বিপ্লবীদিগের সংস্পর্শে আসিবার প্রয়োজনীয়তার কথা সাভারকার দিনেকের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। সেই উদ্দেশ্যে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে প্যারিসে তিনি রুসীয় এক পলাতক বিপ্লবীর সাক্ষাৎ পাইলেন; এই রুসীয় বিপ্লবীই বোমা নির্মাণের আধুনিকতম যে পদ্ধতি তাঁহাকে প্রদান করেন সাভারকর তাহার লক্ষ লক্ষ কপি মুদ্রিত করিয়া মহারাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের

নিকট প্রেরণ করিলেন। এবং মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবীগণও কাল বিলম্ব না করিয়া সেই আর্য্যা অনুযায়ী বোমা প্রস্তুত কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এদিকে সরকারী গুপ্ত পুলিশের অনুসন্ধিৎসু নাসারন্ধ্রে বারুদ ও বিস্ফোরক পদার্থের গোপন উগ্র গন্ধ প্রবিষ্ট হইতে বিলম্ব হইল না; বিনায়কের জ্যেষ্ঠ সহোদর গণেশ পন্থের গৃহে তল্লাসী করিয়া পুলিশ উত্তেজনাপূর্ণ কতকগুলি প্রচার পত্রিকা ও বোমা নির্মাণের আধুনিকতম পদ্ধতি সম্বলিত মুদ্রিত কাগজ হস্তগত করিল। তদনুযায়ী রাজদ্রোহ ও সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া গণেশ পন্থ যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভাবিলেন, জ্যেষ্ঠ সহোদরের এই কঠোর দণ্ড বিলাতে বিনায়ক সাভারকরকে সম্ভবতঃ কিছুটা পরিমাণ সংযত করিবে, কিন্তু ফল ঠিক তাহার বিপরীত হইল। সংবাদপত্রে এই দণ্ডাদেশ বার্ত্তা পাঠ করিবার পর বিনায়ক তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়াকে বিলাত হইতে পত্র লেখেন বিনায়কের মানসিক অবস্থার সাক্ষ্য স্বরূপ তাহার অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"......আমাদের শৃঙ্খলিতা বন্দিনী জন্মভূমি আপন মুক্তিবর যাচিয়া লইবার মানসে দেবার্চনার জন্য আমাদের পরিবাররূপ পুষ্প-বাটিকায় প্রবেশ করিয়া উদ্যানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফুলটি চয়ন করিয়াছেন। ধন্য সে উদ্যান—যে প্রভুর পুজা এবং সেবার জন্য ফুলের অর্ঘ দা করিয়াছে। সে উদ্যানে আরও যে কয়টি ফুল আছে তাহা তাঁহারই চরণে এঁমনি ভাবেই উৎসর্গীকৃত হোক। দেবতার মাল্য রচনার জন্য যে উদ্যানকে ফুল যোগাইতে হয় তাহা নিত্যকুসুমিত।"

পুনায় গনেশ পন্থ ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণের প্রতি প্রদত্ত কঠোর দণ্ড মহারাষ্ট্রীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্তিমিত ধারার বেগ সঞ্চার করিল। সহসা একদা প্রাতে বৃটীশ সংবাদপত্র সমূহ এই সংবাদ অঙ্গে ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল যে, কার্জন উইলি জনৈক ভারতীয়

যুবক কর্তৃক লণ্ডনের রাজপথে রিভলবারের গুলির আঘাতে নিহত হইয়াছেন। সাভারকরের অন্যতম শিষ্য ও সহকর্ম্মী মদনমোহন ধিংড়া হত্যাপরাধে ধৃত ও বিচারান্তে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। অতঃপর সাভারকরের সন্ধানরত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গুপ্ত পুলিশ বাহিনী সমগ্র লণ্ডন সহর তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়াও শিকারের সন্ধান আবিষ্কারে সমর্থ হইল না। এদিকে সাভারকর কিন্তু অতঃপর লণ্ডনে অবস্থান অসম্ভব বোধ করিয়া ওয়েল্‌সের সমুদ্রতীরবর্ত্তী ব্রাইটন নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এইখানে অবস্থান কালেই স্থানীয় একটি সংবাদ পত্রের সান্ধ্য সংস্করণ পাঠ করিতে করিতে ভারতীয় একটি সংবাদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল: তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, অনন্ত কান্‌হর নামক চিৎপাবন শ্রেণীয় একটি মারাঠী ব্রাহ্মণ যুবক গণেশ সাভারকরের নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করার প্রতিশোধ লইবার জন্য নাসিকের কালেক্টর সাহেবকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। পরদিনের সংবাদপত্রে কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণের হত্যা-ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধোদ্যমের অভিযোগে ধৃত হইবার খবর তিনি অবগত হইলেন। সহকর্ম্মীগণ যখন ভারতীয় কারাগারের অভ্যন্তরে রহিয়া অশেষ লাঞ্ছনা বরণ করিতেছেন, সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে সমিতি যখন বিপন্ন ও বিশৃঙ্খল, ওয়েল্‌সের স্বাস্থ্য নিবাসে বসিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত যাপন করা বিনায়কের পক্ষে তখন আর সম্ভব হইল না: তিনি প্যারিস হইয়া লণ্ডনের পথে যাত্রা করিলেন এবং লণ্ডন ষ্টেশনে উপনীত হইবামাত্র সন্ধানরত বৃটিশ পুলিশ তাঁহাকে কবলিত করিল। বিনায়ক তখনকার মত বিলাতেই কারারুদ্ধ হইলেন এবং পরে পুনা ও নাসিকে হত্যাপরাধের সহিত জড়িত করিয়া তাঁহাকে বিচারের জন্য ভারতে প্রেরণ করা হইল। পথে মার্সাই বন্দরে জাহাজ হইতে অন্ধকার সমুদ্রগর্ভে ঝম্পদান ও পলায়ণ প্রচেষ্টার চমকপ্রদ কাহিনী বৈপ্লবিক দুঃসাহসিকতার ইতিহাসে অনল অক্ষরে

লিখিত রহিয়াছে। সাভারকর শেষ পর্য্যন্ত নাসিকে নীত হইলেন এবং আসামীর কাঠগড়ায় মিলিত হইলেন সহকর্ম্মীগণের সহিত সমঅপরাধে অভিযুক্ত অপরাধীরূপে। অন্যান্য আসামীগণ বিভিন্ন মেয়াদের দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন এবং বিনায়ক সাভারকরের প্রতি দুইটি অভিযোগের দরুণ দুইটি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড প্রদত্ত হইল। সাভারকর ও তৎসহ তাঁহার স্বহস্ত গঠিত তরুণ বিপ্লবীদল কর্ম্মক্ষেত্রে হইতে অপসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তথাকার বৈপ্লবিক রঙ্গ মঞ্চের উপর যে কৃষ্ণ যবনিকা নামিয়া আসিল—তৃতীয় বারের জন্য তাহা আর উত্তোলিত হইল না বটে, কিন্তু বিদায় লইবার প্রাক্কালে বাংলার বিপ্লবীগণের বক্ষে যে বিদ্যুৎ স্পর্শ সে ছোয়াইয়া গেল—তাহারই আঘাতে বঙ্গীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার প্রাণকেন্দ্রে সঞ্চারিত হইল নূতন জীবন স্পন্দন ও নবতর কর্ম্মচাঞ্চল্য।

১৯০৮ সাল হইতে ১৯১৩ সালের মধ্যে অনুশীলনী-কর্মতৎপরতার প্রবাহ যখন এইরূপ প্রাখর্য প্রাপ্ত হইয়াছে, যুগান্তর দল তখন কিন্তু তীরে বসিয়া বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার তরঙ্গ গণনা করিতেছে না। যশোহর হলুদ-বাটীতে ও রামেন্দ্রপুর ট্রেণ ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয় এই সময়ে; কলিকাতার বিখ্যাত গার্ডেনরীচ ডাকাতি এই যুগেরই উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং এই ঘটনাকেই আশ্রয় করিয়াই হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা গড়িয়া উঠে। খুলনা ডাকাতি ও ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রপাত ঘটনাবহুল এই বৈপ্লবিক যুগেই।

দেশব্যাপী এই বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার জবাবে সরকারী আয়োজন-অনুষ্ঠানের কিছুটা পরিচয় দেওয়া এস্থলে প্রয়োজন। একদিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ব্যাপক ও বেগবান হইয়া অতিক্রুত গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিতেছে, অপরদিকে বাঙ্গলার বিপ্লব প্রচেষ্টা প্রদেশ প্লাবিত করিয়া সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন বিপ্লব সমিতিগুলিকে বে-

আইনী ঘোষণা করিলেন, অপরদিকে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, পুলিনবিহারী দাস প্রমুখ বাঙ্গলার নয়জন বিশিষ্ট জননায়ককে ১৮১৮ সালের তিন আইন অনুযায়ী বিনা বিচারে বাঙ্গলা হইতে নির্বাসিত করিলেন। ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ স্বয়ং ভারতে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং বঙ্গ-ভঙ্গ বাতিল করিবার ও ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ প্রদান করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বিলাতে উপনীত হইয়া রাজকীয় বিবৃতি বিজ্ঞাপিত করিল যে, রাজকীয় পরিদর্শন ভারতীয় জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ প্রত্যাহৃত হইবার ফলে ভারতীয় জনমত এখন সম্পূর্ণ শান্ত। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লীতে দরবারের আযোজন করিলেন। হস্তিপৃষ্ঠারূঢ় বড়লাট দম্পতির উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইল। যে হস্ত এই চরম দুঃসাহসিক কার্য সন্ত সমাধান করিয়াছে পুলিশ কোনস্থানে তাহার কোন সন্ধান পাইল না। ভারতীয় বিপ্লবক্ষেত্রে রাসবিহারীর এই আকস্মিক আবির্ভাব ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল। দিল্লীর দুঃসাহসিক ঘটনা বিশ্ববাসীর সম্মুখে নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ করিয়া দিল যে, ভারতীয় বিপ্লবী দলের আশা আকাঙ্ক্ষা রাজকীয় আশ্বাসের মুষ্টিভিক্ষায় তুষ্ট হইবার নয়।

সাধারণভাবে সর্বভারতীয় ও বিশেষভাবে বঙ্গীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার প্রাথমিক প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি সম্প্রসারণের অভিমুখে; তখন বিপ্লব প্রতিষ্ঠানগুলি চাহিয়াছে স্থানীয় সীমার সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিয়া সমগ্র প্রদেশে এবং তথা হইতে প্রদেশান্তরে আপনাকে প্রসারিত করিতে। দ্বিতীয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাহাদের অভিমুখীনতা ঐক্য ও সংহতির দিকে ধাবিত হইল; বিপ্লবী দলগুলি তখন কেবল মাত্র স্বতন্ত্র-ভাবে প্রদেশে প্রদেশে স্ব স্ব শাখা বিস্তার করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। তাহারা একান্তভাবে অনুভব করিতে লাগিল

বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে স্থানীয় এবং আন্তঃপ্রাদেশিক যোগসূত্র স্থাপনের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা। বস্তুতঃ চন্দননগর এই যুগে হইয়া উঠিয়াছিল বিভিন্ন বিপ্লবধারার উদার এক মিলনতীর্থ: বাঙ্গলার বিপ্লবী দলগুলি তাহাদের নেতা ও বিশিষ্ট কর্মিবৃন্দের মাধ্যমে একে অপরের চিন্তা ও কর্মপন্থার নিগূঢ় পরিচয় লাভ করিত এবং নির্বিশেষে প্রতিটী প্রতিষ্ঠান এই স্থানে নির্মিত বোমার প্রয়োজনীয় সরবরাহ লাভ করিয়া বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতায় প্রবৃত্ত হইবার সঞ্চয় ও সামর্থ্য অর্জন করিত। কিন্তু বাঙ্গলা ও ভারতীয় বিপ্লবক্ষেত্রে অভীষ্ট ঐক্য ও সংহতি সাধনের কার্যে যে দুইটি বিপ্লবী নেতার ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী হইয়াছে—তাঁহারা হইলেন রাসবিহারী ও যতীন্দ্রনাথ: সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে রাসবিহারী বসু যাহা সম্পাদন করিয়াছেন, প্রাদেশিক ক্ষেত্রে তাহা সাধন করিয়াছেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—বাঙ্গলার বিপ্লব ইতিহাসে বাঘা-যতীন নামে যিনি সমধিক পরিচিত। প্রথমে বাঙ্গলার কথাই আলোচনা করা যাক: আলিপুর ষড়যন্ত্র ও বোমার মামলায় দণ্ডিত হইয়া তৎকালীন যুগান্তরের বিশিষ্ট কর্মী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কর্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হওয়ার ফলে দলের সংহতি ও ঐক্যবন্ধন শিথিল হইয়া যায় এবং তাহার ফলে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় যেসব পৃথক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য: বরিশালের শঙ্কর মঠ, ময়মনসিংহের সাধনা সমিতি, কলিকাতার আত্মোন্নতি সমিতি এবং নোয়াখালী, খুলনা ও মাদারীপুরের দল। ইহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাসের নেতৃত্বে পরিচালিত মাদারীপুর দলই দুর্ধর্ষতায় ও কর্ম-তৎপরতায় সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। সম্ভবতঃ এই কারণেই বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বিভিন্ন দলগুলি যখন সম্মিলিত হয়, তখন বালেশ্বর সংগ্রামের জন্য তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৈনিকবৃন্দ চয়ন করেন এই দল হইতেই। এই দলগুলি প্রাক্তন যুগান্তরের উদ্দেশ্যে মানসিক আনুগত্য নিবেদন

করিয়াই প্রত্যেকেই আপনাকে যুগান্তর দল বলিয়া দাবী করিতেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সমসঙ্ঘভুক্ত হইবার জন্য যে নিবিড় সংহতি ও ঐক্যবন্ধন প্রয়োজন—তাহা তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। যতীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিলেন, তাহাদের মধ্যে একটা মানসিক আত্মীয়বোধ ও মিলনের প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতার বন্ধনে তাহারা আবদ্ধ হইতে পারিতেছে না। অথচ সঙ্ঘবদ্ধ হইলে তাহাদের সম্মিলিত শক্তি বাংলার বিপ্লবসাধনায় এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। তিনি সেই প্রস্তাব লইয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র প্রত্যেকটি দল বিনা দ্বিধায় ও প্রশ্নে তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া লইল; বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে সে মিলনের প্রতিক্রিয়া অনুভূত হইতে দেরী হইল না। কলিকাতার অস্ত্র ব্যবসায়ী রডা কোম্পানীর আগ্নেয়াস্ত্র বোঝাই গাড়ী হইতে প্রচুর গুলি ও বহুসংখ্যক মসার পিস্তল অপহৃত হয় এবং অপহৃত আগ্নেয়াস্ত্র বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় উল্লিখিত দলগুলির মধ্যে। এই অস্ত্রসম্ভার নবগঠিত যুগান্তর যুক্তপরিষদের শক্তি বৃদ্ধি করিল। এদিকে মাদারীপুর দলের কর্মব্যস্ততা অতি সত্বর সরকার কর্তৃক গঠিত ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলার রসদ যোগাইল: গোপালপুর কাউকুঁড়ি, ভরাকৈর ও কোলা ডাকাতির সূত্র ধরিয়া গভর্ণমেণ্ট উক্ত ষড়যন্ত্র মামলা সুরু করিলেন বটে, কিন্তু আদালতের গ্রহণযোগ্য প্রমাণাভাবে শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে উক্ত মামলা প্রত্যাহার করিয়া লইতে বাধ্য হইতে হয়। যতীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র যুগান্তরের খণ্ডিত অংশগুলিকে একত্র করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। অনুশীলন সমিতির সহিত নবপর্যায় যুগান্তরের যোগসূত্র রচনার জন্যও তিনি সবিশেষ সচেষ্ট হন, কিন্তু অনুকুল পরিবেশের অভাবে তাঁহার সে চেষ্টা তখন ফলবতী হয় নাই।

ভারতের বৈপ্লবিক রাজনীতির আকাশে রাসবিহারীর আগমন এক নূতন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব। দিল্লীতে স্বামী রামতীর্থের প্রধান শিষ্য

আমীরচাঁদের সহিত রাসবিহারীর সাক্ষাৎ হয় ; এই আমীরচাঁদের মাধ্যমেই অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ, রঘুবর শর্মা, বালরাজ, দীননাথ তলোয়ার প্রভৃতি সেইসব ব্যক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় তিনি লাভ করেন—অনতিদূর ভবিষ্যতে বৈপ্লবিক ক্ষেত্রে যাঁহারা হইবেন তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহোযাগী ও একান্ত সহায়। আবার তাঁহাদের মাধ্যমেই হরদয়ালের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের দুর্যোগদিনে ভারতের বৃহত্তর বিপ্লবক্ষেত্রে যে বিশাল অংশ তিনি গ্রহণ করিবেন—এইরূপ বৃহত্তর অভাবনীয় পন্থায় তাহার ভূমিকা রচিত হইয়া গেল। তাহারও কিছু পূর্বে রাসবিহারী বাংলায় চন্দননগর আশ্রমে আগমন করেন এবং কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করিয়া অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের বিশিষ্ট নেতা ও কর্মীদের সহিত পরিচিত হইয়া উক্ত দল দুইটির আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা গঠন করিতে সক্ষম হন। তখন হইতেই তিনি চিন্তা করিতে থাকেন, উত্তর ভারতের বিপ্লব সংগঠনের সহিত বাংলার এই বেগবান ও প্রাণবন্ত ধারা দুইটিকে যুক্ত করা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে সর্বভারতীয় বিপ্লব আয়োজনের পক্ষে সেই সম্মিলিত শক্তি এক অমূল্য সম্পদস্বরূপ হইবে। অনুশীলন সমিতির সহিত কখন যে তাঁহার সক্রিয় সহযোগিতা স্থাপিত হইয়া গেল, কখন যে সমিতি তাঁহাকে সর্বভারতীয় নেতাপদে বরণ করিয়া লইল—সে কথা সরকার অথবা সাধারণ কাহারও গোচর হইল না। কিন্তু সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ এই সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইতে গিয়াই দিল্লী ষড়যন্ত্রের মূলোদ্ধারে সমর্থ হইলেন। ফলে ১৯১০ সাল হইতে ১৯১৪ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে যেসব বৈপ্লবিক কার্য সংঘটিত হয়, তাহাই হইল দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার মূল উপাদান। বিচারে আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ, অবোধবিহারী ও বসন্তকুমার দাসের ফাঁসী হয় এবং বালরাজ শর্মা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু ষড়যন্ত্রের প্রধান যন্ত্রী রাসবিহারীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না ;

তাঁহার অস্তিত্ব ভারতের সর্ব্বত্র অনুভূত; কিন্তু তাঁহার আনাগোনা অশরীরী ছায়ামূর্তির মত অলক্ষ্যসঞ্চারী।

ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আসিয়া পড়িল। বৃটেন যখন জার্মাণীর সহিত জীবনমরণ যুদ্ধে লিপ্ত, ভারতস্থ এবং প্রবাসী বিপ্লবী নেতাগণ দেখিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ঘোষণা করিবার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ। সে সুযোগ গ্রহণের জন্য রাসবিহারী উৎকণ্ঠিত আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন। এখন তাহা ভারতের দ্বারপ্রান্তে সমাগত দেখিয়া তাহার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারে মনোনিবেশ করিলেন এবং তাহা করিতে গিয়া তিনটি কর্তব্য আশু সমাধান সাপেক্ষ বলিয়া তাঁহার মনে হইল; (১) ভারতের বিপ্লবী দলগুলি আপনাদের চতুর্দিকে পার্থক্যের যে পরিখা রচনা করিয়া পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রক্ষা করিতেছে, তাহা অবলুপ্ত করিয়া দিয়া তাহাদিগকে অখণ্ড সর্ব ভারতীয় আকার দান করিতে হইবে; ( ) ইউরোপীয় যুদ্ধ যে নূতন পরিস্থিতি আনয়ন করিয়াছে, তাহারই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় বিপ্লবের পরবর্তী কার্যক্রম রচনা করিতে হইবে; এবং (৩) বহির্ভারতীয় বিপ্লবকেন্দ্রগুলির সহিত সক্রিয় সহযোগিতা স্থাপন করিয়া প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও সমরসম্ভার সরবরাহের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথম দুইটি ব্যবস্থা তৃতীয়টির সহিত সংশ্লিষ্ট এবং তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া উল্লিখিত ব্যবস্থাদ্বয় বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে বলিয়া সর্বশেষ ব্যবস্থাটির আলোচনাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন। হরদয়াল, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারকনাথ দাস, বরকতউল্লা, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী, হেরম্ব গুপ্ত, সুফী অম্বাপ্রসাদ ও অজিৎ সিংহ প্রভৃতি নির্বাসিত ও অন্য কারণে প্রবাসী ভারতীয়গণ সে সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, কিন্তু স্বদেশ ও স্বদেশের মুক্তি সাধনের জন্য তথায় যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলিতেছে তৎপ্রতি উদাসীন হইয়া নয়, ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ের সহিত

তাঁহারা নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিতেন, শুধু তাহাই নয়, ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ ও সহযোগিতা দান করিবার উদ্দেশ্যে বহির্ভারতের বিভিন্ন স্থানেও বিপ্লবকেন্দ্র গড়িয়া তুলেন। হরদয়াল ১৯১৩ সালের শেষদিকে সানফ্রান্সিস্কো হইতে "গরদ" পত্রিকা প্রকাশ করেন ; গদর অর্থে বিপ্লব এবং এই গদর পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া যে সঙ্ঘটি গড়িয়া উঠে, তাহাই গদর পার্টি নামে পরিচিতি লাভ করে। ইংরাজি ও গুরুমুখী ভাষায় প্রকাশিত হইয়া গদর পত্রিকা দিনের পর দিন বৃটিশ বিদ্বেষের অনল উদ্গীরণ করিতে লাগিল এবং তাহার ফলে একদিকে যেমন প্রবাসী ভারতীয় চিত্ত তাহার বিরুদ্ধে বিষাক্ত ও বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল, অপরদিকে তেমনি সঞ্চারিত করিতে থাকিল ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সমর্থন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরেই কোমাগাটামারু সম্পর্কিত দুর্ঘটনা বৃটিশ বিদ্বেষবহ্নিতে ইন্ধন নিক্ষেপ করিল। শিখ বাহিনীর অধিনায়ক বাবা গুরুদিৎ সিং এই সময়ে মনস্থ করিলেন, বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত শিখ সম্প্রদায়কে একত্রিত করিয়া বৃটিশ কোলাম্বিয়ার রাজধানী ভেঙ্কবারে লইয়া যাইবেন এবং তথায় তাহাদের জন্য বসবাস স্থাপন করিয়া উন্নতত্র জীবনযাত্রার পথ প্রশস্ত করিয়া দিবেন। সেই উদ্দেশ্যে ১৯১৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে প্রায় চারি শত শিখ যাত্রীসহ কোমাগাটামারু হংকং হইতে ভেঙ্কুবারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, কিন্তু জাহাজখানা সাংহাই, ইয়োকোহামা হইয়া ২৩শে তারিখে ভেঙ্কুবারে পৌছাইয়া দেখে গদর পত্রিকায় সমস্ত সহর ও বন্দর ছাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আরোহীরা কোলাম্বিয়ায় অবতরণ করিবার চেষ্টা করিলে পুলিশের সহিত তাহাদের ভীষণ সঙ্ঘর্ষ হয় এবং উভয় পক্ষে বহু লোক হতাহত হইবার পর জাহাজখানা পুনরায় ইয়োকোহামায় প্রত্যাবর্তন করে। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইয়া গিয়াছে, কাজেই হংকং অথবা

সিঙ্গাপুর কোথাও ভীড়িতে না পারিয়া দুই মাস ইতস্ততঃ বিফল পর্যটনের পর কোমাগাটামারু অবশেষে বজবজে আসিয়া উপনীত হইল। আরোহিগণ একেই অনাহারে ও পথশ্রমে ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়াছিলেন, তদুপরি পথে স্থানে স্থানে ভারতীয় বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসিয়া সে বিরক্ত প্রায় বিদ্রোহের আকার পরিগ্রহ করিয়াছিল। কাজেই বজবজে উপনীত হইয়া তাঁহারা যখন দেখিলেন, বৃটিশ পুলিশ সেখানেও তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত, শুধু তাহাই নয়, স্বদেশ গমনেচ্ছু শিখগণকে বলপূর্ব্বক অন্যত্র লইবার জন্য সকল আয়োজন সম্পন্ন, তখন তাঁহারা সে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন সঙ্গে সঙ্গে উভয়পক্ষের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ ও গুলী বিনিময় আরম্ভ হইয়া গেল এবং তাহার ফলে শিখ ও সরকার পক্ষে বহু লোক হতাহত হইলেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ভারতীয় বিপ্লবীগণ একত্র সম্মিলিত হইবার জন্য সচেষ্ট হইলেন এবং অচিরে সে সম্মেলন সংঘটিত হইল সুইজারল্যাণ্ডে। প্রবাসী ভারতীয়গণের এই বিপ্লবপ্রচেষ্টা জার্মান গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সাম্রাজ্যিক স্বার্থের অনুরোধেই তাঁহারা যে প্রয়াসের অনুকূলে সক্রিয় সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। কণ্টকের সাহায্যে কণ্টক উৎপাটনের সনাতন নীতি অনুসরণ করিয়া ভারতীয় বিপ্লবীগণ জার্মাণ গবর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুত সাহায্য গ্রহণের স্বপক্ষে সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। এদিকে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য গণেশ দত্ত, পিংলে ও বিনায়ক রাও কাপ্‌লে আমেরিকা পরিত্যাগ করিয়া ভারত যাত্রা করিলেন এবং কাশীতে আসিয়া রাসবিহারীর সহিত মিলিত হইলেন। পাঞ্জাবের বিপ্লবীগণের পক্ষ হইতে আনুগত্য নিবেদন করিবার জন্য আসিলেন কর্তার সিং। অনুশীলন সমিতির কাশী শাখার ভারপ্রাপ্ত নেতা শচীন সান্যাল ইতিপূর্ব্বেই

রাসবিহারীর সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং তাঁহারই দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সর্ব্বভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা সার্থক করিবার কার্যে পরিপূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। রাসবিহারী দেখিলেন, ভারতীয় সেনাদলই বৃটিশ সাম্রাজ্যের একমাত্র সহায় ও সম্বল, কাজেই সৈন্য বাহিনীকে বিক্ষুব্ধ করিয়া বিপ্লবের স্বপক্ষে আনিতে না পারিলে সাফল্যের আশা দুরাশা মাত্র; শচীন সান্যাল, পিংলে, কাপ্‌লে ও কর্তার সিং সে কাজে ব্রতী হইলেন, উদ্যোগ আয়োজন যখন আশানুরূপ পথ অতিক্রম করিযাছে, তখন সর্বভারতীয় বিপ্লব ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত ধার্য ও ঘোষিত হইয়া গেল; স্থির হইল, এক তারিখে এবং একই সময়ে সমগ্র ভারতে বিপ্লব ঘোষিত হইবে এবং বিপ্লবী সৈনিকগণ সরকারী দুর্গ, ব্যারাক, অর্থ ও অস্ত্রাগার প্রভৃতি দখল করিয়া প্রত্যেকটি জেলার সদর সহরগুলি নিজেদের অধিকারে আনিবেন। ভারতীয় বিপ্লবী সমাজ প্রত্যাশিত দিনটির প্রতীক্ষায় নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রহর গণিতেছে এমন সময় ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতা ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার গোপন তথ্য গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া দিল। গবর্ণমেণ্ট অতি দ্রুত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন; ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন শিবির ও ছাউনি হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিবার কার্য সুরু হইয়া গেল এবং তাহারই সাথে সাথে সুরু হইল ভারতব্যাপী তল্লাস ও গ্রেপ্তারের হিড়িক। এই ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেণ্ট তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করিয়া লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার পত্তন করিলেন এবং তাহার সহিত বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা যুক্ত করিয়া সমগ্র উত্তর ভারতে বিপ্লবের জড় মারিবার কার্যে ব্রতী হইলেন। বিচারের অজুহাতে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও প্রাণদণ্ডের ব্যাপকরূপ পরিগ্রহ করিয়া সরকারী প্রতিহিংসা বীভৎস মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল। বিপ্লব আয়োজনে যাঁহারা রাসবিহারীর সতত পার্শ্বচর ও বিশ্বস্ত সহকর্মী ছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই রাজরোষের বহ্নিকুণ্ডে আহুতি প্রদত্ত হইলেন।

রাসবিহারী গোয়েন্দা বিভাগের শ্যেনদৃষ্টি এড়াইয়া জাপানে চলিয়া গেলেন।

উত্তর ভারতে রাসবিহারীর বিপ্লব আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইবার পর বাংলায় যতীন্দ্রনাথ সে অসমাপ্ত কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা যদি সার্থক হয়, প্রাচ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমাধি রচিত হইবে, আর যদি তাহা নাও হয়, তথাপি ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলন দমনের জন্য বৃটেনকে তাহার সামরিক শক্তির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অন্যত্র নিয়োজিত রাখিতে হইবে—ইউরোপীয় যুদ্ধে লিপ্ত জার্মাণ বাহিনীর পক্ষে ইহাই পরম লাভ এবং সেই লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই জার্মাণ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার অনুকূলে সহৃদয় সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। উত্তর ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা পণ্ড হইয়া যাইবার পর সাংহাইয়ের জার্মাণ কন্সাল জেনারেল বাংলার বিপ্লবী দলের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। সে সংযোগ স্থাপিত হইতে বিলম্ব হইল না। সর্বভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার সাহায্যকল্পেই 'মেভারিক' নামক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদপূর্ণ একখানি জার্মাণ জাহাজ করাচীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কিন্তু বিশ্বাসঘাকতার বিষ-বাষ্পে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া সে প্রচেষ্টা ইতিপূর্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। উত্তর ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টায় রাসবিহারী যে ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন, বাংলার বাঘা-যতীন বাংলার বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে সেই অংশ গ্রহণ করিবার জন্য কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। সাংহাইস্থিত জার্মাণ কন্সাল জেনারেলের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া যতীন্দ্রনাথ ব্যবস্থা করিলেন মেভারিক করাচী না গিয়া বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হইবে। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায় মার্টিন নাম ধারণ করিয়া ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে বাটাভিয়ায় যান এবং জার্মাণ কন্সাল জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। হরিকুমার চক্রবর্তী

বাটাভিয়ায় হ্যারি এণ্ড সন্স নামে এক মেকী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান খুলিয়া জার্মাণ কন্সাল জেনারেল ও বাংলার বিপ্লবী দলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। সাব্যস্ত হইল, মেভারিক সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে তাহার মারণাস্ত্রের সমুদয় মাল ১লা জুলাই খালাস করিয়া দিবে। যতীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে সমগ্র বাংলাকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সামরিক অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া এক একটি অঞ্চলের ভার এক একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহকারীর হাতে ন্যস্ত করিয়া বাংলার সহিত ভারতের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবার সকল আয়োজন সম্পন্ন করিলেন। মেভারিকের মাল খালাস লইবার জন্য রায়মঙ্গলে লোক প্রেরণ করিয়া চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন ও যতীশ—এই চারিজন বিশ্বস্ত ও দুর্ধর্ষ সৈনিকসহ বালেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে বাংলার গোয়েন্দা সহসা বালেশ্বর হইতে প্রেরিত একটি সংবাদ পাইয়া উপনীত হইল সেই বুড়ীবালামের তীরে—সদলে যতীন্দ্রনাথ যেখানে পরিখা প্রস্তুত করিয়া শত্রুসৈন্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাহার পর সুরু হইল এমন এক অভাবনীয় অসম সংগ্রাম—শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত পুলিশ বাহিনী যাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সম্মুখ যুদ্ধে আহত হইয়া চিত্তপ্রিয় বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যুবরণ করিলেন। আহত যতীন্দ্রনাথের জীবন-দীপ পরদিন হাসপাতালে নির্বাপিত হইল; বালেশ্বর স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের বিচারে মনোরঞ্জন ও নীরেন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন এবং যতীশের প্রতি প্রদত্ত হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড। যতীশ পরবর্তীকালে উন্মাদ হইয়া কারাগারেই প্রাণত্যাগ করেন। বালেশ্বরের রণক্ষেত্রে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সৈনিকগণ যখন জীবন-মরণ যুদ্ধে ব্যাপৃত, বিশ্বাসঘাতকতা তখন বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার সকল আয়োজন সম্পন্ন করিয়া আনিয়াছে। মেভারিকের গোপন অভিসন্ধির কথা গবর্ণমেণ্টের গোচরে আসার ফলে রায়মঙ্গলের

প্রতীক্ষমান বিপ্লবীদিগকে হতাশ হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিতে হইল।

দুই দুইটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে। বাঙ্গলার বিপ্লবিগণ কিন্তু তৎসত্ত্বেও হতাশ নহেন, তৎসত্ত্বেও তাঁহারা বাঙ্গলার ছিন্ন-ভিন্ন বৈপ্লবিক সঙ্ঘগুলিকে পুনঃ সঙ্ঘটিত করিবার চেষ্টায় আত্মগোপন করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, ভারত রক্ষা আইনেব ব্যাপক আঘাতে বিভিন্ন বৈপ্লবিক সঙ্ঘগুলিব মধ্যে পূর্ব্বরচিত যে ঘনিষ্ঠ সংযোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা পুনঃ সংযোজিত কবিবাব দুঃসাহসিক ও দুঃসাধ্য সাধনায় তাঁহারা ব্যাপৃত। অপরদিকে গোয়েন্দা বিভাগ পরিচিত কর্মীদিগকে প্রকাশ্যে না দেখিয়া বিচলিত হইযা উঠিয়াছে এবং তাঁহাদের সন্ধানে সমগ্র প্রদেশ আলোড়িত কবিয়া তুলিয়াছে। সূত্র অনুসরণ করিতে করিতে সন্ধানরত পুলিশদল গৌহাটী এবং ঢাকায় পলাতক বিপ্লবিগণের দুইটি গোপন আশ্রয় কেন্দ্রের সম্মুখীন হইবামাত্র দেখিল, বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্র অগ্নিনালিকার মুখে তাহাদেব উদ্দেশে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার জন্য প্রস্তুত। উভযস্থানেই পুলিশবাহিনীর সহিত বিপ্লবী দলের সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষ সঙ্ঘটিত হয় : গৌহাটীতে প্রভাস লাহিড়ী ও নলিনী ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবিগণ আহত অবস্থায ধৃত হইয়া বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন এবং ঢাকা কলতা-বাজারের সম্মুখ যুদ্ধে বিপ্লবী নলিনী বাগচী জীবনদান করিলেন। এইরূপে বাঙ্গলার বৈপ্লবিক নাটকের প্রথম অঙ্কের যবনিকাপাত হইল।

১৯১৯ সালে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হইল এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পরিবর্তিত মনোভাবের প্রমাণস্বরূপ দমনমূলক আইনসমূহ প্রত্যাহার করিলেন এবং দণ্ডিত ও অন্তরীণ বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদিগকে মুক্তি দিলেন। তাঁহারা কারাগার হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলেন, ভারতী বিপ্লবক্ষেত্রের উপর দিয়া যেন এক প্রলয়ঙ্কব

ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে, স্থানীয় এবং আন্তঃ-প্রাদেশিক যেখানে যাহা কিছু যোগসূত্র ছিল ঝটিকার আঘাতে সব ছিন্নভিন্ন। তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া দলগুলির পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করিলেন।

ইতিমধ্যে গান্ধীজী প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ-আন্দোলনের নীতি কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হইল এবং সংগ্রাম ঘোষিত হইলে মহাত্মাজী তাহার নেতৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বিপ্লব সমিতিগুলির সংগঠনকার্য এদিকে সমাপ্তপ্রায়। এখন প্রয়োজন শুধু সেই প্রেরণার—যাহার আঘাতে তাড়িত হইয়া পুনরায় সে বৈপ্লবিক কর্মতরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। অহিংস অসহযোগ দমনের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যাপক পীড়ন-নীতি তীব্র আঘাতে বিপ্লব সঙ্ঘগুলিকে চঞ্চল ও সক্রিয় করিয়া তুলিল। গোপীনাথ সাহা কলিকাতা পুলিশের তদানীন্তন বড়কর্তা টেগার্টকে হত্যা করিতে যাইয়া মিঃ ডে নামক জনৈক সাহেবকে নিহত করিলেন। ফাঁসীর মঞ্চে গোপীনাথের জীবন বলি প্রদত্ত হইল। এদিকে অনুশীলন সমিতি তখন প্রদেশের ঘর প্রায় গুছাইয়া আনিয়া আন্তঃ-প্রাদেশিক যোগসূত্রগুলি পুনঃ সংযোজিত করিবার কার্যে ব্যস্ত হইয়াছে। এইচ এস এস আর দল অনুশীলনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া তাহারই প্রভাব ও পরিচালনাধীনে বহির্বঙ্গে, বিশেষ করিয়া বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে দ্রুত বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। শচীন সান্যাল কারামুক্ত হইয়া পুনরায় যুক্তপ্রাদেশিক সংগঠনের নেতৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন ঃ যোগেশ চ্যাটার্জি বাঙ্গলা হইতে বেনারসে গিয়া শচীন সান্যালের সহিত মিলিত হইয়াছেন। তাঁহাদেরই যৌথ নেতৃত্বে কাকোরী ষ্টেশনে দুঃসাহসিক ট্রেণ ডাকাতি ঘটিয়া গেল এবং সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া আরম্ভ হইল কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা। কাকোরী সংক্রান্ত গ্রেপ্তার ও তল্লাসীর জের বাঙ্গলা পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিল। গোয়েন্দা বিভাগ সূত্র অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে গিয়া

উপনীত হইল দক্ষিণেশ্বরে বোমা-নির্মাণ কারখানার বহির্দ্বারে। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়াই দক্ষিণেশ্বর ষড়যন্ত্র মামলার সৃষ্টি। ষড়যন্ত্রের তদ্বির সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারী ভূপেন চ্যাটার্জি আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে নিহত হইলেন; ষড়যন্ত্রের সহিত হত্যাপরাধ জড়িত হইল, বিচারে অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদ চৌধুরী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন এবং অবশিষ্ট অপরাধিগণের প্রতি বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড প্রদত্ত হইল।

সরকারী গোয়েন্দা ও পুলিশ বিভাগের শ্যেনদৃষ্টি যখন সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গলার উপর নিবদ্ধ, দিল্লীতে তখন বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র অতিক্রত দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে: অনুশীলন সমিতির পক্ষ হইতে যতীন্দ্রনাথ দাস দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছেন—তথাকার ধ্বংসপ্রাপ্ত সংগঠন পুনর্নির্মাণ করিবার নিমিত্ত। দিল্লীর বিপ্লবী যুবশক্তি অতি সত্বর যতীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে লাগিলেন। লাহোরে অকস্মাৎ একদা জনৈক পুলিশ ইনস্‌পেক্টর ও একজন কনষ্টেবল বিপ্লবী দলের হাতে নিহত হইলেন, তাহারই অব্যবহিত পরে পরিষদের অভ্যন্তরে বোমা বিস্ফোরিত হইল। এই সব ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া যে ব্যাপক গ্রেপ্তার সুরু হয় ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু, যতীন্দ্রনাথ ও বটুকেশ্বর দত্ত প্রমুখ বিখ্যাত বিপ্লবিগণ তাহার বেড়াজালে আবদ্ধ হইলেন। বিচারে প্রথমোক্ত তিনজন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন এবং যতীন্দ্রনাথ ও বটুকেশ্বরের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড প্রদত্ত হইল। কারাগারে যতীন্দ্রনাথের অনশনে তিল তিল করিয়া মৃত্যুবরণ পুরাণবর্ণিত দধিচীর আত্মদানের কাহিনীকে ঐতিহাসিক বাস্তবতা দান করিল। বাঙ্গলার বিপ্লবী নেতা ও বিশিষ্ট কর্মিগণ এই সময় চেষ্টা করিলেন বাঙ্গলার বিপ্লবী দল দুইটিকে যৌথ নেতৃত্বের অধীনে আনিয়া একটি মিলিত বিপ্লবী ফ্রণ্ট গঠন করিবার; কিন্তু কোন একটি পক্ষবিশেষের উপর তাহার ব্যর্থতার দায়িত্ব আরোপ না করিয়া সাধারণভাবে বলা যায়, সে চেষ্টা সফল হইল না। এদিকে

প্রত্যেকটি দলের তরুণ কর্মিগণ এই মুহূর্তে একটা কিছু করিবার অধীর আগ্রহে এমন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন যে, সজোরে বল্গা আকর্ষণ করিয়াও তাঁহাদিগকে সংযত করা নেতৃবৃন্দের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। মেছুয়া-বাজার বোমার মামলা এই অদম্য কর্মপ্রেরণারই অপরিহার্য পরিণতি। কিন্তু বাঙ্গলার বিপ্লবী তরুণচিত্তে দাসত্বের দুর্বিসহ জ্বালা যে উত্তাপ পুঞ্জীভূত করিয়াছে, এই পরিমিত কর্মতৎপরতার মাধ্যমে তাহার অতি সামান্য অংশ অভিব্যক্ত হইল মাত্র। অবশিষ্ট ভাগ বৃহত্তর কোন রন্ধ্রমুখে বহির্গমনের পথ সন্ধান করিতে লাগিল। সঞ্চিত সে বাষ্পপুঞ্জ সহসা দারুণ বিস্ফোরণে বহির্গত হইল চট্টগ্রামে: চট্টলের বিপ্লবিগণ সরকারী অস্ত্রাগার নিঃশেষে লুণ্ঠন করিয়া সমগ্র সহরের শাসন-ব্যবস্থা সাময়িকভাবে বিকল করিয়া দিলেন এবং তাহার পর জালালাবাদের শৈলশিখরে অধিরোহণ করিয়া সরকারী সৈন্য ও পুলিশবাহিনীর সহিত যে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন—বালেশ্বরের যুদ্ধ ব্যতীত ভারতীয় বিপ্লব ইতিহাসের আর অপর কোন ঘটনাই তাহার সহিত তুলনীয় নয়।

এদিকে আইন অমান্য আন্দোলনের আঘাতে সমগ্র ভারত ও তৎসহ বাংলা তখন বিপুলভাবে আলোড়িত হইতেছে। সত্যাগ্রহী বন্দীর সংখ্যা তখন এত অধিক যে, বাংলার বর্তমান জেলগুলি তাহা ধারণের পক্ষে অত্যন্ত অপ্রশস্ত। সরকারী দমননীতি কেবলমাত্র কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে জেলগুলির অভ্যন্তরে সত্যাগ্রহী বন্দিগণের উপর অকথ্য পীড়ন সুরু করিয়া দিল; বৈপ্লবিক প্রতিশোধ নামিয়া আসিল কারা ও পুলিশ বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা বিভাগীয় ইনস্পেক্টার জেনারেলদ্বয়ের উপর। কারা বিভাগীয় ইনস্পেক্টার জেনারেল মিঃ সিম্‌সন্ রাইটার্স বিল্ডিংয়ে তাঁহার অফিস ঘরে আক্রান্ত ও নিহত হইলেন। ইনস্পেক্টার জেনারেল অব পুলিশও

আক্রান্ত হইলেন, কিন্তু সে আক্রমণ মারাত্মক হয় নাই। সিম্‌সন্‌ হত্যা বাংলার বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার ইতিহাসে ব্যক্তিগত দুঃসাহসিকতার সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর দৃষ্টান্তরূপে লিপিবদ্ধ রহিবে।

অতঃপর হত্যাকাণ্ড দ্রুত পরম্পরায় ঘটিয়া চলিল। ঢাকায় হড্‌সন, লোম্যান ও গ্রাসবী আক্রান্ত হইলেন। বীণা দাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বাংলার তদানীন্তন গবর্ণর মিঃ ষ্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করিলেন। কুমিল্লার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুন্সিগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটদ্বয় নিহত হইলেন। লেবংএর ঘোড়দৌড়ের মাঠে বাংলার গবর্ণর আক্রান্ত হইলেন। রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলের ইউরোপীয় জেলার গুলিবিদ্ধ হইলেন এবং মেদিনীপুরের ক্রমপর্যায়ে তিনজন ইউরোপীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিপ্লবীর আক্রমণে নিহত হইলেন। আক্রমণের ধারা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, বিপ্লবিগণ এই পর্যায়ে ইউরোপীয় রাজপুরুষগণকেই যেন আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যরূপে বাছিয়া লইয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে হিলি ষ্টেশনের দুঃসাহসিক ডাকাতি ঘটিয়া গেল এবং প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রমুখ বিপ্লবিগণ সেই সম্পর্কে বিভিন্ন মেয়াদের কারা ও নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। গোয়েন্দা পুলিশ জনৈক আত্মগোপনকারী বিপ্লবীর নিকট হইতে বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানের প্রায় ছয় শতাধিক ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা সম্বলিত একটি নোটবই উদ্ধার করিয়া সমগ্র বাঙ্গলা গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাসীতে তোলপাড় করিয়া তুলিল এবং সেই সম্পর্কে সন্ধানের সূত্র অনুসরণ করিতে করিতে দুইটি ষড়যন্ত্রের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। এইরূপে টিটাগড় ও আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র দ্বয়ের জীবন্ত সমাধি রচিত হয়। এই দুইটি মামলা সম্পর্কে দেশব্যাপী যে তল্লাসী ও গ্রেপ্তার চলে, বাঙ্গলার বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা তাহার চাপে সাময়িকভাবে স্তব্ধ হইয়া যায়।

১৯৪০ সালে সহসা কোথা হইতে এক অবিশ্বাস্য ও অপ্রত্যাশিত

ঘটনা ঘটিয়া গেল : জালিয়ানাবাগ হত্যাকাণ্ডের নায়ক মাইকেল ও ডায়ার *লণ্ডনে উধম সিং নামক জনৈক পাঞ্জাবী যুবকের হাতে অকস্মাৎ নিহত হইলেন। অপরিতৃপ্ত প্রতিহিংসা প্রায় দুইদশক ধরিয়া* যেন তাঁহার অনু-সরণ করিতেছিল। ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনের আলোচ্য পর্যায়ে এইরূপে পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিল উধম সিং। ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনের ধারা অতঃপর এক নূতন খাত আশ্রয় করিতে চলিল।

ভারতের পররাষ্ট্র নীতি

যেকোন জাতির পররাষ্ট্র নীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয় তাহার জাতীয় স্বার্থ, আদর্শ ও ঐতিহ্যের দ্বারা। জাতি তাহার বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ হইতে উন্মুক্ত গৃহ-বাতায়ন পথে বিশ্ব-ব্যাপার নিরীক্ষণ করে, নিজস্ব ভাব ও চিন্তাধারার সাহায্যে তাহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে এবং দূর অথবা নিকট ব্যবধানে রহিয়া প্রতি মুহূর্তে নিজের উপর অনুভব করে জাগতিক ঘটনাবলীর অপরিহার্য প্রভাব। নিজের স্বতন্ত্র আদর্শ ও স্বার্থগত বিচার-বুদ্ধি হইতে সে কখনও বা উদ্যত হয় ঘটনা বিশেষের প্রতিরোধের নিমিত্ত, আবার কখনও বা উদ্যোগী হয় অপর কোন ঘটনার সমর্থনের জন্য। এইখানে আসিয়াই সে অনুভব করে সাহচর্যের প্রয়োজনীয়তা, বিশ্ব-ব্যাপারে নিজের বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সে সমধর্মী সহযোগীর সন্ধানে বাহির হয়; পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের সূত্রপাত এইখানে।

স্বাধীন ভারত এই অবস্থায় উপনীত হইয়াই সে কার্যে ব্রতী হইয়াছে। তাহার ভৌগলিক অবস্থানের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘ অবসর দিতে প্রস্তুত নয়। ভারত যখন পর-শাসন হইতে মুক্ত হইয়া আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী সহ-যোগীদের মধ্যে তখন নিদারুণ স্বার্থ সংঘাত সুরু হইয়া গিয়াছে এবং সেই ঘটনাকে আশ্রয় করিয়াই সমগ্র বিশ্ব, বিশেষ করিয়া সমূহ পাশ্চত্য জগত দুইটি বিরোধী শিবিরে অতি দ্রুত বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। অপরদিকে বিক্ষুব্ধ এসিয়ার বারুদস্তূপ তখন বিস্ফোরণোন্মুখ : কোথাও পশ্চিমের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সুরু হইয়া গিয়াছে প্রকাশ্য সংগ্রাম, আবার অন্য কোথাও বা ধূমায়িত বিদ্রোহাগ্নি গুমরিয়া উঠিতেছে আন্তর্দাহী উত্তাপে। ভারত তাহার গৃহকক্ষে উপবিষ্ট রহিয়া চতুর্দিকস্থ বাতায়ন পথে বিশ্বের ঘটনা-প্রবাহ নিরীক্ষণ করিল এবং সেই মুহূর্তে অনুভব করিল, তীরের নিরাপদ ব্যবধানে অবস্থিত রহিয়া তরঙ্গ গণনা করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না, শুধু তাহাই নয়, সে প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ব্যাপারে তাহাকে এক বিশিষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয় করিতে হইবে। তাহাকে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল তদ্দণ্ডে।

কিন্তু তাহা করিতে গিয়া সে অনুসরণ করিবে কোন আদর্শের প্রেরণা ও প্রণোদন? এ প্রশ্নের জবাব পণ্ডিত জওহরলাল নিজের ভাষায় দিয়াছেন : পণ্ডিত নেহেরু মার্কিণ পরিভ্রমণকালে ক্যালিফোর্ণিযায় প্রদত্ত এক ভাষণে এ সম্পর্কে বলেন,—

"Today as we look out upon the world and fashion our foreign policy, we are governed by something of that

idealism as well as the realistic approach that Gandhiji gave to our struggle. If India is to play an effective part in world affairs, or even in her own development, she has to function in conformity with the ideals she has uphold these many years."

অর্থাৎ, আজ যখন আমরা বহির্জগতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করিবার জন্য উদ্যত হইতেছি, তখন গান্ধীজী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে যে আদর্শবাদিতা ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা অনুশাসিত না হইয়া পারি না। বিশ্ব-ব্যাপারে ভারতকে যদি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে এই দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারত যে আদর্শ অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই তাহাকে কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ ব্যাপারে ভারতের প্রেরণা লাভের উৎস ইহাই ; জাতি একদা মহাত্মাজীর জীবন-দর্শনের এই জীবন্ত প্রবাহে তরণী ভাসাইয়াই তাহার মুক্তিতীর্থে আসিয়া উপনীত হয় এবং আজও সে তাহারই ধারা অনুসরণ করিয়া বিশ্ব-রাজনীতির তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে চায় ; কিন্তু মহাত্মাজীর প্রচারিত সে আদর্শের স্বরূপ ও সংজ্ঞা কি, কোন অনায়ত্ত লোকের আভাস সে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে আনিয়া দেয় ? পণ্ডিতজী তাঁহার ভাষণে সে জিজ্ঞাসারও জবাব দিয়াছেন :

"These ideals are essentially of peace and co-operation, of national freedom, of a growing internationalism—leading to a world order, of equality of nations and peoples and of eradication of want and misery for the millions who suffer from it. India's nationalism has always been based on this conception of a world order and international co-operation."

অর্থাৎ, সে আদর্শ মূলতঃ শান্তি ও সহযোগিতার, ক্রমবর্ধমান সেই আন্তর্জাতিকতার যাহা শেষ পর্যন্ত পরিণতি লাভ করিবে, নূতন এক বিশ্ব-ব্যবস্থায় ; সে আদর্শ জাতি ও জনসঙ্ঘের স্বাধীনতা ও সাম্য বিধানের এবং যে অভাব ও দুর্দশার দ্বারা পৃথিবীর কোটি কোটি লোক পীড়িত, তাহার নিঃশেষে দূরীকরণের। ভারতীয় জাতীয়তাবোধ এই বিশ্ব-ব্যবস্থার আদর্শ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর ভিত্তি করিয়াই প্রতিষ্ঠিত। পণ্ডিতজী আরও বলেন, ভারতের নবতর এই বিশ্ব-ব্যবস্থার আদর্শ দূরপ্রসারী পরিকল্পনায় কি আকার পরিগ্রহ করিবে, তৎসম্পর্কে এই মুহূর্তে ভবিষ্যদ্বাণী করা যদিও কঠিন, তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, ত্বরায় হোক, অথবা বিলম্বে হোক ; বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য ; কারণ, পৃথিবীর সম্মুখে আজ দুইটি বিকল্প সম্ভাবনা সমুপস্থিত : হয় বর্তমান বিশ্ব- ব্যবস্থার পরিবর্তন, নয় বিশ্ব-বিধ্বংসী বিপর্যয় ; সম্ভাবনাদ্বয়ের যে কোন একটি পৃথিবীকে অচিরে চূড়ান্তভাবে বাছিয়া লইতেই হইবে।

ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির এই আদর্শের বিস্তৃততর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু তাঁহার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, বাস্তবক্ষেত্রে সে আদর্শের রূপায়ন নিম্নলিখিত পাঁচটি মূলনীতির উপর নির্ভরশীল :

(১) বিশ্ব-শান্তি বিধান প্রচেষ্টা, কিন্তু বৃহৎ কোন শক্তি অথবা শক্তি-গোষ্ঠীর সহিত যুক্ত হইয়া নয়, বিবাদ এবং বিতর্কের অধীন প্রতিটি সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত স্বাধীনভাবে তাহাদের সম্মুখীন হইয়া ; (২) পরাধীন জাতি ও জনসঙ্ঘের মুক্তি সাধন ; (৩) জাতীয় এবং ব্যক্তিগত উভয়বিধ স্বাধীনতার সংরক্ষণ ; (৪) জাতিগত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিলোপ এবং (৫) বিশ্বের জনসমষ্টির বৃহত্তর অংশ যে অভাব, অজ্ঞতা ও ব্যাধি-মহামারীর দ্বারা আক্রান্ত, তাহার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি।

উল্লিখিত নীতি পঞ্চকের মধ্যে প্রথম দুইটিই সকল দিক হইতে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেই জন্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে ভারত কর্তৃক তাহার কার্যতঃ প্রয়োগ স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হইয়া গিয়াছে। সর্বাগ্রে প্রথম নীতিটির কথাই আলোচনা করা যাক : একদিকে সোভিয়েট এবং অপরদিকে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রী শক্তিসমূহকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বব্যাপী যে স্বার্থ-সংঘাত সুরু হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে ইউরোপ, শুধু ইউরোপ কেন, সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ অতি দ্রুত বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে দুইটি বিরোধী শিবিরে ; এসিয়ার বিভিন্ন দেশসমূহ অসহায়ভাবে সে শিবির-সন্নিবেশ নিরীক্ষণ করিতেছে, আর অনুভব করিতেছে, যে কোন এক শক্তিগোষ্ঠীর পক্ষভুক্ত হইয়া শক্তিসমূহের বণ্টননামায় স্বাক্ষর করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। এমন সময় ভারত আসিয়া স্বাধীন জাতিসমূহের আসরে তাহার যোগ্য আসন গ্রহণ করিল এবং দৃঢ়কণ্ঠে ও দ্ব্যর্থবোধহীন ভাষায় ঘোষণা করিল তাহার সেই বলিষ্ঠ নীতি, যাহা এসিয়ার বিভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিল নূতন ও নিরপেক্ষ এক তৃতীয় পন্থার আভাস : ভারত ঘোষণা করিল, তাহার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণরূপে সচেতন এবং সচেতন বলিয়াই বৃহৎ কোন শক্তি অথবা শক্তিগোষ্ঠীর সহিত যুক্ত হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না ; কারণ যে কোন এক শিবিরভুক্ত হওয়ার অর্থ হইবে বর্তমান বিরোধকে তীব্রতর করিয়া তোলা, যে সংঘাত আজ সম্ভাবনা মাত্ররূপে সুদূরে দণ্ডায়-মান, তাহাকে নিশ্চয়তার নিকটতর ব্যবধানে আনয়ন করা। ভারত এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিল যে, নিরপেক্ষ তৃতীয়পক্ষরূপে সে বিরোধী শিবিরদ্বয়ের মাঝখানে দণ্ডায়মান হইয়া বিরোধী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে মিলনের সংযোগসূত্র রচনায় সচেষ্ট হইবে এবং যে কোন পক্ষের প্রস্তাব ও কর্মপন্থা তাহার রাষ্ট্রিক আদর্শ ও পররাষ্ট্রনীতির সহিত সঙ্গতিশীল হইবে—অকুণ্ঠচিত্তে তাহাকে সমর্থন ও সহযোগিতা দানে সে অঙ্গীকার-

বন্ধ। উভয়পক্ষের সামরিক দম্ভ ও অস্ত্র ঝন্‌ঝনা সমভাবে উপেক্ষা করিয়া ভারত যে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার জন্য অবশ্য মহাত্মাজীর প্রচারিত আদর্শের অনুপ্রেরণাই প্রধানতঃ দায়ী, কিন্তু তাহা ছাড়াও অপর যে আর একটি ঘটনার অবদান ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে, তাহা হইল এই যে, ভারত কোন জাতির বিরুদ্ধে অতীত তিক্ততার স্মৃতি বহন করিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হয় নাই, কোন স্থান সম্পর্কে অতীত অধিকার সম্বন্ধীয় দাবীর জের টানিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিষদে আসন গ্রহণ করে নাই। সোভিয়েট যদিও দাবী করে, অতীতের সমস্ত ঐতিহ্য অস্বীকার করিয়া সে সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক পন্থায় পদক্ষেপ করিয়াছে, তথাপি স্বাধিকার সম্পর্কিত অতীত সংস্কার হইতে মুক্ত হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই; কমিউনিষ্ট রাজনৈতিক দর্শন অনুযায়ী উত্তরাধিকার চৌর্যের সমতুল্য, তথাপি জার-শাসনের উচ্ছেদকারী সোভিয়েট সরকার ডাইরেন, পোর্ট আথার প্রভৃতি জার-শাসনকালীন অধিকার-সমূহের উপর তাহার দাবী প্রত্যাহার করে নাই এবং তাহা করে নাই বলিয়াই জাপান—তথা এসিয়াকে সংস্কার-বিমুক্ত দৃষ্টি লইয়া নিরীক্ষণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। চীনের কমিউনিষ্ট গবর্ণমেণ্ট চিয়াং শাসনের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিব্বতের উপর কবে কোন চৈনিক সম্রাটের যে অধিকার ছিল, আজও তাহার জের টানিয়া তাঁহারা তিব্বত অধিকারের জন্য কৃতসঙ্কল্প। ভারতীয় কোন বিজেতা ভারত সীমান্তের বাহিরে সামরিক অভিযান পরিচালনা করিয়াছেন—ইতিহাসে এরূপ কোন দৃষ্টান্তের উল্লেখ নাই; ভারত তাহার ভৌগলিক সীমার বাহিরে প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছে সত্য, কিন্তু সে প্রভাব ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক, কাজেই সংশ্লিষ্ট স্থান সমূহের সম্বন্ধে উত্তরাধিকারিত্বের কোন দাবী সে পোষণ করে না, বঞ্চনা সম্বন্ধে কোন তিক্ততার স্মৃতি সে বহন করে না; সেই কারণে আন্তর্জাতিক

সমস্যাসমূহকে সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি লইয়া নিরীক্ষণ করিতে ও তাহাদের সমাধানকল্পে বহিঃপ্রভাবনিরপেক্ষ স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে সে সক্ষম। কিন্তু গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি অনুগত রাষ্ট্ররূপে ভারতের মনোভাব পাশ্চাত্য শক্তিব্লকের অভিমুখী হওয়া ও তাহাদের সম্বন্ধে আদর্শগত আত্মীয়তাবোধ পোষণ করা একান্ত স্বাভাবিক; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে কমিউনিজম্ সম্বন্ধে অন্ধ বিরোধিতার অভিযোগ উত্থাপন করা সমীচীন হইবে না, পণ্ডিত নেহরুর দৃষ্টিতে রাজনৈতিক মতবাদরূপে কমিউনিজমের প্রসার এবং সাম্রাজ্যবাদী অভিযানরূপে সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতির অগ্রগতি দুইটি পৃথক বস্তু : ভারত রাষ্ট্র যে কমিউনিজমের অন্ধ বিরোধী নয় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিহিত রহিয়াছে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক কমিউনিষ্ট চীনের স্বীকৃতির মধ্যে। চীনের সুবিস্তীর্ণ মূল ভূখণ্ড যে শাসন ব্যবস্থা স্বচ্ছন্দচিত্তে মানিয়া লইয়াছে ভারত গবর্ণমেণ্ট যখন বুঝিলেন, তাহাকে অস্বীকার করার অর্থ হইবে চীনের জাতীয় দাবীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, মাও গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যে স্বীকৃতি ও সমর্থন বিজ্ঞাপিত হইল সেই মুহূর্তে। বস্তুতঃ রাজনৈতিক মতবাদ ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রধান বিচার্য বিষয় নয়, কোন দেশের শাসন ব্যবস্থা স্বীকার অথবা অস্বীকার করা সেই দেশের জনসমষ্টি অধিকাংশের সমর্থন অথবা অসমর্থের উপর নির্ভরশীল; অর্থাৎ শাসন ব্যবস্থার উৎকর্ষ যাচাইয়ের পক্ষে সেই দেশের জনমতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কষ্টিপাথর। এই নীতি অনুসরণ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট যেমন একদিকে কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষভাবেই পিকিং গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি আবার সেই নীতির নির্দেশক্রমেই ফরাসী ইন্দোচীনের বাও-দাই গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইতে অসম্মত হইয়াছেন। কলম্বো কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান করিতে গিয়া তথাকার এক ছাত্রসভায় ভাষণদান প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু মন্তব্য

করেন, যে কোন দেশের জনসমষ্টির জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা সম্পাদন দ্বারাই সেই দেশের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বিধান সম্ভবপর; কাজেই বাও-দাই গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে ইন্দোচীন জনসাধারণের অভিমত যতক্ষণ না সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া কোনক্রমেই সমীচীন হইবে না। কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ চীনের কমিউনিষ্ট শাসন স্বীকার করিয়া লইয়াছেন সত্য, তাই বলিয়াই সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতির বাহনরূপে আপনাদিগকে ব্যবহৃত হইতে দিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন, তাহার জন্য ভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আছে। ভারতের সোভিয়েট বিমুখীনতার জন্য কেবল যে তাহার আক্রমণাত্মক পররাষ্ট্র নীতিই দায়ী তাহা নয়, তাহারও পশ্চাতে রহিয়াছে রাষ্ট্রিক আদর্শের বিরুদ্ধ সংঘাত; পণ্ডিত নেহরু মার্কিণ পরিভ্রমণকালে ম্যাডিসনে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতির আক্রমণাত্মক অভিযানের উল্লেখ করিবার পর বলেন,—

'Furthermore, there is the growing tendency to centralization and regimentation which is a danger to individual freedom. Soviet Russia is the extreme example of centralization. I would not like to limit freedom for any nation."

অর্থাৎ এতদ্ব্যতীত, কেন্দ্রায়ত্ত করা ও সামরিক শৃঙ্খলায় সংহত করার দিকে সেখানে একটা ক্রমবর্ধমান প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় এবং সে প্রবণতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পক্ষে সমূহ বিপজ্জনক। কেন্দ্রায়ত্ত করিবার সাধনা চূড়ান্তভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সোভিয়েট রাশিয়ায়। কোন জাতির স্বাধীনতার সঙ্কোচসাধন আমার কাম্য নয়। যে জাতি মহাত্মাজীর আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত, গণতান্ত্রিক ভাবধারার দ্বারা উদ্বুদ্ধ, সমগ্র জাতিকে একনায়ক শাসনযন্ত্রের যাঁতা-কলে পিষ্ট করিয়া একই ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা সে মানিয়া লইতেই পারে না।

অতঃপর দ্বিতীয় নীতি, অর্থাৎ পরাধীন জাতিসমূহের মুক্তিসাধন সম্বন্ধীয় নীতির কথা : যে কোন জাতির স্বরাষ্ট্রীয় আদর্শ ও পররাষ্ট্র নীতির ছায়া প্রতিফলিত হয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে তাহার অনুসৃত কর্মপন্থার মধ্যে—ইহা রাজনৈতিক স্বতঃসিদ্ধ সত্য এবং এই সত্যের আলোকে যদি আমরা সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় কর্মতৎপরতার ইতিহাস অধ্যয়ন করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, পৃথিবীর যে কোন স্থানে অধীনস্থ কোন জাতিকে পরশাসন পীড়িত করিতেছে, পর-শোষণ অতৃপ্ত লালসায় তাহার জীবন শোণিত পান করিতেছে, ভারতীয় সহানুভূতি সেইখানেই শাসিত ও শোষিত জাতির পার্শ্বে দণ্ডায়মান। এশিয়া সম্বন্ধে সে নীতি আরও দৃঢ়তর ও স্পষ্টতর। ভারত এশিয়ার বুক হইতে পরশাসন লুপ্ত করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর। এই আদর্শের অনুসরণক্রমেই ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু পাশ্চাত্য ঔপনিবেশক শক্তিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া এই সতর্কবাণী বহু পূর্ব্বেই উচ্চারণ করিয়া রাখিয়াছেন যে, এশিয়ায় তাহাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব তাহার স্বল্প-পরিসর পরমায়ুর প্রান্তসীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে এবং তাহার শেষ চিহ্ন এশিয়ার বুক হইতে যত সত্বর বিলুপ্ত হয় ততই মঙ্গল, কারণ বিলম্ব ঘটিলে এশিয়ার জাগ্রত জনমত তাহার বিরুদ্ধে যে প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে—বিশ্বশান্তি তাহার আঘাতে বিঘ্নিত না হইয়া পারিবে না। এই আদর্শের অনুবর্তী হইয়াই ভারত ইন্দো-নেশীয় মুক্তি সংগ্রামে তথাকার জাতীয় দাবীর পার্শ্বে গিয়া দণ্ডায়মান হয় এবং ইন্দোনেশীয় স্বাধীনতা দাবীর অনুকূলে এশিয়ার জনমত সংহত করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে এশিয়ার বিভিন্ন জাতিসমূহের সম্মেলন আহ্বান করে। তথায় ওলন্দাজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—ওলন্দাজ বিমানের পক্ষে ভারতের আকাশ

পথ নিষিদ্ধ করার নির্দেশ তাহার প্রথম কার্যক্রম। একদিকে ভারতের অক্লান্ত প্রচারকার্য বহির্জগতে ইন্দোনেশীয় জাতীয় দাবীর স্বপক্ষে জনমত জাগ্রত ও সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছে এবং অপরদিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধি কর্তৃক প্রদত্ত যুক্তি ও শক্তিপূর্ণ ভাষণ পরম্পরা পরিষদের অভিমত তাহার সমর্থনে গড়িয়া তুলিয়াছে। ইন্দোনেশীয় জনসাধারণের সর্বস্বপণ স্বাধীনতা সঙ্কল্প বিশ্বের অনুকূল জন-মতের সহিত যুক্ত হইয়া যে অপরিহার্যতা অর্জন করিল, শেষ পর্যন্ত তাহার নিকট নতি স্বীকার ছাড়া ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের আর গত্যন্তর রহিল না। আফ্রিকার ইতালীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারণ ব্যাপারেও ভারতের বিশিষ্ট ভূমিকা স্মরণীয় ঘটনা। সে সম্পর্কে ভারতীয় প্রতিনিধি যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন বস্তুতঃ তাহাই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে স্বস্তি পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে,তাই ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড আজ স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মর্যাদায় মণ্ডিত হইতে চলিয়াছে। ভারতের পররাষ্ট্রীয় নীতি পঞ্চকের অবশিষ্ট দফা তিনটির স্থান দূরপ্রসারী পরিকল্পনার পৃষ্ঠায় এবং তাহাদের রূপায়ন আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাপেক্ষ, সে সাধনায় ভারত তাহার বিশিষ্ট ভূমিকা অবশ্যই অভিনয় করিবে। ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতি বিরোধী শক্তি ব্লকদ্বয়ে সশস্ত্র ক্ষাত্রদম্ভের বিরুদ্ধে স্পর্ধিত চ্যালেঞ্জ, শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে নিত্য উদ্যত প্রতিবাদ, বিশ্বশান্তির শিয়রে সদাজাগ্রত সতর্ক প্রহরী ; ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতি নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষতা মাত্র নয়, পরন্তু বিশ্বশক্তির মানদণ্ডে ভারসাম্য সংস্থাপনে তাহা এক সক্রিয় কর্তৃত্ববিশেষ ; ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে সখ্য ও সহযোগিতা কামনা করে, কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে নয়, অন্যায় ও অবিচারের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া নয় ; আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে কেবলমাত্র সাময়িক সমস্যাসমূহের সমাধানই ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির একমাত্র লক্ষ্য নয়, তাহার

দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে নূতন বিশ্বব্যবস্থা রচনার এমন এক বিরাট পরিকল্পনা—যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সহিত জাতীয় স্বাধীনতার কোন সংঘাত নাই এবং জাতীয় স্বাধীনতা যেখানে আন্তর্জাতিক দায়িত্বের সহিত সঙ্গতি লাভ করিয়া সার্থক ও সম্পূর্ণ হইয়াছে।

—

এশিয়ার রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা

যুদ্ধ পরবর্তীকালীন জগতে এশিয়া বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণস্থান গ্রহণ করিয়াছে। বহু বিভিন্ন স্বার্থ এবং আদর্শের এলোমেলো সূত্র পরস্পরের সহিত জট্ পাকাইয়া যাওয়ার ফলে তাহার আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক গ্রন্থি স্বতঃ এবং স্বভাবতঃই জটিল হইয়া উঠিয়াছে; তদুপরি একদিকে স্ব-স্ব প্রভাব ও প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইঙ্গ-মার্কিণ প্রতিযোগিতা এবং অপরদিকে বিশ্বের বিরোধী দুইটি ব্লকের স্বার্থসংঘাতের দৃশ্য এবং অদৃশ্য প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সে জটিলতা শতগুণ বর্দ্ধিত। বর্তমান এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে এই স্বার্থ ও শক্তি বিন্যাসের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

মধ্যপ্রাচ্যের প্রশ্ন অগ্রগণ্য এই কারণে যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রখর প্রবাহ বিভিন্ন স্বার্থের মগ্ন শিলাখণ্ডে আহত হইয়া এইখানে আসিয়াই আবর্তিত হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের ইসলাম রাষ্ট্রগুলি আজ স্বার্থ এবং আদর্শের ক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত; একদিকে আরব লীগকে কেন্দ্র করিয়া ট্রান্স জর্ডানের আমীর আব্দুল্লার বৃহত্তর সিরিয়া গঠনের পরিকল্পনা এবং অপরদিকে পাকিস্থান কর্তৃক প্রবর্তিত ও পাকিস্থানের নেতৃত্বে পরিচালিত প্যানইসলামীয় আন্দোলন: পরস্পর বিরোধী এই দুইটি আদর্শ ও আন্দোলনের ধারা আজ সমান্তরাল গতিতে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাহাদের চূড়ান্ত সংঘাত আসন্ন এবং অনিবার্য। ইহুদিগণ কর্তৃক উত্থাপিত স্বতন্ত্র ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীর বিরোধিতা করিবার ও তাহা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে আরব লীগ গঠিত হয় ১৯৪৫ সালে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক যখন প্যালেষ্টাইন বিভাগ তথা

স্বতন্ত্র ইজরাইল রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইল, আমীর আবদুল্লার নেতৃত্বে তাহাদের মধ্যে সামরিক সংহতি স্থাপিত হইল মাত্র তখনই। অতঃপর সুরু হইল আরব-ইহুদী সংগ্রাম। অবশ্য সে সংগ্রাম পরিচালন করিবার দায়িত্বের সর্বাধিক অংশ গ্রহণ করে ট্রান্সজর্ডান এবং তজ্জন্য ট্রান্সজর্ডান সেনাবাহিনীকেই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। আমীর আব্দুল্লা তাই এই অধিকারের উপরে দণ্ডায়মান হইয়াই তাঁহার 'বৃহত্তর সিরিয়া' গঠনের দাবী উপস্থাপিত করিলেন এবং পরিকল্পনার স্বরূপ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিলেন, সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্সজর্ডান এবং প্যালেষ্টাইনের আরব অধিকৃত অঞ্চলের সমবায়ে 'বৃহত্তর সিরিয়া' গঠন করিবার সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। আরব লীগের পক্ষ হইতে এ-প্রস্তাবের বিপক্ষে প্রবল বিরোধিতা উত্থাপিত হইল এবং তাহার প্রত্যুত্তরে আমীর আব্দুল্লা বলিলেন, তাঁহার দাবী যদি স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে আরব লীগ পরিত্যাগ করিয়া তিনি দূরে সরিয়া দাঁড়াইবেন। আরব লীগ প্রমাদ গণিলেন; আমীর আব্দুল্লার দাবী মানিয়া লওয়া তাঁহাদের পক্ষে অবশ্যই কঠিন, কিন্তু ইহাও বাস্তব সত্য যে, ট্রান্সজর্ডান বাহিনীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে আরব্ধ সংগ্রামে সাফল্য লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহুদিগণ যে প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে তাঁহাদের প্রত্যেকটি দাবী স্বীকার করাইয়া লইতে শেষ পর্যন্ত সমর্থ হইয়াছেন—তজ্জন্য মূলতঃ দায়ী আরব লীগের অন্তর্নিহিত এই দ্বিধা ও দৌর্বল্য। আমীর আব্দুল্লার এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা যদিও বৃটেনের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয় দ্বারা প্ররোচিত তথাপি অবস্থাবিপাকে পড়িয়া তাহা সার্থকতার পথে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। সম্প্রতি সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্তিমিত প্রদীপে তৈল সিঞ্চন করিয়াছেন—সিরিয়ার কর্ণেল হুসনী জাইম। তাঁহারই নেতৃত্বে সিরিয়ায় এক সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় গত এপ্রিল মাসে এবং কর্ণেল হুসনী জাইম শোনিতপাতহীন বিপ্লবের সাহায্যে

তদানীন্তন গবর্ণমেণ্টের পতন ঘটাইয়া শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তিনি দাবী করেন, মিশর, লেবানন, সৌদী আরব প্রভৃতি অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সমর্থন তাঁহার পশ্চাতে রহিয়াছে এবং তিনি স্বয়ং আমীর আব্দুল্লার 'বৃহত্তর সিরিয়া' গঠন পরিকল্পনার সমর্থক হিসাবে পরিচিত; ইহা হইতে বিনা প্রতিবাদে ধরিয়া লওয়া যায় যে, উল্লিখিত পরিকল্পনা আরব লীগের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম রাষ্ট্রসমুহের অধিক সংখ্যকের না হইলেও উল্লেখযোগ্য একটা অংশের সমর্থন ইতিমধ্যেই লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

পক্ষান্তরে পাকিস্থান তাহার স্বরচিত যে পরিকল্পনা লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, আমীর আব্দুল্লা রচিত পরিকল্পনা হইতে আকৃতি ও প্রকৃতিগত ভাবে তাহা সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র। আমীর আব্দুল্লার পরিকল্পনার পশ্চাতে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাড়না অবশ্যই আছে, কিন্তু প্রেরণার একমাত্র উৎস তাহাই নয়। অন্তর্দ্বন্দ্বের আঘাতে দীর্ণ ও দুর্বল আরব লীগকে শক্তিশালী আকারে পুনর্গঠিত করিয়া এদিকে যেমন স্বীয় উচ্চা-কাঙ্ক্ষার বাহনরূপে তাহাকে ব্যবহার করিতে চান, অপরদিকে তেমনি আবার ইজরাইল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরব্ধ যে সংগ্রাম অবস্থা গতিকে আজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত, পুনর্গঠিত আরব লীগের সাহায্যে সাফল্যের সহিত তাহা পরিচালন করিবার উচ্চাশাও তিনি মনে মনে পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সে পরিকল্পনার সহিত পাকিস্থান-রচিত পরিকল্পনার পার্থক্য এই যে, আমীর আব্দুল্লা চাহেন 'বৃহত্তর সিরিয়া' গঠন করিতে এবং পাকিস্থানের উদ্দেশ্য 'বৃহত্তর মুসলিম' লীগ গঠন করা। মুসলিম লীগ দেশ বিভাগ ব্যাপারে ভারতের সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রে যে সাফল্য ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে, এশিয়ার বৃহত্তরক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ পরীক্ষা করিতে সে আগ্রহী। বিশ্ব মুসলিম রাষ্ট্র সঙ্ঘ গঠন পরিকল্পনা এই আগ্রহ হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে। এশিয়ার দিকে দিকে এবং দেশে দেশে পাশ্চাত্য

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মরণ-পণ মুক্তি সংগ্রাম সুরু হইয়া গিয়াছে এবং সে যুদ্ধ জয়যুক্ত করিবার জন্য সমগ্র এশিয়ার সংহত শক্তি যখন একান্ত প্রয়োজন, ঠিক সেই সঙ্কটতম মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সমগ্র এশিয়া দ্বিখণ্ডিত করিয়া নিখিল এশিয়ার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহারই কর্মতৎপরতার চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছে—বোগদাদে ও আম্মানের বেইরুটে ও তেহরাণে, দামাস্কাসে ও আঙ্কারায়, কাইরোতে ও করাচীতে। ভারত বিভাগের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বৃটিশ স্বার্থ এবং কর্তৃত্বই ক্রিয়ারত ছিল; কিন্তু এশিয়ার বিশাল বক্ষ, বিশেষ করিয়া মধ্য ও নিকট প্রাচ্যের রাজনৈতিক প্রবাহ বিভিন্ন বিরোধী স্বার্থের নিয়ত সংঘাতে আলোড়িত ও আবর্তিত হইতেছে। মধ্য ও নিকট প্রাচ্যের তৈলখনি অঞ্চল হইতে দূরপ্রসারী পাইপ-লাইনসমূহ শোণিত-বাহী শিরার মত ভূমধ্যসাগরীয় বৃটিশ ও মার্কিণ বন্দর অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। কি শান্তিতে, কি সংগ্রামে—যে কোন আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে তৈল এক অপরিহার্য পদার্থ কাজেই যে কোন মূল্যে হোক, তাহার সরবরাহ অব্যাহত রাখিবার জন্য সংশ্লিষ্ট শক্তিসমূহ বদ্ধপরিকর। সেই উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন চলিয়াছে বৃটেন ও মার্কিনের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা অপরদিকে তেমনি সুরু হইয়াছে—ইঙ্গ-মার্কিণ মিলিত স্বার্থের সহিত সোভিয়েট স্বার্থের নিদারুণ সংঘাত। মধ্যপ্রাচ্যের তৈল-চুক্তির প্রায় সমূহ অংশই বর্তমানে বৃটেন ও মার্কিণের অধিকারভুক্ত। অথচ সোভিয়েটের পক্ষেও তৈলের প্রয়োজন, সমপরিমাণ অপরিহার্য এবং তাহার পক্ষে অনুরূপ প্রয়োজন কৃষ্ণসাগর হইতে ভূমধ্যসাগরে নিষ্ক্রমণের প্রশস্ত জলপথ। এই কারণে তাহার এক চক্ষু নিবদ্ধ রহিয়াছে উত্তর পারস্যের তৈল-খনি অঞ্চলের উপর এবং অন্য চক্ষু দিয়া নিরীক্ষণ করিতেছে—দার্দানেলিশ প্রণালীর জলপ্রবাহ। ইঙ্গ-মার্কিণ সাধারণ স্বার্থ ছাড়াও মধ্য এবং

নিকটপ্রাচ্যে বৃটেনের বিশেষ স্বার্থও বিদ্যমান; তাহার বহু বিস্তীর্ণ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যসমূহের পরস্পরের মধ্যে এবং তাহাদের সহিত লণ্ডনের ভৌগলিক যোগসূত্রের অবিচ্ছিন্নতা তাহাকে রক্ষা করিতেই হইবে। এই সমস্ত কারণে ভৌগলিক, সামরিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়া মধ্য এবং নিকটপ্রাচ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করা বৃটেনের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার এবং তদুদ্দেশ্যে বৃটেন কর্তৃক যে-কোন ব্যবস্থাই গৃহীত হোক না কেন, মার্কিণ নিজের স্বার্থেই তাহা সমর্থন করিতে বাধ্য। পাকিস্থান বুঝিয়াছে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে এশিয়া বিভাগের নিমিত্ত যে আন্দোলন সে প্রবর্তন করিতে উদ্যত হইয়াছে, অন্ততঃপক্ষে মধ্য ও নিকট প্রাচ্যে ইঙ্গমার্কিণ সমর্থন তাহা কোনক্রমেই লাভ করিবে না। অথচ বৃহৎ শক্তি চতুষ্টয়ের যে কোন এক বা একাধিক পক্ষের পৃষ্ঠপোষকতা তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তাহার এই নিঃসহায় বিহ্বলতা সোভিয়েটের দৃষ্টি এড়াইল না। সে দেখিল যে মধ্য ও নিকটপ্রাচ্য তাহার পক্ষে অন্যথা দুষ্প্রবেশ্য —তথায় প্রবেশলাভের পক্ষে ইহাই তাহার সম্মুখে প্রশস্ততম পথ। তাই সোভিয়েটের সৌহার্দ পূর্ণ সহযোগিতার হস্ত পাকিস্থানের অভিমুখে প্রসারিত হইল সেই মুহূর্তে এবং তাহা সাদরে স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পাকিস্থানও কিছুমাত্র কালবিলম্ব করিল না। ইহা ছাড়াও পাকিস্থানের সোভিয়েট অভিমুখী মনোভাব সঞ্জাত হইবার আর একটি হেতু আছে এবং তাহা ভারতের সহিত তুলনায় তাহার স্বীয় নিকৃষ্টতার ধারণা হইতে উদ্ভূত। ভারতকে যে কোন সর্তে কমনওয়েল্‌থের মধ্যে রাখিবার জন্য বৃটেন যে অত্যধিক ও অস্বাভাবিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, তাহা হইতে এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক ঘটনা হইতে পাকিস্থানের ধারণা হইয়াছে, ইংলণ্ডের রাজদরবারে সে উপেক্ষা ও অবহেলার আসনের অধিকারী মাত্র। তাই স্বীয় অস্তিত্ব সপ্রমাণের জন্য ও বৃটেনের উপর

কূটনৈতিক চাপ দিবার উদ্দেশ্যে পাকিস্থানের মানসিক মানদণ্ডের পাল্লা আজ সোভিয়েটের দিকে একান্তভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। পাকিস্থান পররাষ্ট্র সচিব স্যার জাফরুল্লা রাশিয়া পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, সোভিয়েট বাণিজ্য মিশন করাচীতে আসিয়া পাক-সোভিয়েট বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়াছেন এবং পাকিস্থান প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁ মঃ ষ্ট্যালিনের আমন্ত্রণক্রমে মস্কো যাত্রার জন্য উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছেন। আহত আত্মসম্মান ও স্বভাবগত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি পাকিস্থানকে আজ যে পথে তাড়িত করিতেছে তাহা কোথায় পরিণতি লাভ করিবে পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ আজ হয়তো তাহা কল্পনা করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু এ কথা অবিসম্বাদিত সত্য যে সোভিয়েট যদি এই সূত্র অনুসরণ করিয়া মধ্য ও নিকটপ্রাচ্যে নাসিকা প্রবেশ করাইবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে এশিয়ার কূটনৈতিক ক্ষেত্রে এক নূতন সঙ্কটের উদ্ভব হইবে এবং তাহার ফল যদি সমগ্র এশিয়ার পক্ষে বিপর্যয়কর হয়, তাহা হইলে এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের শীর্ষে তাহা কল্যাণ বর্ষণ না করাই স্বাভাবিক।

এশিয়ার নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ ও গণতন্ত্র আজ তিন দিক হইতে আক্রান্ত: একদিকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের অতৃপ্ত আত্মা তাহার যুগজীর্ণ রুগ্নদেহ পরিত্যাগ করিয়া অতৃপ্ত ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত নব-কলেবর আশ্রয় করিতে চাহিতেছে, অপরদিকে ঐসলামিক সাম্রাজ্যবাদের সমাহিত শবদেহ ভূতগ্রস্ত হইয়া কবর বিদীর্ণ করিয়া পৈশাচিক আনন্দে পুনরায় বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে এবং তৃতীয় দিক হইতে কমিউনিষ্ট অভিযান সমগ্র এসিয়া দলিত মথিত করিবার জন্য নবদলদৃপ্ত দৈত্যের মত দ্রুত ও দীর্ঘ পদবিক্ষেপে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ এশিয়ার পক্ষে বিশেষতঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার-পক্ষে আর সমস্যা নয়। ভারত, ব্রহ্ম ও সিংহল হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ

তাহার পাততাড়ি পূর্বেই গুটাইয়া লইয়াছে। মালয় এবং চীনে তাহার অস্তিত্ব বিপন্নপ্রায়; ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার মুক্তি সংগ্রাম সার্থকতার সন্নিকট; ইন্দোচীনে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের বড় তরফ বৃটেন ভারতীয় উপকূল ত্যাগ করিবার পর মেজো এবং ছোট তরফ ফরাসী ও পর্তুগাল ভালরূপেই বুঝিয়াছে, ভারতের মাটিতে তাঁহাদের পরমায়ু অঙ্গুলি-পর্বের গোণা দিনে আসিয়া উপস্থিত। তাই পাশ্চাত্য সাম্রাজ্য-বাদের অপসৃয়মান অস্তিত্ব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পরিত্যাগ করিয়া মধ্যপ্রাচ্যে তাহার শেষ ঘাঁটি নির্মাণ করিতে চাহিতেছে এবং তৃতীয় বিশ্ব সংগ্রামের পর মধ্য প্রাচ্যেই যে তাহার সমাধি রচিত হইবে তাহার সূচনা সর্বত্র সুস্পষ্ট। কাজেই পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ এশিয়ার পক্ষে গুরুতর কোন সমস্যা নয়। এশিয়ার ঔস্লামিক সাম্রাজ্যবাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিদ্রাহীন 'উত্তপ্ত মস্তিষ্কের জাগৃত দুঃস্বপ্ন মাত্র। কিন্তু কমিউনিষ্ট অভিযান এশিয়ার সম্মুখে জাগ্রত ও জীবন্ত সমস্যা। একদিকে চীনা কমিউনিষ্টগণ সর্বগ্রাসী সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া জাতীয় চীনের অগ্নিসংস্কারসম্পন্ন করিবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প; অপরদিকে ব্রহ্ম এবং মালয়ের কমিউনিষ্টগণ সে আগুনে মশাল ধরাইয়া স্ব স্ব দেশের দিকে দিকে সেই জ্বলন্ত মশাল স্পর্শে অগ্নি সংযোগ করিবার কার্যে ব্যস্ত; ভারতীয় কমিউনিষ্টগণ তাহারই অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারে উপদ্রবের পৈশাচিক তাণ্ডবে মাতিযা উঠিয়াছে। সে সমরা-নলের শিখা দক্ষিণ কোরিয়াকে স্পর্শ করিয়া দাবানল জ্বালাইয়া তুলিতে যত্নবান। এশিয়ায় এই উপদ্রবের গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাইশেক ও প্রেসিডেন্ট কুইরিণো ম্যালিনায় সম্মিলিত হইয়া জাতীয় চীন, ফিলিপাইন ও দক্ষিণ কোরিয়াকে লইয়া এশিয়ায় এক কমিউনিষ্ট বিরোধী ব্লক গঠন করিয়াছেন এবং তাহার প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন এশিয়ার অন্যান্য দেশের আগমন প্রতীক্ষায়। উদ্যোক্তাগণ

কমিউনিষ্ট বিরোধী ব্লক গঠন করিতে গিয়া হয়তো অজ্ঞাতসারে ভাবী প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তিরই ভিত্তি পত্তন করিয়া বসিলেন। পাকিস্থান তাহার সহজাত ভেদবুদ্ধির ভেল্কী বাজীতে ভুলিয়া সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে সর্বগ্রাসী এই আক্রমণের সহিত আপোষ রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত একদা সন্ধি ও সখ্য স্থাপন করিয়া সে ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতা করিয়াছিল। কিন্তু সে দিনের বন্ধু বৃটেনের সে সখ্য এবং সৌহার্দ আজ কোথায়! বৃটেনের নিকট হইতে বড় আশায় বিড়ম্বিত হইয়াছে বলিয়াই না আজ প্রবঞ্চিত পাকিস্থানকে নূতন আশ্রয়ের আশায় অন্যত্র কর প্রসারণ করিতে হইতেছে! কান্তে-হাতুড়ের উদ্ধি চিহ্নিত এ বাহু সবল সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার বন্ধন বন্ধুত্বে নিবিড় ও ভরসায় নির্ভর যোগ্য হইবে কি?

সমস্যাসঙ্কুল এশিয়ায় ভাগ্য নির্ধারণে ভারতের ভূমিকা কি? এ প্রশ্নের জবাব দিবে এশিয়ার প্রতিটি সমস্যা সম্বন্ধে ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু প্রদত্ত প্রত্যেকটি ভাষণ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধির প্রতিটি কর্মতৎপরতা, সে প্রশ্নের সদুত্তর দিবে এসিয়া সম্মেলনের ঘোষিত উদ্দেশ্য, অনুসৃত প্রতিটি কার্যক্রম এবং গৃহীত প্রতিটি প্রস্তাব। ভারত অবশ্যই জাতীয়তাবাদের পক্ষপাতী, কিন্তু সে জাতীয়তাবোধ সংগ্রামশীল ও আক্রমণাত্মক নয়। পৃথিবীর যেমন দুইটি গতি আছে: আহ্নিক গতির দ্বারা সে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের দিন-রাত্রি, আলো-অন্ধকার ও ঋতুপর্যায় আনয়ন করে এবং বার্ষিক গতির সাহায্যে সে সঙ্গতি রক্ষা করে সৌর মণ্ডলের অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের নৃত্যছন্দের সঙ্গে; ভারতের জাতীয় আদর্শেরও তেমনি দুইটি দিক আছে; একদিকে সে চায়, অতীতের ঐতিহ্য ও সংস্কারের প্রবাহমান ধারা অনুসরণ করিয়া বর্তমান পরিবেশের সহিত সঙ্গত বিশ্বের

প্রতিটি জাতির পরিপূর্ণ আত্মবিকাশ এবং অপরদিক হইতে সে কামনা করে, বিশ্বজনীনতার বিশালতর ক্ষেত্রে জাতীয় সত্তার বিভিন্ন বিকাশ-গুলির সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত সংস্থাপন। স্বাধীন ভারত তাহার নবলব্ধ স্বাধিকারের উচ্চমঞ্চে দাঁড়াইয়া সমগ্র এশিয়ার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিল, তাহার সর্বাঙ্গে নবজীবনের জাগরণ-চাঞ্চল্য শিহরিয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ তাহার আপন স্বার্থে এশিয়ার প্রতিটি দেশের মধ্যে অনাত্মীয়তার এবং অনেক স্থলে বৈরিতার যে সুদুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান গড়িয়া তুলিয়াছিল—এক সাধারণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিগূঢ় সম্পর্কের সদ্যজাগ্রত চেতনার আঘাতে তাহা ধ্বসিয়া পড়িবার উপক্রম। ভারত উপলব্ধি করিল, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দকে সৌহার্দ্যের এক সাধারণ মঞ্চে সম্মিলিত করিবার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ। এশিয়া সম্মেলন আহ্বানের পরিকল্পনা রচিত হইল এই প্রেরণার তাগিদে। দিল্লীতে সে সম্মেলনের অধিবেশন আহূত হইল এবং ভারতীয় প্রধান মন্ত্রীর আমন্ত্রণক্রমে এশিয়ার প্রায় পঁচিশটি বিভিন্ন দেশ হইতে ২৫০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত হইলেন। সে সম্মেলন বর্জন করিল কেবলমাত্র পাকিস্থান। ভারতের সহিত তুলনামূলকভাবে স্বীয় নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে যে ধারণা অন্তর্নিহিত রহিয়া অহরহ তাহাকে পীড়িত করিতেছে—এ ক্ষেত্রে তাহাই তাহার অংশ গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিল। তাহার সংশয়, ভারত সম্ভবতঃ এশিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণে স্পর্ধিত হইয়াছে। কিন্তু পাকিস্থান বুদ্ধি বিকারের বশে এই সহজ কথাটা উপলব্ধি করিতে পারিল না যে, ভারত কর্তৃক এশিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ সংশয়ের কথা নয়, স্পর্ধার ব্যাপারও নয়, সে নেতৃত্ব নিতান্ত সহজ ও সঙ্গতভাবে ভারতের অধিকারে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত। পাকিস্থান যদি এই সহজ ও সত্য ঘটনা স্বীকার করিতে অক্ষম হইয়া সম্মেলন বর্জন করিয়া থাকে, তাহা হইলে এশিয়ার জাতি

সমাজ হইতে সে আপনাকেই বর্জিত করিয়াছে। অবশ্য এ সম্মেলন বর্জন করা ছাড়া তাহার উপায়ান্তর ছিল না, কারণ ভারতে যখন স্বাধীন সার্বভৌম ও আধুনিকতম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে সমগ্র এশিয়াকে নিরীক্ষণ করিতেছে, পাকিস্থান তখনও মধ্যযুগীয় মনোভাবের বশবর্তী হইয়া এশিয়ার অভ্যন্তরে সন্ধান করিতেছে—সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্রের গোপন সুরঙ্গ পথ।

সম্মেলনের সপ্তাহকালব্যাপী অধিবেশনে আলোচনা প্রসঙ্গে যে দুইটি বিষয় সর্বাপেক্ষা প্রকট হইয়া উঠে—তাহার একটি হইল, এশিয়ার বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতি সম্বন্ধে চেতন এবং অপরটি বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে যে ভূমিকা তাহাদিগকে অভিনয় করিতে হইবে তাহারই পূর্বাভাস। স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ হইতে সম্মেলন আহ্বান সম্বন্ধে ভারতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এইরূপ বিকৃত তথ্য প্রচার করা হইতে থাকে যে, ভারত কর্তৃক প্রবর্তিত এই 'প্যান-এশিয়াটিক' আন্দোলন মূলতঃ আক্রমণাত্মক এবং ইউরোপ সে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার উদ্বোধন বক্তৃতায় সে সংশয় নিরসনকল্পে বলিলেন, সেরূপ কোন দুরভিসন্ধি ভারত পোষণ করে না এবং অখণ্ড বিশ্ব সংহতি গঠনকল্পে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে এশিয়ার জাতি সঙ্ঘের সহযোগিতার হস্ত সর্বদা সম্প্রসারিত থাকিবে। পৃথিবীর শক্তি-সাম্যের ভারকেন্দ্র কেমন করিয়া ইউরোপ হইতে ধীরে ধীরে এশিয়ার অভিমুখী হইতেছে, পণ্ডিত নেহরু অতঃপর সেই চিত্রটি সম্মেলনের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিলেন এবং অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন—সেই অনতিদূর ভবিষ্যতের দিকে—এশিয়াকে যেখানে দাঁড়াইয়া বিশ্ব রাজনীতি ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয় করিতে হইবে। কিন্তু সে ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া এশিয়ার মন পাছে

বহির্বিশ্বের প্রতি বিমুখী হইয়া একান্তভাবে আপনাতেই নিবদ্ধ হয়, সেই আশঙ্কায় পণ্ডিতজী বলিলেন—"They must not think in narrow purely nationalistic terms,, although the nations of Asia must inevitably be nationalistic and must advance along the lines of their nationalism, they were facing bigger problems which could not be solved by nationalistic approach".

"তাঁহারা যেন কদাচ সঙ্কীর্ণ জাতীয় মনোভাবের বশবর্তী হইয়া কোন বিষয়ে চিন্তা না করেন; অবশ্য এশিয়ার জাতিসমূহের পক্ষে জাতীয় ভাবাপন্ন হওয়া অপরিহার্য এবং ইহাও অবিসম্বাদিত সত্য যে, তাহাদিগকে স্ব স্ব জাতীয় আত্মবিকাশের পথ অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, যে সব বৃহত্তর সমস্যা আজ তাহাদের সম্মুখীন কেবলমাত্র জাতীয় বিচার-বিবেচনার সাহায্যে তাহাদের সমাধান সম্ভবপর নয়।" বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক দর্শনে ভারতীয় চিন্তার বিশিষ্ট অবদান ইহাই। যুগ-যুগান্ত অর্জিত যে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা জাতীয় মনের অবচেতনে অন্তঃসলিলা ফল্গু ধারার মত প্রবাহিত, তাহাকে সঞ্জীবিত ও সচল রাখিতে হইবে সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক থাকিতে হইবে, যাহাতে সে প্রবাহ উদ্দাম ও কূলপ্লাবী হইয়া অপর কোন জাতির জীবন-তটে আঘাত না করে; জাতীয় জীবন প্রবাহ কূলে কূলে নিখিল কল্যাণ পরিবেশন করিয়া সর্বজাতির সাগর সঙ্গমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবে, জাতীয়তাবোধ সম্বন্ধে ভারতের নিজস্ব ধারণা ইহাই এবং এই আদর্শের দ্বারাই সমস্ত এশিয়াকে সে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিতে চায়।

ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োগ পরীক্ষা

ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে ইতিপূর্বে বিভিন্ন মঞ্চ হইতে বহুবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতাই ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি। জনসাধারণ তখন সে নীতিকে এই অর্থেই গ্রহণ করে যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে যেহেতু পূর্ব ও পশ্চিমী শক্তি ব্লক-দ্বয়ের কূটনৈতিক সতরঞ্চ খেলার ছক্ ছাড়া আর কিছু নয়, অতএব সযত্নে দূরে দাঁড়াইয়া নিরপেক্ষ দর্শকরূপে সে লীলা প্রত্যক্ষ করাই উক্ত নীতির মূল উদ্দেশ্য ও মুখ্য তাৎপর্য। বিশেষ করিয়া ভারতীয় রাজনীতিক মহলের তথাকথিত বামপন্থী অংশ সে নীতিকে উল্লিখিত অর্থেই গ্রহণ করেন এবং ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির উপর সেই অর্থ আরোপ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি ও তীব্র সমালোচনা পরিচালন করিতে থাকেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধ সমালোচনার মূল সূত্র ছিল এই যে, প্রথমতঃ বাস্তব ক্ষেত্রে এই নিরপেক্ষতার কোনই সার্থকতা নাই এবং দ্বিতীয়তঃ, নিরপেক্ষতা ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হিসাবে ঘোষিত হইলেও কার্য্যতঃ তাহার অভিমুখীনতা ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি ব্লকেরই অনুকূল; শুধু তাহাই নয়, কোন কোন মহল হইতে এমন অভিযোগও উত্থাপিত হইয়াছিল যে, পণ্ডিত নেহরু ভারতকে পশ্চিমী শক্তি ব্লকের অঙ্কে অর্পণ করিবার অগ্রিম প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাহাকে জড়িত করিবার সমূহ সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। এমন কি, ভারতীয় পার্লামেন্টের বিতর্ক ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত এই অভিযোগের প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়: পণ্ডিত নেহরু তাই সে

অভিযোগের প্রত্যুত্তর দিতে গিয়া পার্লামেণ্ট কক্ষে দাঁড়াইয়া একদা ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন: তিনি বলেন, ভারত শক্তি রকদ্বয়ের কোনটিরই পক্ষভুক্ত হইবে না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সে নিরপেক্ষতার অর্থ ইহা নয় যে, প্রবল কোন রাষ্ট্রের আক্রমণে দুর্বল কোন রাজ্যের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা বিপন্ন হইতে দেখিলেও অথবা রাষ্ট্র-বিশেষের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের ফলে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হইবার উপক্রম হইলেও ভারত নিরপেক্ষ দর্শকরূপে দূরে দাঁড়াইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিবে; ভারত সর্বশক্তি সম্বল করিয়া সে সম্ভাবনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতীয় নিরপেক্ষতার বিশদ ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্ট তাৎপর্য প্রদত্ত হইল বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সমালোচনার প্রখর রসনা ক্ষান্ত হইল না, সে সমান অধ্যবসায় ও আগ্রহের সহিত তাহার পূর্ব ঘোষিত অভিমতেরই অবিকল অনুবৃত্তি রটনা করিয়া চলিল। বস্তুতঃ অভিনব এই নীতির সার্থকতা ও প্রয়োগ সাফল্য সম্বন্ধে সংশয় পোষিত ও প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়, নিছক বাঁচিয়া থাকিবার তাগিদেই ভীতিগ্রস্ত দুর্বল দেশগুলি যেভাবে শক্তি রকদ্বয়ের মধ্যে বণ্টিত হইয়া তাহাদের সবল ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আশ্বস্ত হইতেছে তাহাতে দেশ বিশেষের পক্ষ হইতে ঘোষিত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা স্থাপন করিবার অক্ষমতা অমার্জনীয় অপরাধ নয়; কাজেই সে নীতির সার্থকতা বাস্তব পরিস্থিতির কষ্টিপাথরে যাচাই সাপেক্ষরূপে তখনকার মত স্থগিত রহিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে সে পরিস্থিতির উদ্ভব অধিক দিন বিলম্বিত হইল না এবং তাহা আবির্ভূত হইল কোরিয়া সঙ্কটের আকার পরিগ্রহ করিয়া। দক্ষিণ কোরিয়া সাধারণতন্ত্র একদা সহসা উত্তর কোরিয়া পিপ্‌লস রিপাব্লিকের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার আবেদন লইয়া সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের

প্রারম্ভ হইল। নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক সে আবেদন তৎক্ষণাৎ আলোচনার জন্য গৃহীত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে রচিত হইল সেই রাজনৈতিক মঞ্চ —ভারত যেখানে দাঁড়াইয়া তাহার গুরুত্বপূর্ণ ভাবী ভূমিকা অভিনয় করিবে, বাস্তব পরিস্থিতির কষ্টিপাথরে ঘর্ষিত হইয়া ভারতীয় পররাষ্ট্র-নীতির সক্রিয় প্রযোজ্যতা যেখানে যাচিত ও পরীক্ষিত হইবে। আক্রমণাত্মক এই ঘটনায় উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়া যে নিছক নিমিত্তমাত্র এবং তাহাদের মাধ্যমে যে বস্তুতঃ সোভিয়েট ও মার্কিণ স্বার্থই সংঘাতশীল হইয়া উঠিয়াছে, একথা বুঝিবার জন্য বিশেষ বুদ্ধি ব্যয় করিবার প্রয়োজন হয় না। বলা বাহুল্য, ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকটেও সে তত্ত্ব অবিদিত ছিল না। আলোচনান্তে নিরাপত্তা পরিষদের সম্মুখে এই মর্মে এক প্রস্তাব উপস্থাপিত হইল যে, উত্তর কোরিয়া গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ-কারী পক্ষরূপে অবিলম্বে ঘোষণা করা হউক। যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদের নিকটে উত্থাপিত তথ্য এবং নিজস্ব সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধিকে তাহা সমর্থন করিবার জন্য নির্দেশ দান করিলেন। পরিষদ কর্তৃক সে প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং গ্রহণ সংবাদ দক্ষিণ কোরিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর হইলে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট তাঁহারা এই মর্মে এক অত্যন্ত জরুরী আবেদন করিলেন যে, অবিলম্বে যদি সামরিক সাহায্য প্রেরিত না হয়, তাহা হইলে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে নিন্দা-জ্ঞাপক প্রস্তাব নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদরূপেই পরিষদের নথিপত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়া যাইবে। এই সংবাদ অবগত হইবার পর মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কালবিলম্ব করা আর সম্ভব হইল না, পরিষদের সম্মতির নিশ্চিত সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা জেনারেল ম্যাকআর্থারকে নির্দেশ দিলেন, জাপান হইতে তন্মুহূর্তে দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক সাহায্য প্রেরণ করিবার জন্য। সামরিক সাহায্য প্রেরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব

পরিষদের সম্মুখে যথাসময়ে উত্থাপিত হইল এবং তাহা গৃহীতও হইল। কোরিয়া যুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, উত্তর কোরিয়া কর্তৃক পরিচালিত এই আক্রমণ উভয় রাজ্যের মধ্যে অকস্মাৎ সংঘটিত সীমান্ত সজ্বর্ষ মাত্র নয়, পরন্তু সমগ্র দক্ষিণ কোরিয়া গ্রাস করিবার জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুতির উপর নির্ভর করিয়া ইহা এক পূর্ব-পরিকল্পিত ব্যাপক অভিযান এবং শক্তি ব্লকদ্বয়ের স্বার্থ সংঘাত হেতু বিশ্বসঙ্কট সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা এই আক্রমণের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। তাই দক্ষিণ কোরিয়ার অনুকূলে সামরিক সাহায্য প্রেরণের দ্বিতীয় প্রস্তাবও ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সমর্থিত হইল এবং পণ্ডিত নেহরু এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া পার্লামেণ্টে দাঁড়াইয়া বলিলেন—

"The fact was that aggression had taken place and once it was attempted to be justified, international law, which was so fragile, would break up and crumble. That would be a dangerous thing."

অর্থাৎ আক্রমণ বস্তুতঃ ঘটিয়াছে এবং একবার যদি সে আক্রমণের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের জন্য চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে অতিমাত্রায় ভঙ্গুর আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান সে মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে। সে সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে বিপদসঙ্কুল।

ভারত কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব সমর্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থী রাজনীতিক মহল হইতে তাহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইল এবং তৎসহ পণ্ডিত নেহরুর বিরুদ্ধে এ হেন গুরুতর অভিযোগও উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হইল যে, নিরাপত্তা পরিষদের কোরিয়া সম্পর্কিত প্রস্তাবদ্বয় সমর্থন করিয়া তিনি ভারতকে অসহায় ভাবে ইঙ্গমার্কিণ ব্লকের অঙ্কে নিক্ষেপ করিলেন এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাহাকে জড়িত করিবার

সুনিশ্চিত সম্ভাবনা রচনা করিয়া রাখিলেন; শুধু তাহাই নয়, মিশরীয় প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদে কোরিয়া সম্বন্ধীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে গিয়া আরব-ইজরাইল সংগ্রামে নিরাপত্তা পরিষদের নিক্রিয়তার বিরুদ্ধে যে অত্যুগ্র ভাষণ প্রদান করেন, তাহার সহিত ভারতীয় প্রতিনিধির বক্তৃতার তুলনামূলক বিচার করিয়া ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চলিতে লাগিল; নিরাপত্তা পরিষদে মিশরীয় প্রতিনিধির আচরণের আকস্মিক ও আমূল পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করিয়া সমালোচকদের সে উৎসাহ সম্ভবতঃ স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল, তাই ভারতীয় ও মিশরীয় প্রতিনিধির পরবর্তী আচরণের তুলনামূলক সমালোচনা বামপন্থী রাজনীতিক মহলের মন হইতে আর উত্থিত হইতে শোনা যায় নাই। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার হইল এই যে, ভারতের বামপন্থী রাজনীতিক দলগুলি যখন মার্কসীয় মতবাদের অত্যুৎসাহ বশে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গীরণ করিতেছে, খোদ সোভিয়েট সংবাদপত্রসমূহ তখন কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধির আচরণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নির্বাক। ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পূর্ব্ব বিঘোষিত পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবশে নিরাপত্তা পরিষদের কোরিয়া সম্পর্কিত প্রস্তাব সমর্থন না করিয়া পারিলেন না বটে, কিন্তু সেই সমর্থন জ্ঞাপনেই তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিসমাপ্ত হইল না, পরিষদের বাহিরে এবং ভিতরে তাঁহারা সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন কোরিয়া যুদ্ধকে তাহার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার উপায় সন্ধানের জন্য। সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রথমেই ইঙ্গ-মার্কিণ কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিলেন যে, কোরিয়া সঙ্কটের সমাধান প্রচেষ্টা সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের সমর্থন কেবলমাত্র কোরিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিবে এবং অন্যত্র অনুসৃত বৃটিশ ও মার্কিণ নীতির সহিত তাহার সম্পর্ক লেশমাত্র রহিবে না। কোরিয়া যুদ্ধে

হস্তক্ষেপ করিবার জন্য এবং উত্তর কোরিয়া গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণাত্মক অভিযান হইতে নিরস্ত করিবার জন্য বৃটিশ ও মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট ইতঃপূর্বে সোভিয়েট সরকারের নিকট যে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এই যুক্তিতে যে, কোরিয়া সংগ্রাম যেহেতু কোরিয়ার নিজস্ব ঘরোয়া ব্যাপার, অতএব বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের তাহা সম্পূর্ণ অযোগ্য। নিরাপত্তা পরিষদের ভারতীয় প্রতিনিধি সর্বপ্রথম উদ্যোগী হইলেন, 'ক্ষুদ্র কমিটির' মাধ্যমে সোভিয়েট সরকারের সমীপবর্তী হইবার জন্য, কিন্তু সেদিক হইতে বারোয়ারী প্রচেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে আশাপ্রদ কোন আভাস প্রাপ্ত না হওয়ায় পণ্ডিত নেহরু কোরিয়া সঙ্কটের শান্তিপূর্ণ সমাধান ও নিরাপত্তা পরিষদের অচল অবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য ব্যক্তিগত আবেদন লইয়া মঃ ষ্ট্যালিন ও মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডীন একিসনের সমীপস্থ হইলেন : তিনি প্রস্তাব করিলেন, শান্তিপূর্ণ উপায়ে কোরিয়া সঙ্কট সমাধানের পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইবে এবং নিরাপত্তা পরিষদে কমিউনিষ্ট চীনের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া উক্ত পরিষদে সোভিয়েট প্রতিনিধির পুনঃপ্রবেশের পথ প্রশস্ত করিতে হইবে।

পণ্ডিত নেহরুর চিন্তায় পারস্পরিক সর্ত সাপেক্ষ প্রস্তাবরূপে উল্লিখিত অনুরোধ দুইটির কোনই স্থান ছিল না ; নিরাপত্তা পরিষদে কমিউনিষ্ট চীনের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্পূর্ণ অন্য নিরপেক্ষ এক স্বতন্ত্র প্রস্তাব এবং সে প্রস্তাব ভারতীয় প্রতিনিধির আন্তরিক ও আগ্রহ ব্যাকুল সমর্থন লাভ করিয়াছে—বস্তুতঃ সংগ্রাম ক্ষেত্রের সূতিকাগারে কোরিয়া সঙ্কট ভূমিষ্ট হইবার বহু পূর্ব্বে। তথাপি উভয়পক্ষই পৃথক দৃষ্টিকোণ হইতে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সাপেক্ষতার সন্ধান পাইলেন, কাজেই সে সন্ধানের প্রতিক্রিয়া পত্রদ্বয়ের মধ্যে সঞ্জাত হইল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আকারে : সোভিয়েট সরকার

স্বার্থান্ধ দৃষ্টিকোন হইতে প্রস্তাব দুইটি নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে অলক্ষ্য যোগসূত্র আবিষ্কার করিল, তাই পণ্ডিত নেহরুর আবেদনের উদ্দেশ্যে স্বচ্ছন্দ সম্মতি ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইতে সে কালবিলম্ব করিল না ; পক্ষান্তরে মার্কিণ কর্তৃপক্ষ পণ্ডিত নেহরুর আন্তরিক সদিচ্ছা ও শান্তিপ্রিয়তা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় পোষণ না করিয়াও এ আশঙ্কা পরিহার করিতে সমর্থ হইলেন না যে, সোভিয়েট নিঃসন্দেহে কার্যতঃ পৃথক প্রস্তাব দুইটিকে সর্ত সাপেক্ষিক সূত্রে গ্রথিত করিয়া পণ্ডিত নেহরুর উদার আবেদনের অসদ্ব্যবহার করিতে উদ্যোগী হইবে। এই সংশয়ের বশবর্তী হইয়াই মিঃ ডীন একিসন পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাবে সম্মত হইবার পক্ষে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইলেন এই যুক্তিতে যে, কোরিয়া সঙ্কট ও চৈনিক প্রতিনিধিত্ব যেহেতু পরস্পর নিরপেক্ষ দুইটি পৃথক প্রশ্ন এবং কোরিয়া সঙ্কট যেহেতু উত্তর কোরিয়া পিপলস রিপাব্লিকের স্বহস্ত রচিত সমস্যা, অতএব তাহাদিগকে একত্র জড়িত না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা কর্তব্য এবং অবিলম্বে আক্রমণাত্মক অভিযান বন্ধ করিবার পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ তাচ্ছিল্যভাবে পদদলিত করিয়া উত্তর কোরিয়া গবর্ণমেণ্ট সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের মর্যাদার যে হানি করিয়াছে, আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ও আক্রমণকারী সেনাবাহিনীকে সীমান্ত রেখার পরপারে বিতাড়িত করিয়া যতক্ষণ না তাহা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়াই প্রস্তাব সমর্থনকারী রাষ্ট্রসমূহের প্রথম ও প্রধান করণীয় কার্য। বৃটেনের পক্ষ হইতেও মার্কিণ অভিমতেরই প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল এবং তাহার ফলে পণ্ডিত নেহরুর শান্তির আবেদন ব্যর্থ হইল বটে, কিন্তু পণ্ডিত নেহরুর এ উদ্যমের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ উত্থিত হইতে বিলম্ব হইল না। অবশ্য প্রতিবাদ এবার উত্থিত হইল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ হইতে : পণ্ডিত নেহরু এবার অভিযুক্ত হইলেন সোভিয়েট সন্তোষ বিধান প্রচেষ্টার অপরাধে।

ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে বাম ও দক্ষিণ দিক হইতে পর্যায়ক্রমিক আক্রমণ পরিচালিত হইতে থাকিল এবং পররাষ্ট্রনীতি তৎসত্ত্বেও উভয় আক্রমণ সমভাবে উপেক্ষা করিয়া মধ্যস্থল দিয়া পথ কাটিয়া চলিল অভীষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে। পার্লামেণ্টে বিরোধী পক্ষের তরফ হইতে একদিকে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির নিরপেক্ষতার আদর্শ ও অপরদিকে পণ্ডিত নেহরুর শান্তি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রশ্ন ও প্রতিবাদ উত্থাপিত হইলে পণ্ডিত নেহরু আর একবার নূতন করিয়া ওই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে সরকারী ধারণার ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন এবং নিরপেক্ষতা নীতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলিলেন,

'If we say we are permanently neutral, it has no meaning except permanent retirement from public affairs, in the national sense-sanyas.' অর্থাৎ, আমরা যদি নিরপেক্ষতার নীতি স্থায়ীভাবে অনুসরণ করি, তাহার একমাত্র অর্থ হইবে রাজনৈতিক জীবন হইতে স্থায়ীভাবে অবসর গ্রহণ এবং জাতীয় অর্থে তাহার নাম সন্ন্যাস। পণ্ডিত নেহরু বুঝাইতে চাহিলেন, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি বিবিধ স্বার্থ বন্ধনে পরস্পরের সহিত এরূপ ঘন সন্নিবদ্ধ যে, কোন একটি তন্ত্রীতে অঙ্গুলি আঘাত করিলে উচু সুরে বাঁধা বীণা-যন্ত্রের মত সমস্ত আন্তর্জাতিক যন্ত্রটি ঝঙ্কৃত হইয়া না উঠিয়া পারিবে না; এরূপ ক্ষেত্রে যে কোন জাতির পক্ষেই বিশ্ব ব্যাপার সম্বন্ধে স্থায়ী এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা স্বীকার করিয়া লওয়া অসম্ভব, শুধু তাহাই নয়, অবাস্তবও। এই কারণে ভারতীয় নিরপেক্ষতা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রাণহীন ও প্রেরণাহীণ নিষ্ক্রিয়তা নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে প্রস্তুত নয়; সে আন্তর্জাতিক জটিলতার প্রতিটি প্রশ্ন স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের গুণাগুণ বিচার করিয়া তৎসম্পর্কে স্বাধীন সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করিবে—শক্তি ব্লকদ্বয়ের স্বার্থ ও সম্মতি-অসম্মতি নিরপেক্ষভাবে। তথাকথিত বাম অথবা দক্ষিণ কোন পন্থার সহিতই ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতি অবিচ্ছেদ্যরূপে পরিণীত নয় বলিয়াই তাহাকে স্থায়ীভাবে কোন পক্ষ বিশেষের পার্শ্বে সর্বক্ষেত্রে দণ্ডায়মান দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই কারণে বিচার পদ্ধতি ও গৃহীত সিদ্ধান্ত সকল ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় আকারে আবির্ভূত হয় না এবং তজ্জন্যই কখনও বাম আবার কখনও বা দক্ষিণ দিক হইতে তাহাকে পর্যায়ক্রমিক আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হইতে হয়। সেই সক্রিয় নিরপেক্ষ নীতির উপর নির্ভর করিয়াই পণ্ডিত নেহরু কোরিয়া সঙ্কটের স্বরূপ ও সমাধান সম্পর্কে নিম্নলিখিত তিন দফা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অভিমত গঠন করিয়াছেন: (১) আক্রমণাত্মক অভিযান নিশ্চিতরূপে পরিচালিত হইয়াছে উত্তর কোরিয়ার পক্ষ হইতে এবং সে অভিযান সর্বথা নিন্দনীয়; (২) যুদ্ধকে কোরিয়ার বাহিরে কোনক্রমেই বিস্তৃত হইতে দেওয়া হইবে না এবং কোরিয়া সংগ্রামের সহিত অন্য কোন প্রশ্নকে জড়িত হইতে দেওয়াও চলিবে না; (৩) কোরিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইবে, কোরিয়বাসিগণের দ্বারাই। উল্লিখিত অভিমত-ত্রয় ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য পরিমাপের মাপকাঠি না হইলেও তাহার যথার্থ স্বরূপ ও সত্তা নির্ধারণের পক্ষে যে তাহারা নির্ভুল কষ্টিপাথর সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। মার্কিণের মুদ্রা ঝঙ্কার ও সোভিয়েটের শক্তি দম্ভ সমভাবেই উপেক্ষা করিয়া ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একান্তভাবে সেই পথই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে —তাহার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রিক মর্যাদার পক্ষে যাহা শোভন, আন্তর্জাতিক সঙ্কট সমাধানের পক্ষে যাহা সহায়ক এবং বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে যাহা কার্যকরী।

—–

চতুঃশক্তির পররাষ্ট্র মন্ত্রি-সম্মেলন

চতুঃশক্তির পররাষ্ট্র মন্ত্রিসম্মেলনের লণ্ডন অধিবেশন ব্যর্থতায় পরিসমাপ্ত হইল। জার্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার সহিত সম্পাদ্য সন্ধিসর্তের খসড়া রচনাই ছিল সম্মেলনের সম্মুখে প্রধান কর্মসূচী। কিন্তু সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনার বহু বিস্তীর্ণ পরিধির মধ্যে এমন এতটুকু স্থান তাঁহারা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই যেখানে মিলিত বৈঠকের জন্য আসর আহূত হইতে পারে। কাজেই বিশেষ কোন একটি বা একাধিক বিষয়ে মতানৈক্যকে ব্যর্থতার জন্য দায়ী করা চলে না, অসংগতি ও অসম্মতির আঘাতে আদ্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াই সম্মেলনে এই শোচনীয় পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। অবশ্য সম্মেলনের ব্যর্থতা আকস্মিকও নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়, শক্তি চতুষ্টয় বহু পূর্বেই ইহার পরিণতি নখ-দর্পণে পাঠ করিয়াছিলেন। কাজেই তজ্জন্য বিস্ময় বা বেদনা বোধ করিবার কোন হেতু নাই।

আমরা বিস্ময় বোধ করিতেছি এই কথা ভাবিয়া যে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার কোন একটি বিষয়েও সংশ্লিষ্ট পক্ষ-চতুষ্টয় একমত হইতে পারিলেন না কেন! আলোচনা প্রসঙ্গে বিতর্কের যে সকল বুদ্বুদ হেতুরূপে উপরিভাগে ভাসিয়া উঠিয়াছে, সেগুলি এমন লঘু, তুচ্ছ এবং নগণ্য যে, বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় সেগুলি আদৌ উত্থাপিত না হইলেই শোভন হইত।

মিঃ মার্শাল বলিয়াছেন, অষ্ট্রিয়া ও জার্মাণীর নিকট হইতে যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ বাবদ সোভিয়েট রাশিয়ার অত্যধিক ও অপূরণীয় দাবীই এই বিপর্যয়ের মূল কারণ; তাঁহার অভিযোগ, রাশিয়া অষ্ট্রিয়া হইতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের যে সকল যন্ত্রপাতি সরাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার

হিসাব-নিকাশ দাখিল করিতে সে অসম্মত। এরূপ ক্ষেত্রে অষ্ট্রিয়ার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ বাবদ তাহার প্রাপ্য অংশের সঠিক অঙ্কই বা নির্ধারিত হইবে কিরূপে উত্তরে মঃ মলোটভ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ উত্থাপন করিয়া বলেন, ব্রিটেন পশ্চিম জার্মাণী হইতে যে সব যন্ত্রপাতি অপসারিত করিয়াছে এককভাবে প্রত্যেকটি এবং সমবেত-ভাবে সব কয়টি বিষয়ে তাঁহাদের সম্পূর্ণ মতানৈক্য।

রুশ-প্রতিনিধি মঃ মলোটভ বলেন, সোভিয়েট রাশিয়া প্রস্তাব করিয়াছিল (১) জার্মাণীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অখণ্ডতা পুনঃ-সংস্থাপন করিতে হইবে, (২) আঞ্চলিক শাসন-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিতে হইবে, (৩) জার্মাণীর সহিত সন্ধি-সর্ত রচনা করিতে হইবে, এবং (৪) অবিলম্বে কেন্দ্রীয় জার্মাণ গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু ইঙ্গমার্কিণ-ফরাসী প্রতিনিধিগণ চারিটি প্রস্তাবের কোনটাই মানিয়া লইতে সম্মত হইলেন না।

মঃ মলোটভ কেবলমাত্র অসঙ্গতির বিবরণই ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার হেতু প্রদর্শন করিবার প্রয়াস পান নাই। আমরা কার্য ও তাহার কারণের আভাস পাই মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ মার্শালের উক্তি হইতে। তিনি বলেন, পশ্চিম ইউরোপের শক্তিত্রয় যে যে বিষয়ে সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, রুশ-প্রতিনিধি সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া তাহার বিরোধিতা করিয়াছেন। রুশ বিরোধিতাকে মার্শাল পরিকল্পনার সহিত যুক্ত করিয়া তিনি বলেন :

"It is for this very reason, I think, that we encounter such complete opposition to almost every proposal the Western Powers agreed on."

অর্থাৎ আমার মনে হয়, কেবলমাত্র এই কারণেই পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিত্রয়ের প্রত্যেকটি সম্মত সিদ্ধান্তকে এরূপ প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

বস্তুতঃ মার্শাল পরিকল্পনাই সকল সমস্যার সার কথা, সকল সাধনার মূল মন্ত্র; ইহার সাহায্যেই চতুঃশক্তির সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ অসঙ্গতির রহস্যভেদ সম্ভবপর। মার্শাল পরিকল্পনা কার্যতঃ ইউরোপকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছে এবং কোমিনফর্ম সেই বিভাগরেখাকে স্থায়িত্ব ও স্থূলতা দান করিয়াছে। মার্শাল পরিকল্পনা মূলতঃ সমগ্র ইউরোপের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে রচিত হইলেও, বিভক্ত ইউরোপ তাহার প্রভাবের পরিধিকে পশ্চিম-ইউরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়াছে। তাহার পূর্ব-ইউরোপে প্রবেশের পথে পর্বতপ্রমাণ বাধা সৃষ্টি করিয়া কোমিনফর্ম দণ্ডায়মান।

সমগ্র ইউরোপে জার্মাণী এবং অষ্ট্রিয়াই একমাত্র ক্ষেত্র, যেখানে চতুঃশক্তির স্বার্থ এবং প্রভাব পরস্পরের সহিত যুক্ত ও জড়িত। কাজেই মার্শাল পরিকল্পনার প্রয়োগ ও প্রতিরোধ লইয়া এই দুই স্থানেই সংগ্রাম যে তীব্রতর হইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। মঃ মলোটভ অভিযোগ করিয়াছেন, মিঃ মার্শাল, মিঃ বেভিন ও মঃ বিদো একটি নির্দিষ্ট সাধারণ পরিকল্পনা সম্মুখে রাখিয়াই লণ্ডন সম্মেলনে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাই রাশিয়ার কোন প্রস্তাবেই কর্ণপাত করা তাঁহারা প্রয়োজন মনে করেন নাই। বলাবাহুল্য, তাহা মার্শাল পরিকল্পনা ব্যতীত আর কিছু নয়।

সেই পরিকল্পনার পথরোধ করিবার উদ্দেশ্যেই সোভিয়েট প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন, সর্বাগ্রে জার্মাণীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অখণ্ডতা পুনঃস্থাপন করিতে হইবে, আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিতে হইবে, অবিলম্বে কেন্দ্রীয় জার্মাণ গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে হইবে এবং স্বাধীন জার্মাণীর সহিত সন্ধিসর্ত রচনা করিতে হইবে। ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী-প্রতিনিধিদের কিন্তু প্রস্তাবসমূহের ইঙ্গিত ও তাৎপর্য বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। এই মুহূর্তে আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত করিয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অখণ্ডতা পুনঃস্থাপন করিলে কেন্দ্রীয়

জার্মাণ গবর্ণমেণ্টের স্বরূপ কি হইবে তাহা তাঁহারা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন; তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, বামপন্থী দলসমূহের দ্বারা প্রভাবিত সোস্যালিষ্ট ভাবাপন্ন সে গবর্ণমেণ্ট আর যাহাই হোক, মার্শাল পরিকল্পনা চালু করাইবার পক্ষে উপযুক্ত মাধ্যম হইবে না। সোভিয়েটের প্রস্তাবে ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী প্রতিনিধিদের কর্ণপাত না করার ইহাই কারণ এবং মিঃ জর্জ মার্শাল সে সম্পর্কে কোনরূপ গোপনীয়তা অবলম্বন না করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন:

Agreements between sovereign states are generally the reflection and not the cause of genuine settlement."

অর্থাৎ, দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র সাধারণতঃ প্রকৃত আপোষনিষ্পত্তির প্রতিচ্ছায়া মাত্র, তাহার কারণ নয়।

পরিশেষে মিঃ মার্শাল এই কথা বলিয়া তাঁহার বক্তব্যের উপসংহার করিয়াছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষ এবং কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ একরূপ প্রকাশ্যেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, ইউরোপীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনা কোনক্রমেই কার্যকরী হইতে পারে না; পক্ষান্তরে তাঁহারা অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিবৃন্দ বিশ্বাস করেন, পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতা ও স্বাধীনতার পুনঃস্থাপন ধ্রুব, স্থির সুনিশ্চিত। সম্মেলনের এই পরিণতি দেখিয়া,তাহা ব্যর্থ হইয়াছে বলিলেই যথেষ্ট হইবে না, বস্তুতঃ তাহা বিরোধিতার এবং এমনকি পরস্পরের উদ্দেশ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান ও প্রতি আহ্বানে পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

কোমিনফর্মের প্রভাব ও পশ্চিম ইউরোপের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

অথচ এই সর্বাঙ্গীণ শোচনীয় পরিণতি প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও সম্মেলনের উদ্যোক্তারা উপসংহারে আশা প্রকাশ করিয়াছেন, সভা যদিও

না, মুলতুবী রহিল মাত্র; সুতরাং অচিরে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অনুকুল পরিবেশের মধ্যে অধিবেশনান্তরে মিলিত হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার এরূপ আশঙ্কাও প্রকাশিত হইয়াছে যে, ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী সম্ভবতঃ রাশিয়া ব্যতিরেকেই পশ্চিম ইউরোপের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে সচেষ্ট হইবে। আমাদের মনে হয়, এ আশঙ্কা আদৌ অমূলক নয়; পরন্তু মার্শাল পরিকল্পনা ও কোমিনফর্মের মাঝখানে যাহা কিছু ইঙ্গিত ও তাৎপর্য নিহিত আছে, তাহা আশঙ্কারই অনুকুল। কার্যতঃ কোমিনফর্ম ও মার্শাল পরিকল্পনাই বর্তমানে ইউরোপীয় রাজনীতির ধারক, বাহক ও নিয়ামক। এই দুইটি বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ দুইটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই তাহারা আসন্ন সংঘাতের জন্য সজ্জিত ও সংঘবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু উভয় পক্ষের বর্তমান অবস্থার তুলনামূলক বিচার করিলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সোভিয়েটই অধিকতর সুযোগ ও সুবিধাজনক অবস্থার অধিকারী। সে যখন দেখিল, মার্শাল পরিকল্পনাকে উপলক্ষ্য করিয়া ইউরোপের দ্বিধাবিভক্ত হওয়া অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী, তাঁহার সর্বপ্রথম চেষ্টা হইল, তাহার প্রভাবের পরিধির অন্তর্গত সমগ্র পূর্ব-ইউরোপকে ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসীর স্পর্শদোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত রাখা। সে কার্য সে এমন নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে নিষ্পন্ন করিয়াছে যে, সমগ্র পূর্ব ইউরোপে ত্রিশক্তির পদাঙ্গুষ্ঠ স্থাপনের উপযোগী স্থান পর্যন্ত আজ বিরল। শুধু এইটুকু করিয়াই সে নিরস্ত ও নিশ্চিন্ত রহিল না, শত্রু অধিকৃত অঞ্চলেও আপন প্রভাব প্রসারিত করিবার পথ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু তাহা করিতে গেলে প্রয়োজন কোন না কোন ধরণের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের। সঙ্গে সঙ্গে একদা স্বহস্তে জীবন্ত সমাহিত তৃতীয় আন্তর্জাতিকের শবদেহ কবর হইতে উত্তোলন করিয়া তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হইল এবং তাহার পর বিশ্বের বিস্ময়-বিমুগ্ধ

দৃষ্টির সম্মুখে ডায়ালেক্‌টিকের যাদুদণ্ড দোলাইয়া সে বলিতে লাগিল, আপনারা স্বচক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাহা কোমিণ্টার্ণ নয়, কোমিণ্টার্ণ বহু পূর্বে মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে, ইহা কোমিনফর্ম, পরিবর্তিত পৃথিবীর নূতন পরিবেশের মানস-সন্তান। নবজাত কোমিনফর্মের কল্যাণে পশ্চিম ইউরোপের ইতালী ও ফ্রান্স অতি দ্রুত সোভিয়েটের অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে। পূর্ব ইউরোপ মার্শাল-পরিকল্পনার পক্ষে দুর্ভেদ্য ও দুষ্প্রবেশ্য; পশ্চিম ইউরোপে তাহার প্রয়োগ এবং প্রসার যথাসাধ্য ব্যাহত ও বাধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে সোভিয়েট তাহার সমগ্র কূটনৈতিক কর্মতৎপরতা নিবদ্ধ করিয়াছে এই দুইটি দেশের উপর। সে চায়, শ্রমিক-অসন্তোষ ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়া ক্রমাগত ধর্মঘট দ্বারা এই দুইটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে এমন একটা অস্বচ্ছন্দতা ও অনিশ্চয়তা প্রতিনিয়ত জীয়াইয়া রাখিতে, যাহার ফলে মার্শাল পরিকল্পনার কল্যাণকর প্রভাব অনুভব করিবার অবকাশ মাত্র তাহারা না পায়। কে জানে, মার্শাল পরিকল্পনা সম্বন্ধে ইতালী ও ফ্রান্সের পরাজয়ী ও বিরুদ্ধ মনোভাব স্থানীয় সীমা লঙ্ঘন করিয়া ধীরে ধীরে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে কিনা; কে জানে, অতৃপ্ত ও অসন্তুষ্ট পশ্চিম ইউরোপ প্রতিকারের আশায় অবশেষে আত্মতুষ্ট পূর্ব-ইউরোপের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিবে কিনা!

বার্লিন চতুঃশক্তি নিয়ন্ত্রণ পরিষদ্

বার্লিনের চতুঃশক্তি নিয়ন্ত্রণ পরিষদের অস্তিত্ব বিপন্ন, শুধু তাহাই নয়, বিলোপের সম্মুখীন। গত ২০শে মার্চ তারিখে বার্লিনে উক্ত পরিষদের যে অধিবেশন বসে, তাহা হইতেই বর্তমান সঙ্কটের সূত্রপাত। অধিবেশনের প্রারম্ভেই সোভিয়েট প্রতিনিধি দলের নেতা দাবী উপস্থাপিত করেন, গত লণ্ডন কনফারেন্সে ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী কর্তৃক জার্মাণী সম্পর্কে যে আলোচনা পরিচালিত ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—তাহার বিশদ বিবরণ বর্তমান অধিবেশনের সম্মুখে স্থাপন করা হোক। স্মরণ থাকিতে পারে, জার্মাণীর সহিত সন্ধিপত্রের খসড়া রচনার উদ্দেশ্যে কিছুদিন পূর্বে লণ্ডনে যে সম্মেলন আহূত হয়, সোভিয়েট তাহা বর্জন করে এই যুক্তিতে যে, বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা একটি নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা সম্মুখে রাখিয়াই সে সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন, কাজেই উক্ত সম্মেলনে জার্মাণী সম্পর্কে কোনরূপ নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না; কারণ পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনাই যাহাতে জার্মাণী সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়—তাহাই হইবে ত্রিশক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টা। বলা বাহুল্য, নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা বলিতে সোভিয়েট রাশিয়া মার্শাল পরিকল্পনার প্রতিই কটাক্ষ করিয়াছিলেন। সোভিয়েটের সম্ভবতঃ মনে মনে সংশয় ছিল, তাহার অনুপস্থিতিতে ত্রিশক্তি জার্মাণী সম্পর্কে স্বতন্ত্র কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহসী হইবে না, কিন্তু ত্রিশক্তির পরবর্তী কার্যকলাপ দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল যে, সোভিয়েটের সে সংশয় নিতান্তই ভ্রমাত্মক; বৃটেন, মার্কিণ ও ফ্রান্স সোভিয়েট অনুপস্থিতি অগ্রাহ্য করিয়াই ত্রিশক্তি সম্মেলন আহ্বান করিলেন এবং সোভিয়েট নিরপেক্ষভাবেই জার্মাণীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। বার্লিন সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তসমূহের বিবরণই

সোভিয়েট প্রতিনিধি দাবী করিলেন। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিণ ফরাসী সে দাবী পূরণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল এই যুক্তিতে যে, সোভিয়েট যে সম্মেলন বর্জন করিয়াছে তাহাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বিবরণ দাবী করিবার তাহার কোনই অধিকারই নাই, কারণ তাহা একান্তভাবে ত্রিশক্তিরই ঘরোয়া ব্যাপার। এই প্রত্যাখ্যানের পর সোভিয়েট প্রতিনিধি দলের নেতা মার্শাল সোকোলোভস্কি সদলবলে সম্মেলন পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া যান: "পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিবৃন্দ তাঁহাদের কৃতকর্মের দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিলেন যে, জার্মাণীর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সম্পাদিত চুক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন, সুতরাং নিয়ন্ত্রণ পরিষদ এখন হইতে আর চতুঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন রহিল না,"—সম্মেলন পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ইহাই হইল সোভিয়েট প্রতিনিধির সর্ব্বশেষ মন্তব্য। মার্শাল সোকোলোভস্কি বিদায় লইবার পর জার্মাণীর যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণর জেনারেল লুসিয়াস ডি ক্লে আসিয়া সভাপতির পরিত্যক্ত শূন্য আসন গ্রহণ করিলেন এবং অবশিষ্ট ত্রিশক্তির প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া সম্মেলনের অধিবেশন অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিল। সম্মেলনে কার্যকরী কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল না বটে, তবে ভাঙ্গা হাট জাঁকাইয়া তুলিবার চেষ্টার দ্বারা ত্রিশক্তি সংশয়াতীতরূপে আর একবার এই কথাই সপ্রমাণ করিলেন যে,লণ্ডন সম্মেলনে সোভিয়েটের অনুপস্থিতি তাঁহারা যেভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ঠিক তেমনি করিয়াই বার্লিনে বসিয়া সোভিয়েট সহযোগিতা ব্যতিরেকে নিয়ন্ত্রণ পরিষদের কার্য চালাইয়া যাইতে তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জেনারেল লুসিয়াস ক্লে এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র গোপনীয়তা অবলম্বন না করিয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন,—

"We came into Berlin by right and we have every intention of staying."

. অর্থাৎ আমরা বার্লিনে প্রবেশ করিয়াছি স্বাধিকার বলে এবং স্বাধিকার বলেই এখানে অবস্থান করিবার অভিলাষ পোষণ করি।

অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না যে, নিয়ন্ত্রণ পরিষদের নিদানকাল সমুপস্থিত। কিন্তু তখন পর্যন্ত আশার একটি মাত্র সূক্ষ্ম সূত্রের উপর তাহার সমগ্র অস্তিত্ব ঝুলিতেছে। সভাপতি সভাগৃহ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়া যান যে, সভার বর্তমান অধিবেশন মুলতুবী রহিল সুতরাং পরবর্তীকালে ইহার পুনরধিবেশন যে সম্ভবপর এরূপ আশা পোষণ কবিবার ইহাই একমাত্র যুক্তি। সোভিয়েট কর্তৃক পরিষদ বর্জনের জবাবে ত্রিশক্তির পক্ষ হইতে কোন পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ সকলেই প্রত্যাশা করিতেছিলেন, এমন সময ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী একযোগে এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিলেন যে, যতক্ষণ না চতুঃশক্তির সামরিক গবর্ণর চতুষ্টয়েব উপস্থিতিতে পরিষদের পূর্ণ অধিবেশন আহূত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাব শাখা বা উপশাখা সমিতি-সমূহের কোন অধিবেশনে যোগদান করা হইতে বিরত থাকিবেন। এখন সমস্যা দাঁড়াইল এই যে, পরিষদে সভাপতিত্ব করিবার অধিকার পালাক্রমে শক্তি চতুষ্টয়ের হাতে আসে এবং বর্তমানে সে অধিকার সোভিয়েট প্রতিনিধির সম্ভোগ্য। সুতরাং সভাপতিরূপে পরিষদেব সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করিবার পক্ষে একমাত্র যোগ্যতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ তিনিই। কিন্তু যে ব্যবস্থার প্রতিবাদে এই সন্থ তিনি পরিষদ বর্জন করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন এত অল্প সময়ের মধ্যে পুনরায় তাহার সম্মুখীন হইবেন কোন আশায় ও অজুহাতে! সুতরাং বর্তমান সভাপতি যে পরিষদের পূর্ণ অধিবেশন আহ্বান করিবেন না, ইহা সুনিশ্চিত এবং ইহাও নিশ্চিততর যে, কোন শাখা সমিতির অধিবেশন আহূত হইলেও, বৃটেন, মার্কিণ ও ফরাসী প্রতিনিধি তাহা সম্মিলিতভাবে বর্জন করিবেন। এরূপ অবস্থায় পরিষদ বস্তুতঃ বিলুপ্ত না হইলেও, নিয়মতান্ত্রিকতার দিক

হইতে তাহা নিষ্ক্রিয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। আশার কথা এই যে, পরিষদের সভাপতির আসন আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মার্কিণ প্রতিনিধির অধিকারে যাইবে; পরিষদের পূর্ণ অধিবেশন আহ্বান করিয়া তিনি নিয়মতান্ত্রিক অচল অবস্থা দূরীভূত করিতে পারেন সত্য, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সোভিয়েট অসহযোগের সম্ভাবনা সমপরিমাণে রহিয়া যায়। ত্রিশক্তি অবশ্য অতীতে তৎসত্ত্বেও স্বতন্ত্রভাবে আপনাদের অভীষ্টপথে অগ্রসর হইয়াছেন এবং সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও হইবেন, কিন্তু তাহার অপরিহার্য ফল হইবে এই যে, যুদ্ধোত্তর ইউরোপের পুনরুন্নয়নের জন্য পটস্‌ডাম চুক্তি চতুঃশক্তির হাতে যে যৌথ দায়িত্ব তুলিয়া দিয়াছিল, তাহা হস্তচ্যুত ও ভূপতিত হইয়া কাঁচের বাসনের মত খণ্ডে খণ্ডে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

অতঃপর নিয়মতান্ত্রিকতার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করা যাক। সোভিয়েট প্রতিনিধি নিয়ন্ত্রণ পরিষদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব জার্মাণীর সোভিয়েট সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র বড় হরফের শিরোনামায় নিম্নলিখিত সংবাদ পরিবেশন করিল:

"Western Powers destroy control Council: Control Council for all practical purposes exists no longer, as the organ of the highest Power in Germany."

অর্থাৎ, পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ পরিষদের ধ্বংস সাধন: জার্মাণীর সর্ব্বোচ্চ শাসন পরিষদের মুখপাত্ররূপে নিয়ন্ত্রণ পরিষদের অস্তিত্ব কার্যতঃ বিলুপ্ত। পূর্ব্ব জার্মাণীর কমিউনিষ্ট পার্টি এ ঘোষণার সুযোগ গ্রহণ করিতে দিনমাত্র বিলম্ব করিল না: অত্যন্ত তৎপরতার সহিত তাহারা এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিল যে, জার্মাণীর আত্মসমর্পণের পর সার্ব্বভৌম ক্ষমতা চতুঃশক্তি নিয়ন্ত্রণ পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হয়, কাজেই পরিষদ যদি বিলুপ্ত হয়, সে ক্ষমতা

তাহার আদিম তুণে, অর্থাৎ জনসাধারণের হাতে প্রত্যাবর্তন করিবে এবং জার্মাণ জনসাধারণের পক্ষ হইতে সে ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিবার জন্য জার্মাণ কমিউনিষ্ট পার্টি প্রস্তুত। এই উদ্দেশ্যে অত্যন্ত দ্রুততার সহিত কমিউনিষ্ট প্রভাবিত পিপলস্ কংগ্রেস গড়িয়া তোলা হইল এবং মনে হইল, সমগ্র জার্মাণীতে সাম্যবাদী রাষ্ট্রবিপ্লব বুঝি আসন্ন। সত্যগঠিত পিপলস্ কংগ্রেস সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের সুস্পষ্ট মনোভাব ব্যর্থ হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় সেক্রেটারী অব ষ্টেট জর্জ মার্শালের বিবৃতিতে : তিনি বলিলেন,—

"The Communist dominated Self-styled Peoples' Congress set up in the Russian occupation zone is an illegitimate device to cruelly deceive the German people."

অর্থাৎ, রুশীয় অধিকৃত অঞ্চলে কমিউনিষ্ট প্রভাবিত যে স্বয়ংসিদ্ধ পিপলস্ কংগ্রেস গঠিত হইয়াছে, জার্মাণ জনসাধারণকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য ইহা এক নীতিবিরুদ্ধ কৌশল মাত্র। সেই বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি একথাও স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিলেন যে খণ্ডিত জার্মাণীর অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য সম্পাদনের নিমিত্ত চতুঃশক্তি যে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সোভিয়েট রাশিয়া নিয়ন্ত্রণ পরিষদ বর্জন করিয়া কার্যতঃ তাহার মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন; কিন্তু এ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তব্য সুস্পষ্ট : আমেরিকা নিয়ন্ত্রণ পরিষদের অন্যতম সদস্যরূপেই বার্লিনে অবস্থান করিয়া আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী আপন দায়িত্ব বহন ও উদ্‌যাপন করিতে বদ্ধপরিকর। বৃটেন ও ফরাসীও অনতিবিলম্বে আমেরিকার এই অভিমতের স্বপক্ষে সমর্থন জ্ঞাপন করিলেন এবং ত্রিশক্তির এই দৃঢ় অভিমত দ্ব্যর্থবোধহীন ভাষায় ব্যক্ত হইবার পর কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে শাসন ক্ষমতা অধিকারের জন্য অগ্রসর হইবার কোন লক্ষণ আজও প্রকাশ পায় নাই। শুধু তাহাই নয়, নিয়ন্ত্রণ পরিষদ সম্পর্কে এমন কি

সোভিয়েটের কণ্ঠস্বরও কয়েক পর্দা নামিয়া আসিয়াছে; সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ জানাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিনিধি পরিষদ বর্জন দ্বারা তাহার বিলোপসাধন স্থচিত হয় না বরঞ্চ তাঁহারা মনে করেন যে, সমগ্র ইউরোপের কল্যাণে তাহার সক্রিয় অস্তিত্ব একান্ত আবশ্যক। কিন্তু বর্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ সমস্যা হইল ইহাই যে, নিয়ন্ত্রণ পরিষদের সাধারণ সভার অনুপস্থিতির দরুণ বার্লিনে সম্প্রতি সাধারণ কোন শাসন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নাই। তাহা ছাড়া সোভিয়েট যদি ইচ্ছা করে তাহা হইলে সমগ্র রেলওয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া ত্রিশক্তির পক্ষে পশ্চিম ইউরোপের খাদ্য সরবরাহের পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিতে পারে। সেক্ষেত্রে শূন্যপথে একমাত্র বিমান বহরের সাহায্যেই যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখা সম্ভবপর এবং সে পথও যদি বন্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে সোভিয়েটকে বিমান আক্রমণ করিবার ঝুঁকি লইতে হইবে। কিন্তু প্রশ্ন হইল, সোভিয়েট এই চূড়ান্ত সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সাহসী হইবে কি? জার্মাণীর ভবিষ্যতের উপরেই বস্তুতঃ সমগ্র ইউরোপের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

———

বার্লিন অবরোধের অবসান

বার্লিন-অবরোধ-ব্যবস্থার পটভূমি

বার্লিন-অবরোধ-ব্যবস্থা ১৯৪৮ সালের পয়লা মার্চ তারিখে কার্যতঃ প্রবর্তিত হইলেও, সে বিরোধের প্রথম সূত্রপাত পরিলক্ষিত হয় ১৯৪৫ সালের ৩রা জুলাই হইতে। তাহার পরদিন, অর্থাৎ, ৪ঠা জুলাই তারিখে পরাজিত জার্মাণীর বুকের উপরে বিজয়ী সৈন্য-বাহিনীর কুচকাওয়াজ হইবার কথা: সোভিয়েট সেনাদল পূর্বদিক হইতে বার্লিনে প্রবেশ করিয়া সোভিয়েট সীমান্তবর্তী হেম্‌ষ্টেডে অপেক্ষা করিতেছে: কুচকাওযাজে যথা সময়ে উপস্থিত হইবার জন্য আমেরিকার দ্বিতীয় যান্ত্রিক বাহিনী প্রবল বর্ষণের মধ্যে দ্রুতবেগে পূর্বাভিমুখে ধাবিত হইতেছে; সহসা হেম্‌ষ্টেডে উপনীত হইয়া তাহারা দেখে, অগ্রবর্তী সোভিযেট সীমান্ত-রক্ষী সৈন্যদল তাহাদের পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান। সোভিযেট সৈনানায়ক বলিলেন, তাঁহার কর্তৃপক্ষের আদেশ, প্রত্যেকটি যানবাহন ও মানুষ গণনা কবিয়া দেখিতে হইবে যে, পূর্ব-প্রদত্ত সংখ্যার সহিত তাহা মিলে কিনা। মার্কিন যান্ত্রিক বাহিনীকে অগত্যা গণনা সমাপ্ত হইবার জন্য প্রবল বর্ষণ মাথায় করিয়া প্রায় সাত ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিতে হইল। অথচ ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী বাহিনীর বার্লিন-প্রবেশ আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত দৈব-দুর্ঘটনা নয়, পূর্ব-সম্পাদিত চুক্তির তাহা সর্ব-সম্মত ফল। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপীয় এডভাইসরী কমিশনের লণ্ডন অধিবেশনে সর্বপ্রথম সাব্যস্ত হয় যে, সমগ্র জার্মাণীকে চতুঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন চারিটি স্বতন্ত্র অঞ্চলে বিভক্ত করা হইবে এবং বার্লিন সেই সাগরগর্ভে হইবে চতুঃশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র একটি

দ্বীপ বিশেষ। সে সিদ্ধান্ত প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট, প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ও জেনারেলিসিমো ষ্ট্যালিন কর্তৃক ইয়াল্টায় সমর্থিত হয় এবং সোভিয়েট অঞ্চলের অভ্যন্তরে যে মার্কিন সেনাদল ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট তাহাদিগকে মার্কিন সীমায় সরাইয়া লইতে সম্মত হন এই সর্তে যে, মার্কিন সেনাবাহিনীকে বার্লিন-প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় রেল ও বিমান-পথ ব্যবহারের অধিকার দান সম্পর্কে সামরিক চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে। মঃ ষ্ট্যালিন সে সর্তে সম্মত হইলে মার্কিন, বৃটিশ ও সোভিয়েট সামরিক কর্তৃপক্ষ ২৯শে জুন তারিখে এই সিদ্ধান্তে সম্মত হইলেন যে, পশ্চিম হইতে বার্লিনে প্রবেশের জন্য বার্লিন-ম্যাগডিবার্গ রেল-রাস্তা ও সড়কই হইবে একমাত্র ব্যবহার্য পথ। এবং বিমানপথ সম্বন্ধে ইহাই স্থির হয় যে, একটি পথ হইবে—ফ্রাঙ্কফুর্ট হইতে ম্যাগ-ডিবার্গ হইয়া বার্লিন এবং অপরটি হইবে হ্যানোভার হইতে বার্লিন। তৃতীয় এবং সর্বশেষ চুক্তির দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, বার্লিনের রুশ-অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে আহার্য ও অন্যান্যবিধ দ্রব্য-সম্ভার সরবরাহের দায়িত্ব পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের।

চতুঃশক্তির মধ্যে বিরোধ ও বার্লিন-অবরোধ-ব্যবস্থার দিকে ঘটনার গতি

কিন্তু বার্লিন-চতুঃশক্তি-নিয়ন্ত্রণ-পরিষদকে কেন্দ্র করিয়া শীঘ্রই শক্তি চতুঃষ্টয়ের মধ্যে বিষম বিরোধ বাধিয়া উঠিল এবং তাহার ফলে বার্লিন পরিণত হইল যুদ্ধকালীন সহযোগিগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধের মল্লক্ষেত্রে। তদুপরি পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপ সংক্রান্ত বৃহত্তর বিরোধের সংঘাত বার্লিন-বিরোধকে তীব্রতর করিয়া তুলিল। সোভিয়েট বার্লিনে সর্বপ্রকার সরবরাহ প্রেরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া চতুঃশক্তি নিয়ন্ত্রণ-পরিষদকে একরূপ নিষ্ক্রিয় করিয়া তুলিল এবং ক্ষতিপূরণের অঙ্ক ধার্য হইবার

পূর্বেই পূর্ব-বার্লিনের ধন-সম্পদ ও যন্ত্রপাতির অবাধ লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়া দিল। অথচ পটসডাম-চুক্তি-অনুযায়ী সমগ্র জার্মানীকে একটি মাত্র অর্থনৈতিক সংস্থা-রূপে গণ্য করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশ্চাত্য শক্তিত্রয় পটসডাম-চুক্তির সর্তাবলীর কথা সোভিয়েটকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েটপক্ষ হইতে যখন কোনরূপ সাড়া পাওয়া গেল না, মার্কিন সেক্রেটারী অব ষ্টেট্স জেমস বার্ণেস তখন ১৯৪৬ সালে জুন মাসে প্রস্তাব করিলেন যে, সোভিয়েট যদি সমগ্র জার্মাণীর অর্থনৈতিক ঐক্য-বিধানে সম্মত না হয়, তাহা হইলে অন্যান্য সকলে—যাঁহারা সম্মত, তাঁহাদের কর্তব্য হইতেছে,এই মুহূর্তে সে কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা। তদনুযায়ী বৃটেন এবং আমেরিকা ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে জার্মাণীর শিল্পকেন্দ্র 'রুড়' সমেত স্ব স্ব অঞ্চল দুইটিকে একটি যুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমলে আনিল। অত্যন্ত দুর্বল আকারে হইলেও জার্মাণ ষ্টেট গবর্ণমেণ্ট সমূহ গড়িয়া তুলিল এবং ১৮৪৭ সালের গোড়ার দিকে ত্রিশক্তি মিলিয়া পশ্চিম জার্মাণীর প্রচলিত পুরাতন মার্কের পরিবর্তে এক পৃথক মুদ্রানীতি প্রবর্তনের পরিকল্পনা রচনা করিল। পশ্চিম জার্মাণীর অর্থনৈতিক ঐক্য সম্পাদিত হইবার পর পাশ্চাত্য শক্তিত্রয় তাহার রাজনৈতিক অখণ্ডতা সম্পাদনে উদ্যোগী হইলেন এবং জার্মাণদিগকে পশ্চিম-জার্মাণীর জন্য একটি শাসনতন্ত্র রচনায় প্রত্যক্ষ-ভাবে উৎসাহিত করিলেন। তদনুযায়ী জার্মাণ রাজনীতিকগণ শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে বন (Bonn) নামক স্থানে ১৯৪৭ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর তারিখে সম্মিলিত হইলেন। পশ্চিম জার্মাণীর স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক সংগঠনের প্রচেষ্টাই সোভিয়েটকে যথেষ্ট পরিমাণে সচকিত করিয়া তুলিয়াছিল, এইবারে রাজনৈতিক পুনর্গঠনের প্রশ্ন বাস্তবক্ষেত্রে আসিয়া পড়ায়, ধৈর্য ধারণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। ইতিমধ্যে জার্মাণীর ভাগ্য নির্ধারণের জন্য লণ্ডনে চতুঃশক্তির পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন

আহূত হইল, কিন্তু সোভিয়েট তাহা বর্জন করিল এই কারণে যে, পটস্‌ডাম চুক্তির মূলনীতি অগ্রাহ্য করিয়া জার্মাণীকে খণ্ডিত ও বিভক্ত করিবার যে পরিকল্পনা পাশ্চাত্য শক্তিত্রয় রচনা করিয়াছেন, লণ্ডন সম্মেলনের কার্যসূচী রচিত হইয়াছে তাহাই সম্মুখে রাখিয়া এবং তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই সম্মেলনের আলাপ-আলোচনা পরিচালিত হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া অনিষ্টকর ষড়যন্ত্রের অংশভাগী হইতে সোভিয়েট অসম্মত হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সোভিয়েট-পররাষ্ট্র-সচিবের অনুপস্থিতি অগ্রাহ্য করিয়াই লণ্ডন-সম্মেলন সমাপ্ত হইল এবং তাহার ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে যে তিক্ত মনোমালিন্য পুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার প্রতিক্রিয়া অচিরে গিয়া পতিত হইল বার্লিন-চতুঃশক্তি নিয়ন্ত্রণ পরিষদের উপর: সোভিয়েট কম্যাণ্ড্যাণ্ট মার্শাল সোকোলোভ্‌স্কি ২০শে মার্চ তারিখে উক্ত পরিষদ-কক্ষে দাঁড়াইয়া বলিলেন যে, পাশ্চাত্য শক্তিত্রয় স্বতন্ত্র পশ্চিম জার্মাণ গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া বার্লিনে অবস্থান করিবার অধিকার হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন; তিনি সদলদলে পরিষদ কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বার্লিন-চতুঃশক্তি-নিয়ন্ত্রণ-পরিষদ অতঃপর কার্যতঃ নিষ্ক্রিয় হইয়া গেল এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, চরম সঙ্কট অতিদ্রুত ঘনাইয়া আসিতেছে।

বার্লিন-অবরোধের সূত্রপাত

১৯৪৮ সালের পয়লা মার্চ তারিখে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন, বার্লিন প্রবেশ ও পরিত্যাগ করিবার পূর্বে পাশ্চাত্য শক্তি-বর্গের প্রতিটি বিমান, ট্রেণ ও ব্যক্তিকে তল্লাসী করা হইবে। ২রা এপ্রিল তারিখে এই মর্মে আর একটি নির্দেশ প্রচারিত হইল যে, পূর্বাহ্নে সোভিয়েট 'পারমিট' সংগ্রহ করিয়া জল অথবা স্থল পথে কোন ডাক

অথবা মালবাহী যানবাহন বার্লিন প্রবেশ অথবা পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। ত্রিশক্তির সামরিক ট্রেণ চলাচল কার্যতঃ এই দিন হইতেই বন্ধ হইয়া গেল এবং সোভিয়েট অবরোধ ব্যবস্থার প্রতিবাদে তাঁহারা ১৮ই জুন তারিখে পশ্চিম জার্মাণীর জন্য স্বতন্ত্র মুদ্রানীতি প্রবর্তনের সংবাদ ঘোষণা করিলেন। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে সোভিয়েট একটি দিন মাত্র সময় লইল এবং ২৩শে জুন তারিখেই ঘোষণা করিল যে, পাশ্চাত্য শক্তিত্রয়ের যে কোন যানবাহন অথবা ব্যক্তির পক্ষে জল এবং স্থল পথে বার্লিন প্রবেশ নিষিদ্ধ। পশ্চিম বার্লিন এই দিন হইতেই কার্যতঃ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল এবং তথাকার কুড়ি লক্ষ অধিবাসীর আহার্য ও অন্যান্য প্রযোজনীয দ্রব্যসম্ভার সববরাহের জন্য একমাত্র আকাশপথ ব্যতীত ত্রিশক্তিব সম্মুখে আর কোন পথই উন্মুক্ত রহিল না। তাঁহাবা সোভিযেট 'চ্যালেঞ্জ' সাহসিকতার সহিত গ্রহণ করিলেন এবং ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসীব মিলিত বিমান-বলেব সাহায্যে পশ্চিম বার্লিনের সরবরাহ-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইলেন।

২১শে জুন তাবিখে সোভিযেট গভর্ণমেণ্ট পূর্ব-বার্লিনেব জন্য এক স্বতন্ত্র মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন এবং দাবী জানাইলেন, ইহাকেই সমগ্র বার্লিনের মুদ্রা-ব্যবস্থারূপে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এই সর্তে যে, উক্ত মুদ্রা প্রণয়ন ও প্রচলন নিয়ন্ত্রিত হইবে একা সোভিযেটের দ্বারা নয়, চতুঃশক্তির সাধারণ নিয়ন্ত্রণাধীনে। সোভিয়েট পক্ষ হইতে সে প্রস্তাবে কোনই সাড়া আসিল না। পাশ্চাত্য শক্তিত্রয় অবরোধ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের নিকট সরকারীভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইলেন ১২ই জুলাই তারিখে এবং সোভিয়েট সরকারের নিকট হইতে তাহার যে জবাব আসিল—তাহা যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি সুস্পষ্ট। তাঁহারা বলিলেন, সোভিয়েট-অধিকৃত পূর্ব জার্মাণীর সমুদ্রবক্ষে বার্লিন

দ্বীপরূপে অবস্থিত বলিয়া বস্তুতঃ তাহা সোভিয়েট অধিকারভুক্ত স্থান এবং পাশ্চাত্য শক্তিত্রয় জার্মাণীকে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তথায় অবস্থান করিবার নৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

বার্লিন সমস্যা সমাধানের শেষ চেষ্টা

অতঃপর বার্লিন সমস্যা সমাধানের শেষ-চেষ্টাস্বরূপ মঃ ষ্ট্যালিনের সহিত আলাপ আলোচনার জন্য ত্রিশক্তির তিনজন রাষ্ট্রদূত মস্কো যাত্রা করিলেন এবং তথায় গিয়া যে সুদীর্ঘ আলোচনায় তাঁহারা প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া আমরা কেবল সেই হেতু-গুলিই পর্যালোচনা করিব, যাহার জন্য আপ্রাণ যত্ন ও আয়াস সত্ত্বেও আলাপ-আলোচনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ ওয়াল্টার বেডেল স্মিথ ২রা আগষ্ট তারিখে ক্রেমলিনে উপস্থিত হইয়া পাশ্চাত্য শক্তিত্রয়ের পক্ষ হইতে মঃ ষ্ট্যালিনের হাতে একটি লিখিত বিবৃতি অর্পণ করেন; বিবৃতিটি সংক্ষিপ্ত হইলেও সুতীক্ষ্ণ; তাহার বক্তব্য বিষয় ছিল এই যে, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ স্বাধিকার-বলে বার্লিনে প্রবেশ করিয়াছেন এবং স্বাধিকার-বলেই তাঁহারা তথায় অবস্থান করিতে বদ্ধ-পরিকর; সুতরাং কোনরূপ বলপ্রয়োগ অথবা ভীতি-প্রদর্শনই তাঁহাদিগকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবে না; ত্রিশক্তি যে দৃষ্টি দিয়া বার্লিন-অবরোধ ব্যাপারটিকে অবলোকন করেন, মিঃ বেডেল স্মিথ সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং পরিশেষে এই আশ্বাস দিয়া বিবৃতির উপসংহার করিলেন যে, পাশ্চাত্য শক্তিত্রয়ের পক্ষ হইতে যদি কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়া থাকে, বার্লিন-অবরোধের অবসান ঘটিলেই তৎসমুদয় প্রত্যাহৃত হইবে।

মঃ ষ্ট্যালিন দৃঢ়তার সহিত এ কথা বলিলেন বটে যে, পাশ্চাত্য শক্তি-

বর্গকে বার্লিন হইতে বহিষ্কৃত করিবার কোনরূপ অভিপ্রায় সোভিয়েটের নাই, কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিলেন যে, ফ্রাঙ্কফুর্টে পশ্চিম জার্মাণ গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবার উদ্যোগ ও পশ্চিম বার্লিনে স্বতন্ত্র মুদ্রানীতি কার্যতঃ প্রবর্তন করিবার পর বার্লিন অবস্থান করিবার অধিকার তাঁহাদের আর নাই।

প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী আলোচনার পর মঃ ষ্ট্যালিন বলিলেন, ত্রিশক্তি যদি নিম্নলিখিত সর্ত দুইটিতে সম্মত হন, তাহা হইলে বিরোধের মীমাংসা এই মুহূর্তেই সম্ভব হইতে পারে ঃ

(১) পশ্চিম বার্লিনের স্বতন্ত্র মুদ্রা-ব্যবস্থা তুলিয়া লইয়া তৎস্থলে সমগ্র বার্লিনের জন্য সোভিয়েট-মুদ্রানীতি গ্রহণ করিতে হইবে। এবং (২) পশ্চিম জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট গঠনের প্রযাস পরিহার যদিও বার্লিন-অবরোধ-প্রত্যাহারের অগ্রিম পূরণীয সর্তরূপে সাব্যস্ত হইতেছে না, তথাপি সোভিয়েট মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তৎসম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বিলম্বিত করিতে হইবে।

রাষ্ট্রদূতত্রয় স্ব স্ব গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া মঃ মলোটভের সহিত চুক্তি-রচনায প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু কার্যকালে মঃ মলোটভ এমন সব সর্তের অবতারণা করিলেন, যাহা মঃ ষ্ট্যালিন-নির্ধারিত সর্ত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহার ফলে চুক্তিপত্র-রচনার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।

পাশ্চাত্য শক্তিত্রয়ের নিকট সোভিয়েটের সর্তহীন নতিস্বীকার

কিন্তু আজ যে তিনটি সর্তকে ভিত্তি করিয়া অবরোধ-ব্যবস্থা কার্যতঃ প্রত্যাহৃত হইল, সোভিয়েটের প্রাক্তন দাবী পূরণের পক্ষে তাহা যে শুধু অকিঞ্চিৎকর তাহাই নয়, তাহার প্রাক্তন মূল সর্তাবলীর অস্তিত্বই আর

তাহার মধ্যে রহিল না ; কারণ সোভিয়েট যখন বার্লিন অবরোধ-অবসানে সম্মতি দান করিল তখন পশ্চিম জার্মান গবর্ণমেণ্টের ভাবী শাসনতন্ত্র রচনার কার্য সমাপ্ত হইয়াছে এবং পশ্চিম বার্লিনের স্বতন্ত্র মুদ্রা ব্যবস্থা তখনও সগৌরবে বলবৎ।

ইহাকে পাশ্চাত্য শক্তিত্রয়ের অনমনীয় দৃঢ়তার নিকট সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সর্তহীন নতিস্বীকার বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

বার্লিন অবরোধ-অবসানে সোভিয়েটের নতিস্বীকারের কারণ কি ?

কিন্তু সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের এই দুর্বলতা ও ভয়-বিহ্বলতার হেতু কি ?

কোন কোন রাষ্ট্রধুরন্ধর সদ্য সম্পাদিত আতলান্তিত চুক্তির উপরেই ইহার কৃতিত্ব আরোপ করিয়াছেন। কারণ যাহাই হোক, কার্য দেখিয়া যে দুইটি প্রধান প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগ্রত হয়, তাহা হইল এই।

(১) বর্তমান চুক্তির বলে আপাততঃ বার্লিন-বিরোধের অবসান হইল সত্য, কিন্তু তাহার দরুণ পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপ লইয়া যে বৃহত্তর বিরোধ বিদ্যমান, তাহার মীমাংসার পথ সুগম হইবে কি ?

(২) বার্লিন-সঙ্কট সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ হইল বটে, কিন্তু তাহার ফলে বিশ্বসঙ্কট-সমাধানের পথ প্রশস্ততর হইবে কি ?

অদূর ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর গর্ভে এই প্রশ্ন দুইটির সদুত্তর নিহিত রহিয়াছে।

———

বেভিন পরিকল্পনা

চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র মন্ত্রি সম্মেলনের লণ্ডন অধিবেশন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। জার্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধিপত্র রচনাই ছিল সম্মেলনের সম্মুখে প্রধান কার্যসূচি, কিন্তু দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার বহু বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কোন একটী প্রস্তাবেও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রতিনিধিবর্গের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। অবশ্য এ ব্যর্থতা তাঁহাদের পক্ষে আদৌ আকস্মিক অথবা অপ্রত্যাশিত নয়; বরঞ্চ সম্মেলনের কার্যক্রম অনুধাবন করিলে এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হয় যে, সম্মেলনের শেষকৃত্য সম্পন্ন করিবার সঙ্কল্প লইয়াই তাঁহারা লণ্ডনে সমবেত হইয়াছিলেন। মার্শাল পরিকল্পনা সম্পর্কে সোভিয়েটের মনোভাব ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী কর্তৃপক্ষের অবিদিত নয়; তৎসত্ত্বেও পরিকল্পনার রচয়িতা স্বয়ং মার্শাল সাহেবকে পুরোভাগে রাখিয়া আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার একটী মাত্র সরল ও সুস্পষ্ট অর্থ হইতে পারে এবং তাহা হইল এই যে, সোভিয়েট মনোভাবের প্রতি অনুমাত্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে তাঁহারা সম্মত নহেন। ইচ্ছাকৃত এই উপেক্ষায় সোভিয়েট প্রতিনিধির যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিলেন: গুণাগুণ বিচার বিরহিত হইয়াই ত্রিশক্তি কর্তৃক উত্থাপিত প্রতিটি প্রস্তাবকে তীব্র বিরোধিতার দ্বারা বিদ্ধ ও বিপর্য্যস্ত করিলেন। সম্মেলনের এইরূপ শোচনীয় ব্যর্থতা সত্ত্বেও উদ্যোক্তাগণ উপসংহারে আশা প্রকাশ করেন, অনতিবিলম্বে তাঁহারা পুনরায় অন্যত্র মিলিত হইবেন, যদিও মনে মনে তাঁহারা ভাল ভাবেই জানিতেন, সে সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।

লণ্ডন সম্মেলন পণ্ড হইয়া যাইবার পর হইতে ইউরোপের রাজনৈতিক

আকাশে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব বিরাজ করিতেছিল। সে নীরবতা সর্ব্বপ্রথম ভঙ্গ করিলেন বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ বেভিন। গত বাইশে জানুয়ারী তারিখে পার্লামেণ্টে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতির যে নূতন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তিনি প্রদান করিয়াছেন, লণ্ডন সম্মেলনের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতেই তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার ভাষণ সুস্পষ্টরূপে দুইটি অংশে বিভক্ত: একটি সোভিয়েটের সাম্প্রতিক মনোভাব ও আচরণের সমালোচনা এবং অপরটি তাহার প্রতিরোধ অথবা প্রতিষেধ ব্যবস্থা। সোভিয়েট সম্পর্কে সূচনাতেই তিনি বলেন, পূর্ব্ব ইউরোপে কমিউনিষ্ট প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাশিয়া অবশ্য বহুদিন হইতেই সচেষ্ট, কিন্তু বর্ত্তমানে সে প্রভাবের পরিধি পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত প্রসারিত করিবার পক্ষে তাহার উদ্যোগ পরিলক্ষিত হইতেছে। মিঃ বেভিনের মতে ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রয়াস। পোল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, হাঙ্গারী এবং সর্ব্বশেষে রুমেনিয়ার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া মিঃ বেভিন দেখাইতে চাহিয়াছেন, এই সকল দেশকে কমিউনিষ্ট প্রভাবের অধীনে আনিবার জন্য রুশীয় কর্ম্মতৎপরতা অবশ্যই নিন্দনীয়, কিন্তু সম্প্রতি গ্রীস অবধি সে প্রভাব প্রসারিত করিবার জন্য রুশীয় ষড়যন্ত্র যে সমূহ সর্ব্বনাশের সম্ভাবনায় পূর্ণ—একথা সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ যত শীঘ্র হৃদয়ঙ্গম করেন ততই মঙ্গল। বলা বাহুল্য, বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী গ্রীসের সাম্প্রতিক বিদ্রোহ সম্বন্ধেই কটাক্ষ করিয়াছেন। মার্কোস গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে গ্রীসে সম্প্রতি যে বিদ্রোহ সুরু হইয়াছে, সোভিয়েটের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় তাহা যে সৃষ্ট এবং পুষ্ট, সোভিয়েটের সক্রিয় সহায়তায় তাহা যে পরিচালিত তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। মিঃ বেভিন ইহাকেই 'Power politics' অর্থাৎ, শক্তি কেন্দ্রিক রাজনীতি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন এবং তাহার বিপজ্জনক পরিণতি সম্পর্কে সোভিয়েটকে সতর্ক ও সচেতন হইতে বলিয়াছেন: "I would advise, in solemnity,

great care. Provocations like this lead sometimes to serious developments, which we, and I hope they, are anxious to avoid. It is dangerous in international affairs to play with fire." অর্থাৎ, আমি যথোপযুক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি। এই জাতীয় উত্তেজনার ফলে অনেক সময় এমন সব সাংঘাতিক পরিণতি দেখা দেয়, যাহা আমরা এবং আশা করি, তাঁহারাও এড়াইতে চান। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আগুন লইয়া খেলা করা বিপজ্জনক। যুদ্ধের পর হইতেই সোভিয়েট পক্ষ হইতে ইউরোপের দিকে দিকে প্রভাব বিস্তারের জন্য নিয়মিতভাবে যে প্রয়াস চলিয়া আসিতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়া মিঃ বেভিন অতঃপর বলেন, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কোথাও বা পারস্পরিক আপোষ আলোচনার সাহায্যে মীমাংসায় উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, আবার কোথাও বা অযৌক্তিক লোভ ও জিদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সোভিয়েটের তুষ্টি বিধানে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু কোথাও কোন ফল লাভ হয় নাই, সোভিয়েটের রক্ত-রথ অপ্রতিহত বেগে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

এই বেগ প্রতিহত করিবার উপায় কি? মিঃ বেভিন দুইটী উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথম, অখণ্ড ইউরোপ গঠন। ইউরোপীয় শক্তি সমূহের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপন করিযা যে অখণ্ড ও অবিভক্ত ইউরোপ গঠনের পরিকল্পনা মিঃ বেভিন করিয়াছিলেন, রাশিয়া সে মানচিত্রের বহির্ভূত নয়। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সমবায়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হইলে, সে বিরাট গোষ্ঠীর প্রতিটী রাষ্ট্র আপন আপন যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী ইউরোপের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিতে পারিত; কিন্তু সোভিয়েটের নির্লিপ্ত স্বাতন্ত্র্যবোধ ও অত্যুগ্র প্রভুত্ব লোভের জন্য তাহা সম্ভব হইল না। একদিকে মার্শাল পরিকল্পনা এবং অপরদিকে কোমিনফর্ম—এই উভয় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ইউরোপ

যখন দুইটী বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হইয়াই পড়িল, মিঃ বেভিন সে বিভাগকে মানিয়া লইয়াই দ্বিতীয় উপায় গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। মিঃ বেভিনের পরিকল্পিত রাষ্ট্র সমবায় হইতে সমগ্র পূর্ব ইউরোপ যেমন বাদ পড়িয়া গেল, তেমনি সে ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য তিনি ইউরোপ বহির্ভূত অন্যান্য মহাদেশেও কর প্রসারণ করিয়াছেন। তাহা করিবার পক্ষে যে দার্শনিক যুক্তির তিনি অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সবিশেষ কৌতুকপ্রদ: মিঃ বেভিন বলেন, "I would emphasize that I am not concerned only with Europe as a geographical conception. Europe has extended its influence throughout the world and we have to look further ahead" আমি জোরের সহিত একথা জানাইয়া রাখিতে চাই যে, ইউরোপের ভৌগলিক সত্তা মাত্র লইয়াই আমি সন্তুষ্ট নই। সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া ইউরোপ তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং সেই কারণেই আরও দূরে—দূরান্তরে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। ইউরোপের বাহিরে চোখ চালাইতে গিয়া প্রথমেই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে সেই আফ্রিকা মহাদেশের উপর—যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও পোর্তুগালের সহিত বৃটেন সম-অংশীদাররূপে বিরাট দায়িত্ব বহন করে। মিঃ বেভিনের পরিকল্পিত বৃহত্তর ইউরোপের পরিধি এইখানেই পরিসমাপ্ত নয়, পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিবর্গের অধীন সমুদ্র পরপারবর্ত্তী সমগ্র ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য অবধি তাহার সীমা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার কথাই মিঃ বেভিন বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের বিপুল জন সংখ্যা ও অপর্যাপ্ত কাঁচামাল উৎপাদনযোগ্য বিশাল ক্ষেত্রের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সোল্লাসে বলিয়াছেন, এই জমি ও জনসমষ্টির যদি যথাযোগ্য বিন্যাস ও ব্যবহার সম্ভব হয়, তাহা হইলে পশ্চিম ইউরোপীয় ব্লক অসীম শক্তি আহরণ করিতে

সমর্থ হইবে। মিঃ বেভিনের হিসাব ঠিক হইলেও, নিকাশে ভুল হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার যে বিশাল ভূখণ্ডের ধনবল ও জনবলের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য মিঃ বেভিন ব্যস্ত, সেখানে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র আজও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, আজও সে সমস্ত দেশের বুকের উপর সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভার জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়া আছে, আজও তাহাদের অনেক স্থানে বৈদেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে মরণ-পণ স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হইতেছে। শাসক শক্তি ও কায়েমী স্বার্থ সম্পন্ন পক্ষের সহযোগিতা লাভ করিলেই, শাসিত জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ করা যে সম্ভব হয় না—এ শিক্ষা বৃটেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালেই ভারত হইতে লাভ করিয়াছে এবং সেই শিক্ষার অনুসরণ ক্রমেই সমগ্র প্রাচ্য-মহাদেশব্যাপী সাম্রাজ্যের পাততাড়ি গুটাইয়া প্রত্যেকটী স্বাধীন দেশের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহযোগীর সম্পর্ক স্থাপন করিতে সে ব্যস্ত। বৃটেন যদি সত্য সত্যই দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার দেশ সমূহের বিত্ত ও বন্ধুত্ব কামনা করে, তাহা হইলে ক্ষুদে সাম্রাজ্যবাদী অংশীদারগণকে নিজের অধীত পাঠ সযত্নে শিক্ষা দেওয়া তাহার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। প্রত্যেকটী দেশ হইতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ সর্ব্বাগ্রে প্রত্যাহৃত হওয়া প্রয়োজন এবং তাহা হইবার পর যে স্বাধীন ও সচ্ছন্দ পরিবেশ প্রস্তুত হইবে—তাহার মধ্যে নূতন সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হইলে, সেই নির্দ্ধারণই হইবে নির্ভুল ও নিয়মানুগত; অন্যথায় মিঃ বেভিনের পরিকল্পিত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্বপ্ন-পোত গণ-বিক্ষোভের মগ্নশৈলে আহত হইয়া অচিরে সলিল সমাধি লাভ করিবে।

পশ্চিম ইউরোপীয় ব্লক

গত ১২ই মার্চ তারিখে ব্রুসেল্‌সে বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও লুক্সেম্‌বুর্গ এই পাঁচটি পশ্চিম ইউরোপীয় রাজের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপী নিরাপত্তা চুক্তির খসড়াপত্র রচনাকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। পঞ্চ-শক্তির প্রতিনিধিবর্গ নয়দিন কার্য্যরত থাকিবার পর তাঁহাদের উপর ন্যস্ত বিরাট দায়িত্ব সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত করেন। খসড়াপত্রখানি সংশ্লিষ্ট শক্তিসমূহের নিকট প্রেরিত হয় তাঁহাদের অনুমোদন লাভের জন্য এবং তথায় যথাবিধি আলোচিত ও পরীক্ষিত হইবার পর তাহা পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণের স্বাক্ষর লাভ করে বিগত ১৭ই মার্চ তারিখে। চুক্তিপত্রের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা বিবৃত করিতে গিয়া মুখবন্ধে নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুতিগুলি প্রদত্ত হইয়াছে: (১) মানুষের মৌলিক অধিকার, ব্যক্তি সত্তার মর্যাদা প্রভৃতি সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদবর্ণিত আদশের প্রতি অবিচল অবস্থা স্থাপনের, (২) গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা, আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনপদ্ধতি ও নিয়মতান্ত্রিক ঐতিহ্য প্রভৃতি যে সকল নীতি তাহাদের সাধারণ উত্তরাধিকার তৎসমুদায় রক্ষণ ও পোষণ করিবার; (৩) অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যে সব বন্ধন পূর্ব হইতেই তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান—উল্লিখিত আদর্শ উপলব্ধি করিবার উদ্দেশ্যে সে সম্পর্ক দৃঢ়তর করিবার; (৪) ইউরোপীয় অর্থনৈতিক পুনরুন্নয়নের ভিত্তি পশ্চিম ইউরোপে সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্ম্ম প্রচেষ্টা পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্রে গ্রথিত করিবার, (৫) সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সদনবর্ণিত নীতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও আক্রমনাত্মক নীতি প্রতিরোধ করিবার জন্য পরস্পরের

সহিত সহযোগিতা করিবার এবং (৬) অন্যান্য যে সব রাষ্ট্র অনুরূপ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও অনুরূপ সঙ্কল্পে আস্থাবান, উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি সম্মুখে রাখিয়া তাহাদের সহিত প্রগতিমূলক পারস্পরিক সহযোগিতায় আবদ্ধ হইবার। এই ছয়টী প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর উপসংহারে বলা হইয়াছে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা স্থাপন ও সম্মিলিতভাবে সাধারণ আত্মরক্ষা ব্যবস্থা বিধানের উদ্দেশ্যে পঞ্চশক্তি এই চুক্তিপত্র সম্পাদন করিলেন।

ভূমিকা হইতে আরম্ভ করিয়া উপসংহার পর্য্যন্ত সমগ্র চুক্তিপত্রখানি আদ্যন্ত এরূপ সতর্কতা ও সংযমের সহিত রচিত যে, ঠাস-বুনানী বয়ানের কোন ফাঁক দিয়া তাহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের এতটুকু আভাস পরিলক্ষিত হয় না। আপাততঃ দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়, চুক্তিটী যেন কেবল মাত্র অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা স্থাপনের উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হইয়াছে এবং আক্রমনাত্মক নীতির প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার সম্মিলিত ব্যবস্থা বিধানেব যে সর্ত্ত প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহা যেন নিতান্ত প্রসঙ্গক্রমে। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলি চুক্তিপত্রের খসড়া পার্লামেণ্টের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে গিয়া তাহার উদ্দে ও কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদান করিযাছেন, তাহার মধ্যেও পরিচ্ছন্নতা সম্পাদনের সযত্ন আযাস দৃষ্ট হয়; তিনি বলেন, "বস্তুতঃ ইহা সাধারণ চুক্তির পর্য্যাযভুক্ত নয়। স্বার্থ ও শঙ্কাবোধের উপর ভিত্তি করিয়া এ চুক্তি সম্পাদিত হয নাই। বরঞ্চ ইহা এমন কতগুলি সমভাবাপন্ন প্রতিবেশীর সমবায, যাঁহারা সামাজিক এবং এমন কি, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও নিবিড়তর একত্ব সম্পাদনের অভিমুখে পথ কাটিয়া চলিবার কার্যে পূর্ব্ব হইতেই প্রবৃত্ত; তাঁহারা তাঁহাদের সভ্যতার মূলগত সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া, তাঁহাদের সাধারণ দায়িত্ব ও আদর্শের সম্বন্ধে চুক্তিপত্রের উপর পবিত্র প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষর করিতেছেন।" পরিশেষে

মিঃ এটলি এই সুনিশ্চিত আশ্বাস প্রদান করিয়া তাঁহার ব্যক্তব্যের উপসংহার করেন যে, এই চুক্তি কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া সম্পাদিত হয় নাই এবং কাহারও বিরুদ্ধে ইহা পরিচালিত হইবে না।

কিন্তু গত ২২শে জানুয়ারী তারিখে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী—বৃটেনের পররাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পার্লামেণ্টে যে ভাষণ দান করেন, তাঁহার উল্লিখিত বিবরণের সহিত তাহা মিলাইয়া পাঠ করিলে, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। রাশিয়ার আক্রমণাত্মক গতিবিধির দিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন, সোভিয়েটের সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত ইঙ্গ-মার্কিণ ও ফরাসী যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রভুত্ব-লোলুপতা পরিতৃপ্ত হইবার নয়; তাঁহাদের পদে পদে নতি স্বীকার ও স্বার্থত্যাগ সত্ত্বেও সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদের রক্তশকট দুর্দমনীয় বেগে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তিনি আরও বলেন, শুধু পূর্ব্ব ইউরোপে নয়, পশ্চিম ইউরোপেও কমিউনিষ্ট কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া বদ্ধপরিকর এবং সমগ্র ইউরোপের উপর যে কোন একক শক্তির সর্ব্বময় প্রভুত্ব স্থাপিত করিবার প্রয়াসের অপরিহার্য পরিণাম হইবে—তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম। এরূপ ক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তাঁহার ভাষণের উপসংহারে বলেন, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অবশ্য এমন কোন কাজ করিবেন না—যাহা সোভিয়েট স্বার্থের বিরোধী, কিন্তু "We are entitled to organize kindred souls in the west just as they have, organized kindred souls in the East." অর্থাৎ তাঁহারা যেমন এক ভাবের ভাবুক চিত্তগুলিকে পশ্চিমে একত্রিত করিতেছেন, আমাদেরও তেমনি সমভাবাপন্ন হৃদয়গুলিকে পূর্ব্বে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার অধিকার আছে। বলা বাহুল্য, পঞ্চশক্তি চুক্তি সম্পাদন সেই অধিকার কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিবার পথে প্রথম পাদবিক্ষেপ। আজ মাত্র শক্তি পঞ্চকের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল, মুখবন্ধের ষষ্ট প্রতিশ্রুতি

অনুযায়ী তাহার মধ্যে অনুরূপ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রবেশের পথ উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে।

আলোচ্য চুক্তিকে যে কোন আখ্যায় অভিহিত করা হোক এবং চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্য যতদূর সংযম ও সতর্কতার সহিতই ব্যক্ত করা হোকনা কেন, বস্তুতঃ ইহা সোভিয়েট বিরোধী পশ্চিম ইউরোপীয় ব্লক ছাড়া আর কিছু নয়। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী তাঁহার ২১শে জানুয়ারী তারিখে বৃটেনের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত ভাষণে সোভিয়েটের আক্রমণাত্মক মনোভাবের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের সংহতি ও সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে আভাস দেন, বর্ত্তমান চুক্তির মধ্যে তাহাই সুস্পষ্ট আকার লাভ করিয়াছে। প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতার পর দুইমাস অতিবাহিত হইতে না হইতে এত বড় একটী পরিকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করিল এবং কমিটী চুক্তিপত্রের খসড়া রচনার কার্য্য সমাপ্ত করিলেন মাত্র নয় দিনের মধ্যে—এই অস্বাভাবিক দ্রুততা ও ব্যস্ততা হইতে অবস্থার গুরুত্ব অতি সহজেই অনুমেয়। ইহা যেন আসন্ন তৃতীয় বিশ্ব সংগ্রামের দিকে চাহিয়া পশ্চিম ইউরোপে প্রথম শিবির সন্নিবেশ। বৃটেন ও তাহার সমভাবাপন্ন অন্যান্য শক্তিসমূহ সমগ্র পূর্ব্ব ইউরোপ ব্যাপী সোভিযেট গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া ইতিপূর্ব্বেই চকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, চেকোস্লোভাকিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনা তাঁহাদিগকে এরূপ ভাবে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে যে, আর মুহূর্ত্তমাত্র কালবিলম্ব করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন; তাই অতিশয় দ্রুত হস্তে ঘর গুছাইবার কার্য্যে তাঁহারা ব্যাপৃত। আমেরিকা অবশ্য আলোচ্য চুক্তি বন্ধনে আবদ্ধ হয় নাই এবং ভৌগলিক দিক দিয়া তাহা হইবার অধিকারীও সে নয়। তথাপি সদ্য সম্পাদিত চুক্তির উদ্দেশে তাহার পরিপূর্ণ সমর্থন সে জ্ঞাপন করিয়াছে। অপরদিকে পশ্চিম ইউরোপের মার্শাল পরিকল্পনার প্রয়োগের জন্য যুক্তরাষ্ট্র অতিমাত্রায় ব্যগ্র, আলোচ্য

চুক্তি বন্ধন তাহারই জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতের পূর্বাভাস। বিগত মহাযুদ্ধের ফলে পশ্চিম ইউরোপীয় অধিকাংশ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো এরূপ ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে যে, মার্শাল পরিকল্পনার আশ্রয় ও প্রশ্রয় ব্যতিরেকে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা সার্থক করা তাহাদের পক্ষে কার্য্যতঃ অসম্ভব। অথচ দিকে দিকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভূমিকা যখন দ্রুত হস্তে রচিত হইতেছে, দেশের শিল্প ও বাণিজ্য সম্পদ পুনর্গঠনের পক্ষে তাহাই কি উপযুক্ত অবসর ? কাজেই মার্শাল পরিকল্পনা পুনর্গঠনের সহায়ক হইবে সত্য, কিন্তু তাহা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের পুনর্গঠন নয়, তাহার দ্বারা বিধ্বস্ত সামরিক শক্তিই পুনর্গঠিত হইবে। পঞ্চশক্তির চুক্তি সম্পাদন বস্তুতঃ পশ্চিম ইউরোপে মার্শাল পরিকল্পনার স্বাগত সম্বর্দ্ধনা।

পিটার্স বার্গ-চুক্তি ও তাহার পর

সম্প্রতি বৃটিশ, মার্কিণ ও ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহিত পশ্চিম জার্মাণ যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রের পিটার্সবার্গে একটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। জার্মাণ পক্ষ হইতে চ্যান্সেলার ডাক্তার কনরাড এবং অপরপক্ষ হইতে ত্রিশক্তির হাইকমিশনারত্রয় চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইতিপূর্বেও উভয় পক্ষের মধ্যে বহু চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের সহিত সদ্যসম্পাদিত চুক্তির মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান। পূর্বে সম্পাদিত চুক্তিগুলি নামে চুক্তি হইলেও, কার্যতঃ তাহা ছিল বিজিত জার্মাণ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশে বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গের প্রদত্ত নির্দেশ এবং সে নির্দেশ জার্মাণ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অবশ্যপালনীয়। কিন্তু পিটার্সবার্গ চুক্তি উভয়

পক্ষের মধ্যে আলোচিত ও সম্পাদিত হইয়াছে সমানাধিকারের ভিত্তিতে এবং সে চুক্তির গ্রহণ জার্মাণ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। তৎসত্ত্বেও উভয় পক্ষের প্রতিনিধিবর্গ সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সমগ্র জার্মাণ সমস্যাটি আলোচনা করিযাছেন এবং সাধারণ স্বার্থের কল্যাণে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

পিটার্সবার্গ চুক্তির বলে পশ্চিম জার্মাণ সাধারণতন্ত্র যথারীতি স্বাধীন ও স্বার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয় নাই বটে, কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, স্বাধীন ও সার্বভৌম অধিকার লাভেব পথে ইহা তাহার বৃহত্তম পাদক্ষেপ। পিটার্সবার্গ চুক্তি যেমন জার্মাণীকে কতকগুলি বিশেষ সুখ-সুবিধা ও ব্যাপক অধিকার দান করিয়াছে, তেমনি আবার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায় ও দাযিত্বও তাহার স্কন্ধে আরোপ করিয়াছে। চুক্তির সর্ত অনুযায়ী পশ্চিম জার্মাণ গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন রাষ্ট্রেব সহিত ও বাজনৈতিক বাণিজ্যিক দূত বিনিময় করিতে পারিবে, নিযন্ত্রিত গতিবেগ, আযতন ও সংখ্যা অনুযাযী বাণিজ্য জাহাজ নির্মাণ করিতে পারিবে, গণতান্ত্রিক আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিয়া যে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পাবিবে এবং যুদ্ধাপবাধেব শাস্তিস্বরূপ তাহাব যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ধ্বংস-তালিকাব অন্তর্ভুক্ত হইয়া বিধ্বস্ত হইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল তাহাদের অনেকগুলিকে আসন্ন বিনাশের হাত হইতে বাঁচাইতে সক্ষম হইবে। তাহার দায ও দায়িত্বের দিক হইল এই যে, নাৎসীবাদ নির্মূল করিবার জন্য মিত্রশক্তিবর্গ যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন ও আজ পর্যন্ত পরম নিষ্ঠার সহিত যাহা অনুসরন করিয়া চলিয়াছেন তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য জার্মাণ গবর্ণমেণ্টকে সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা দান করিতে হইবে এবং জার্মাণ জাতির মধ্যে যাহাতে তাহাদের সহজাত সমর-পিপাসা পুনরায় জাগ্রত হইয়া উঠিতে না পারে তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

উল্লিখিত সর্তাবলীর মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সংরক্ষণ সম্বন্ধীয়

সর্তটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পট্‌সডাম চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর, বিশেষ করিয়া জার্মাণীর মার্কিণ ও বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলের অর্থনৈতিক সংহতি সাধিত হইবার পর শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে জার্মাণীকে ক্রমপর্যায়ে ব্যাপকতর অধিকার দান করিবার উদ্দেশ্যে বহু পরিকল্পনা রচিত ও কার্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। পট্‌সডাম চুক্তি পশ্চিম জার্মাণীকে তাহার শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাত্র সেই অংশটুকুই ব্যবহার করিবার অধিকার দান করে যদ্দারা ইউরোপীয় জীবনযাত্রার মানটুকু মাত্র কোনরকমে বজায় রাখা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় এবং স্থির হয়, অবশিষ্ট অংশ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ কার্যে নিয়োজিত হইবে। গত এপ্রিল মাসে সম্পাদিত ওয়াশিংটন চুক্তি অতিরিক্ত প্রায় দুইশত প্রতিষ্ঠানের নাম ধ্বংশ তালিকা হইতে খারিজ করিয়া দেয়। পিটার্সবার্গ চুক্তি আরও যে কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বিনাশের কবল হইতে অব্যাহতি দেয় তন্মধ্যে 'থাইসেন ওয়ার্কসের' নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। থাইসেন ওয়ার্কস সমগ্র ইউরোপে ইস্পাত নির্মাণের সর্ববৃহৎ কাবখানা এবং অন্যান্য আর সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত এই কারখানাটি অব্যাহতি পাইবার ফলে জার্মাণীর বাৎসরিক উৎপন্ন ইস্পাতের পরিমাণ দাঁড়াইবে প্রায ১ কোটি ১০ লক্ষ টনে। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে ইহা যে পশ্চিম জার্মাণীর একটা প্রকাণ্ড পাদক্ষেপ তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। শিল্পোন্নয়নের দিক ছাড়াও এই ব্যবস্থার আরও একটা দিক আছে এবং তাহা হইল এই যে, বেকার সমস্যা সমাধানের পক্ষে এ ব্যবস্থা বিশেষ সহায়ক হইবে, কারণ এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠান সচল রাখিবার অধিকার লাভের ফলে কেবলমাত্র যে বহু ব্যক্তিকে কার্যে নিয়োজিত রাখাই সম্ভব হইল তাহা নয়, আরও বহুতর ব্যক্তির নিয়োগের পথও প্রশস্ত হইল।

বিজয়ী শক্তিবর্গের এই বিপুল বদান্যতার হেতু কি। হেতু যে অহেতুক সৌহার্দ্য অথবা আন্তরিক বন্ধুভাব নয় সে কথা বলাই বাহুল্য।

বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গ পিটার্সবার্গ চুক্তিবলে পশ্চিম জার্মাণীকে যদি বিশেষ কোন সুখ-সুবিধা ও ব্যাপক কোন অধিকার প্রদানই করিয়া থাকেন, পতিত মনুষ্যত্বের প্রতি মর্যাদা বোধ বশে তাহা অবশ্যই করেন নাই, করিয়াছেন সোভিয়েট মতি-গতি ও কর্মতৎপরতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। সোভিয়েট সমগ্র পূর্ব ইউরোপকে আত্মরক্ষার সামরিক বহির্ব্যূহরূপে গড়িয়া তুলিবার কার্য দ্রুত হস্তে সম্পন্ন করিতেছে এবং নিত্য ও নিয়মিত বাধাদানের ফলে বার্লিন চতুঃশক্তি নিয়ন্ত্রণ পরিষদের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া পূর্ব বার্লিনে পিপ্‌লস পুলিশ ফোর্স নামে যে বাহিনী গঠন করিয়াছে তাহা নামে পুলিশ হইলেও কার্যতঃ সামরিক বাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়। সম্ভাবিত সোভিয়েট অগ্রগতি প্রতিরোধের নিমিত্তই পশ্চিম জার্মাণীর পুনরুন্নয়ন ইঙ্গ-মার্কিণ ফরাসী স্বার্থের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে সোভিয়েট অগ্রগতির সম্মুখে তাহাকে প্রাণহীণ পাষাণ স্তূপরূপে স্থাপন করিলে চলিবে না, সজীব ও সক্রিয় শক্তিরূপে তাহাকে স্বীয় ভূমিকা অভিনয় করিতে দিতে হইবে। এ সত্য মিত্রশক্তিবর্গের অজ্ঞাত নয়। সরকারী অনুমোদনলাভের জন্য পিটার্সবার্গ চুক্তি ফরাসী পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত হইলে, পার্লামেণ্টের জনৈক সদস্য প্রকাশ্য অধিবেশনের সম্মুখে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই অভিমতই ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, মিত্রশক্তিবর্গ 'যদি সোভিয়েট আক্রমণ প্রতিরোধের নিমিত্তই পশ্চিম জার্মাণীকে ব্যবহার করিতে মনস্থ করিয়া থাকেন, পশ্চিম জার্মাণীকে নিরস্ত্র রাখিয়া বাহির হইতে সামরিক সাহায্য সরবরাহ দ্বারা তাহা কদাচ সম্ভব নয়, তাহার জন্য আবশ্যক, তথাকার যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রকে যথারীতি সামরিক সংস্থারূপে গড়িয়া তোলা। ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষকে এইখানে আসিয়াই উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তাঁহাদের একদিকে সোভিয়েট আক্রমণ এবং

অপরদিকে জার্মাণীর সম্ভাবিত সামরিক পুনরভ্যুত্থান—এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি গ্রহণ করিয়া কোনটি তাঁহারা বর্জন করিবেন!

পশ্চিম জার্মাণীর সামরিক পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রশ্ন সম্বন্ধে মিত্রশক্তি-ত্রয়ের অভিমত অনিশ্চিত রহিলেও, জার্মাণ কর্তৃপক্ষের অভিমত সে সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত। জার্মাণ চ্যান্সেলার ডাক্তার কণরাড সম্প্রতি ক্লীভল্যাণ্ড প্লেন-ডীলারে'র সংবাদদাতার নিকট এ সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য লইয়া যদিও জার্মাণীর রাজনীতিক মহলে বহু গণনা ও গবেষণার সৃষ্টি করিয়াছে, তথাপি তাঁহার প্রকাশিত অভিমতই জার্মাণীর কর্তৃপক্ষীয় অভিমতরূপে গৃহীত হইবে। ডাক্তার কণরাড জার্মাণীর সামরিক পুনঃ সংগঠনের প্রশ্ন বর্তমানে বিবেচনার অযোগ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক ও শিল্পগত পুনঃ সংগঠনই এখন পশ্চিম জার্মাণীতে সাধারণতন্ত্রের সম্মুখে আশু সমাধান সাপেক্ষ সমস্যা; পশ্চিম জার্মাণীকে যাঁহারা অস্ত্রহীন ও অসহায় করিয়া রাখিয়াছেন তাহার রক্ষার দায়িত্ব ন্যায়তঃ তাঁহাদিগকেই গ্রহণ ও বহন করিতে হইবে। তবে যদি বিজয়ী শক্তিবর্গ আত্মশক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হন এবং মনে করেন যে, পশ্চিম জার্মাণী তথা সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের রক্ষার জন্য পশ্চিম জার্মাণীর সামরিক পুনঃ সংগঠন একান্ত প্রয়োজন, সেক্ষেত্রেও ডাক্তার কণরাডের অভিমত এই যে, পশ্চিম জার্মাণী নিজস্ব কোন সৈন্যবাহিনী স্বতন্ত্রভাবে গঠন ও বহন করিবে না, পরন্তু তৎকর্তৃক গঠিত সৈন্যদল পশ্চিম ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনীর অঙ্গীভূত ও অন্তর্ভুক্ত হইবে, অবশ্য তাহার নিয়ন্ত্রণভার ন্যস্ত থাকিবে একান্তভাবে পশ্চিম জার্মাণ গবর্ণমেণ্টের হাতে এবং তাহা কোন-ক্রমেই বৈদেশিক কোন শক্তির বেতনভুক্ সেনাদল হইবে না। ডাক্তার কণরাড আরও বলেন, পশ্চিমী মিত্রশক্তিবর্গকে নবগঠিত জার্মাণ বাহিনীকে সামরিক অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করিবার পরিপূর্ণ দায়িত্ব সহস্তে গ্রহণ

করিতে হইবে। কারণ, ধ্বংসাবশিষ্ট শিল্প সম্পদের সাহায্যে সে গুরুদায়িত্ব বহন করা পশ্চিম জার্মাণ রাষ্ট্রের পক্ষে কদাচ সম্ভব নয়। সে সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সংশয় ও শঙ্কা ডাক্তার কণরাডের অজ্ঞাত নয়. তাই একদিকে সোভিয়েট আক্রমণ এবং অপরদিকে জার্মাণ সামরিক শক্তির পুনরভ্যুত্থানের আশঙ্কা—এই উভয় সম্ভাবনার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জার্মাণ চ্যান্সেলার বলিয়াছেন, ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষকে এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একটিকে বাছিয়া লইতে হইবে এবং তাহা লইতে হইবে অনতিবিলম্বে। অবশ্য দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল জার্মাণ মহলে জার্মাণীর সামরিক পুনঃ সংগঠনের সম্ভাবনা উল্লাস ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছে এবং কোন কোন অঞ্চল হইতে এমন অভিমতও ব্যক্ত হইয়াছে যে, জামাণী যদি নিজস্ব সামরিক বাহিনী গঠন করে, তাহা হইলে তাহার অপরিহার্য অঙ্গরূপে তাহাকে জেনারেল ষ্টাফ ও অবশ্যই গঠন করিতে হইবে।

পশ্চিমী শক্তিবর্গ এই উভয় সঙ্কটের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া আছেন। অবশ্য সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষও সেই একই সমস্যার সম্মুখীন; সোভিয়েটের অনুকূলে আছে এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক দর্শন ও রাজনৈতিক মতবাদ; তদ্বারা যদিও শেষ পর্যন্ত তাহার নিজস্ব সাম্রাজ্যিক স্বার্থই সিদ্ধ হইয়া থাকে, তথাপি তাহার এমন একটা আপাতমোহ আছে যাহার সাহায্যে যে কোন জাতির অংশবিশেষকে জাতীয় স্বার্থ ও সংহতির বিরুদ্ধে প্ররোচিত ও পরিচালিত করা সম্ভব হয়। কিন্তু জার্মাণীর ন্যায় বিশিষ্ট জাতীয় সত্তাসম্পন্ন বনিয়াদী জাতিকে তাহার যাদুদণ্ড স্পর্শে রূপান্তরিত করা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ; কাজেই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ কি উপায়ে সে সমস্যার সম্মুখীন হইবার জন্য সচেষ্ট হইতেছেন তাহা তাঁহারাই জানেন। তবে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সমস্যার স্বরূপ প্রত্যক্ষগোচর এবং ইহাও সত্য ও

সুস্পষ্ট যে, অচিরে উভয় সঙ্কটের মধ্যে যে কোন একটিকে বরণ করিয়া লইবার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। কারণ সময়ের গতিবেগ মন্থর করা বিজ্ঞানবলে যদিই বা সম্ভব হয়, দ্রুত ধাবমান তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অগ্রগতির অনিবার্য বেগ সংযত করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত। সোভিয়েট অবশ্য আপাততঃ পশ্চিমী শক্তিবর্গকে ইউ-রোপীয় অচল অবস্থার পঙ্ককুণ্ডে প্রোথিত রাখিয়া পূর্বাভিমুখে তাহার প্রভাব দ্রুত বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু যে মুহূর্তে তাহার পূর্ব-মুখী অভিযানের গতিবেগ স্তব্ধ অথবা মন্দীভূত হইয়া আসিবে তাহার অখণ্ড মনোযোগ তদ্দণ্ডে পুনরায় আকৃষ্ট হইবে ইউরোপের প্রতি। জার্মাণীর পুনরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষকে মন স্থির করিতে হইবে। সে ক্ষণ সমাগত হইবার পূর্বেই পিটার্সবার্গ চুক্তি পশ্চিম জার্মাণীর অর্থনৈতিক ও শিল্পগত পুনরুন্নয়নের পথ প্রশস্ত করিল। তাহার সামরিক পুনঃসংগঠনের পথ প্রশস্ত হইবে কোন চুক্তিবলে এবং তাহার সম্পাদনকাল কতদূরে কে জানে! উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধকালীন সম্পর্কের অবসান ঘটাইবার উপায় উদ্ভাবনের একটি ধারা চুক্তিপত্রের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, জার্মাণীর পুনরস্ত্রী-করণ প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখিয়া সে সর্ত কার্যে পরিণত করা চলিবে না।



ইন্দোনেশীয় সংকট

ইন্দোনেশীয় সাধারণতন্ত্রের উপর ওলন্দাজ বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার বর্তমান প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে অত্যন্ত প্রবল আকারে এবং ভাবী প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হইবার সম্ভাবনাপূর্ণ। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে সম্পাদিত 'রেণভিল চুক্তির' ফলে সাধারণতন্ত্রী সরকারের সহিত ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের দীর্ঘকালব্যাপী বিরোধের সাময়িক বিরতি ঘটে। তখন হইতে স্বস্তি পরিষদের শুভেচ্ছা মিশনের মধ্যস্থতায় বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার নিয়মিত প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছিল। বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে লইয়া ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট যে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে চান—মতদ্বৈধ দেখা দিল তাহার মধ্যে ইন্দোনেশীয় সাধারণতন্ত্রের স্থান ও তাহার সহিত কেন্দ্রীয় ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের সম্পর্কে নির্ধারণ সমস্যা লইয়া। শান্তিপূর্ণ উপায়ে একটা সম্মানজনক মীমাংসায় উপনীত হইবার আগ্রহে সাধারণতন্ত্রী কর্তৃপক্ষ ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের প্রায় প্রতিটি সর্তই মানিয়া লইয়াছিলেন; এমনকি ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের সার্বভৌম অধিকার পর্যন্ত স্বীকার করিয়া লইতে তাঁহারা দ্বিধাবোধ করেন নাই; ডাক্তার হাত্তা শুধু এইটুকু মাত্র দাবী করিয়াছিলেন যে, ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট সে অধিকারের যথেচ্ছ ব্যবহার না করিয়া স্বেচ্ছাকৃত সংযমের সহিত তাহা ব্যবহার করিবেন। ওলন্দাজ সরকার কিন্তু তাঁহাদের সার্বভৌম ক্ষমতার এতটুকু সঙ্কোচ পর্যন্ত সাধন করিতে সম্মত হইলেন না। ফলে আপোষ-আলোচনা অচল অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইল। গত ১১ই ডিসেম্বর তারিখে ওলন্দাজ

কর্তৃপক্ষ শুভেচ্ছা মিশনকে জানাইলেন, অতঃপর সাধারণতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের সহিত আর আপোষ আলোচনা চালানো অসম্ভব ও অনাবশ্যক। শুভেচ্ছা মিশন সঙ্গে সঙ্গে নবোদ্ভূত পরিস্থিতির সংবাদ স্বস্তি পরিষদের গোচর করিলেন এবং অন্যদিকে আপোষ-আলোচনার ছিন্নপ্রায় সূত্র পুনঃ সংযোজিত করিবার কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যস্থতার ফলে আলাপ-আলোচনার অচল ধারায় পুনরায় বেগ সঞ্চার হইল। সহসা ষোলই ডিসেম্বর তারিখে ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট সাধারণতন্ত্রী কর্তৃপক্ষের গোচর করিবার উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা মিশনের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন: পত্রটি যদিও বস্তুতঃ বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের দাবী সম্বলিত চরমপত্র ব্যতীত অন্য কিছু নয়, তথাপি তাহার জবাব দানের নিমিত্ত মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় সাধারণতন্ত্রী কর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত হইল। শুভেচ্ছা মিশনের মার্কিণ প্রতিনিধি পত্রখানি যথাস্থানে প্রেরণ করিবার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন এই যুক্তিতে যে, প্রথমতঃ ইহা আপোষ-মীমাংসার সর্ত নয়, সর্তহীন আত্ম-সমর্পণের দাবী এবং দ্বিতীয়তঃ এরূপ গুরুতর প্রস্তাবের জবাব দানের জন্য যে সময় প্রদত্ত হইয়াছে, কোনরূপ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে তাহা অত্যন্ত অপ্রচুর। তৎসত্ত্বেও নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই ষোলই ডিসেম্বর তারিখের মধ্য রাত্রে ওলন্দাজ বাহিনী সর্বাত্মক আক্রমণের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি লইয়া সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রের উপর সবেগে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বিমান সহিত সৈন্যদল ও যান্ত্রিক বাহিনীর সহায়তায় পরিচালিত সে আক্রমণ দ্রুতবেগে ধাবিত হইল এবং দেখিতে দেখিতে অত্যল্প সময়ের মধ্যে একরূপ বিনাবাধায় রাজধানী যোগ্যকর্তা অধিকৃত হইল এবং সাধারণতন্ত্রী নেতৃবৃন্দ ওলন্দাজ সেনাদলের হাতে বন্দী হইয়া অজ্ঞাতবাসে প্রেরিত হইলেন। ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর আমন্ত্রণক্রমে ইন্দোনেশীয় প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার সুকর্ণ ভারতে আসিবার জন্য প্রস্তুত, তাঁহার জন্য প্রেরিত একখানি ভারতীয় বিমান তখনও রাজধানীতে

প্রতীক্ষা করিতেছে। ইতিমধ্যে ডাক্তার স্থকর্ণ বন্দী হইলেন এবং অপেক্ষমান ভারতীয় বিমান বিফল প্রতীক্ষার পর হতাশ হইয়া আরোহীহীন অবস্থায় ভারতে প্রত্যাবর্তন করিল। আক্রমণের বেগ ও ব্যাপকতা দেখিয়া বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না যে ইহা স্থপরিকল্পিত ·এবং ১১ই ডিসেম্বর হইতে ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ছদ্ম আবরণতলে ওলন্দাজ সরকার অত্যন্ত সঙ্গোপনে ও স্থনিপুণ হস্তে এ সমরপ্রস্তুতি গড়িয়া তুলিয়াছেন।

ন্যায় ও নীতি বিগর্হিত এই আক্রমণে সমস্ত এশিয়ার অন্তর ব্যথিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং ভাবোদ্বেল সে আলোড়ন ভাষা পাইল পণ্ডিত নেহরুর কণ্ঠেঃ পণ্ডিতজী বলিলেন, এশিয়ার ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের আয়ুষ্কাল ফুরাইয়াছে। তাঁহার বিঘোষিত এই নীতি ইতিমধ্যেই এশিয়ার রাজনীতি-ক্ষেত্রে মার্কিণের মনরো নীতির মত নেহরু নীতি আখ্যায় পরিচিতি লাভ করিয়াছে। জাগ্রত এশিয়া পর শাসন সহ্য করিতে, অথবা ইউরোপের নিকট হইতে সঙ্গতিহীন স্বজনের প্রাপ্য আচরণ লাভ করিতে প্রস্তুত নয় এবং বিপন্ন ইন্দোনেশিয়ার দুর্দিনে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এদিকে ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী নেহরুর নিকট এই মর্মে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইলেন যে, আক্রান্ত ইন্দো-নেশিয়াকে কি উপায়ে সক্রিয় সাহায্য দান করা যাইতে পারে, তৎ-সম্পর্কে আলোচনার জন্য তিনি যেন অবিলম্বে স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া দিল্লীতে এশিয়ার অন্তর্গত দেশসমূহের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। পণ্ডিত নেহরু সে অনুরোধের উত্তরে জানাইলেন, ইন্দোনেশীয় সাধারণ-তন্ত্রের রক্ষার নিমিত্ত স্বস্তি পরিষদ যদি সক্রিয় কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না পারেন, তাহা হইলে সে সম্মেলন অবশ্যই আহূত হইবে। অন্যদিকে ইন্দোনেশীয় সমস্যা লইয়া তুমুল বিতর্কে স্বস্তি পরিষদের

আসর তখন সরগরম। একের পর এক বক্তা উঠিয়া ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টকে স্বস্তি পরিষদের সনদ-বিরোধী উপায়ে সামরিক শক্তির সাহায্যে ইন্দোনেশীয় সমস্যা সমাধানের অপরাধে অভিযুক্ত করিতে লাগিলেন এবং সে আক্রমণ পরিচালনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিলেন ভারতীয় প্রতিনিধি। অভিযোগের জবাব দিতে দাঁড়াইয়া ওলন্দাজ প্রতিনিধি কেবলমাত্র আক্রমণের যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপারকে ঘরোয়া ঘটনারূপে বর্ণিত করিয়া তৎসম্পর্কিত আলোচনায় পরিষদের অধিকার পর্যন্ত প্রশ্ন করিয়া বসিলেন। পরিষদ কিন্তু তথাপি যুধ্যমান পক্ষদ্বয়ের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতির নির্দেশ প্রদান করিলেন এবং ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন, বন্দী ইন্দোনেশীয় নেতৃবৃন্দকে এই মুহূর্তে বিনাসর্তে মুক্তি দিতে হইবে এবং ওলন্দাজ সেনাবাহিনীকে তাহাদের যুদ্ধ-পূর্ববর্তী অবস্থানে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। সাধারণতন্ত্রী সরকার তৎক্ষণাৎ নির্দেশ অনুযায়ী যুদ্ধ বিরতির স্বপক্ষে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ওলন্দাজ সমরযন্ত্র তাহার গতিবেগ সংযত করিল না এবং বন্দী নেতৃবর্গ অন্তরীণাবদ্ধই রহিয়া গেলেন। সমর-যন্ত্রের গতিবেগ অবশ্য যথাসময়ে সংযত হইল, কিন্তু হইল মাত্র তখনই—সামরিক দিক দিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইবার আর যখন কোন প্রয়োজনীতা রহিল না।

নির্দেশ হেলাভরে উপেক্ষিত হইতে দেখিয়াও স্বস্তি পরিষদ নির্বিকার ; শুধু তাহাই নয়, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের গুণকীর্তনে যাঁহারা পঞ্চমুখ, একটা স্বাধীন রাজ্যের রাষ্ট্রিক সত্তা গ্রাসের জন্য ওলন্দাজ প্রয়াস প্রত্যক্ষ করিয়াও তাঁহাদের হৃদয়হীন নির্লিপ্ততা বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। এরূপ অবস্থায় পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে প্রস্তাবিত এশিয়া সম্মেলন আহ্বান করা ছাড়া উপায়ান্তর রহিল না : সম্মেলন আহূত হইল এবং পণ্ডিত নেহরুর আমন্ত্রণক্রমে এশিয়ার অন্তর্গত উনিশটি দেশের

প্রতিনিধি আসিয়া দিল্লী অধিবেশনে সমবেত হইলেন। স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষ হইতে প্রচার করা হইতে লাগিল, রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদকে পাশ কাটাইয়া যাবার নিমিত্ত সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণের ইহা এক সুচতুর কুট কৌশল মাত্র। সম্মেলনের সভাপতিরূপে পণ্ডিত নেহরু এই অপপ্রচারের উত্তরে বলিলেন, সেরূপ কোন দুরভিসন্ধি পোষণ করা দূরে থাক, সম্মেলনের আলোচনা ও কর্মপন্থা রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের সনদ বর্ণিত কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং পরিষদের নীতি ও নির্দেশ কার্যকরী করাই হইবে সম্মেলনের একমাত্র উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত তিনটি কর্তব্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সম্মেলনের কার্যক্রম রচিত হইল: (১) ইন্দোনেশিয়ায় যাহাতে অবিলম্বে শান্তি স্থাপিত হয় এবং ইন্দোনেশীয় জনসাধারণ যাহাতে অতি সত্বর তাহাদের স্বাধীনতা ফিরিয়া পায় সেই মর্মে স্বস্তি পরিষদের নিকট প্রস্তাব পেশ করা; (২) স্বস্তি পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী কোন পক্ষ যদি কার্য করিতে অসম্মত হয়, সে ক্ষেত্রে পরিষদের কর্তব্য কি হইবে সে সম্পর্কে পরিষদকে পরামর্শ দেওয়া; এবং (৩) সম্মেলন যে উদ্দেশ্যে আহুত হইয়াছে, তাহা সফল করিবার নিমিত্ত অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ মাঝে মাঝে যেখানে সম্মিলিত হইতে পারেন ও যাহার মাধ্যমে মিলিত কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে পারেন— এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা। এই লক্ষ্যত্রয় সম্মুখে রাখিয়া সম্মেলন কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর আট হাজার শব্দ সম্মিলিত যে স্মারকলিপি রচিত হইল, ইন্দোনেশীয় সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত তাহাতে প্রস্তাবিত হইল দুই শ্রেণীর সুপারিশ: আশু পালনীয় সুপারিশরূপে প্রস্তাবিত হইল, অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি, বন্দী সাধারণতন্ত্রী নেতৃবর্গের মুক্তিদান, ১৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সীমা-রেখা নির্দিষ্ট ছিল ওলন্দাজ সেনাবাহিনীকে তথায় সরাইয়া লইয়া যাওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যের সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিবিধির পথ প্রশস্ত করা এবং

রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের মধ্যস্থতায় উভয়পক্ষের মধ্যে আপোষ-আলোচনার পুনরারম্ভ। এই আশু পালনীয় সুপারিশগুলি কার্যে পরিণত হইলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মেলন নিম্নলিখিত সর্তগুলি সুপারিশ করিলেন : (১) ইন্দোনেশীয় সমস্যার শান্তিপূর্ণ ন্যায়সঙ্গত সমাধানের নিমিত্ত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে ; (২) ১৯৪৯ সালের ১লা মার্চের পূর্বে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে হইবে ; (৩) গণপরিষদ গঠনের নিমিত্ত নির্বাচন শেষ করিতে হইবে ১৯৪৯ সালের পয়লা অক্টোবরের পূর্বে (৪) ১৯৫০ সালের পয়লা জানুয়ারীর পূর্বে সাধারণতন্ত্রী সরকারের হাতে চূড়ান্তভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হইবে। ইহা ছাড়া ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের হাতে ন্যস্ত করার এবং তাহার বৈদেশিক দূত নিয়োগের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়ার দাবীও সুপারিশপত্রের অঙ্গীভূত।

এদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদ তখন ইন্দোনেশীয় সমস্যা সমাধানের খসড়া রচনাকল্পে চতুঃশক্তির সদস্যদিগকে লইয়া যে কমিটি রচনা করিয়াছেন, আপনাদের দায়িত্ব উদ্‌যাপনের নিমিত্ত তাঁহারা যথাযোগ্য নিষ্ঠার সহিত কার্যরত। কমিটি যথাসময়ে তাঁহাদের গৃহীত দায়িত্ব উদ্‌যাপন করিলেন এবং রচিত খসড়া অনুমোদনের নিমিত্ত পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত হইল। সর্তগুলি এইরূপ : অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইবে ; সাধারণতন্ত্রী নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিয়া যোগ্যকর্তা এলাকায় শাসনকার্য পরিচালনে তাঁহাদিগকে সহজ ও স্বচ্ছন্দ অধিকার দান করিতে হইবে ; পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনের মধ্যস্থতায় আলাপ-আলোচনা পরিচালন করিয়া ১৯৪৯ সালের ১৫ই মার্চের পূর্বে অন্তবর্তী যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের ব্যবস্থা সম্পন্ন করিতে হইবে। ১৯৪৯ সালের পয়লা অক্টোবরের পূর্বে গণপরিষদ গঠন সম্বন্ধীয় নির্বাচন সমাধা করিতে হইবে এবং ১৯৫০ সালের পয়লা জুলাইয়ের মধ্যে ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর করিতে হইবে।

স্পষ্টতঃই দেখা যায়, এশিয়া সম্মেলনের প্রস্তাবিত সুপারিশের সহিত রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদ কর্তৃক রচিত সর্তাবলীর মৌলিক কোন পার্থক্য নাই; উভয় প্রস্তাবেরই অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এক, পার্থক্য যাহা কিছু তাহা সময়ের স্বল্প পরিসর ব্যবধান লইয়া। তবে উভয় প্রস্তাবের মধ্যে পার্থক্য এই যে, এশিয়া সম্মেলন ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণকারী পক্ষরূপে তীব্র ভাষায় অভিযুক্ত করিয়াছেন, অথচ রাষ্ট্রপুঞ্জে পরিষদ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব: পরিষদ রচিত প্রস্তাবের মধ্যে এমন একটি শব্দ কোথাও প্রযুক্ত হয় নাই, যদ্দারা ইন্দোনেশীয় সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের সনদ-বিরোধী উপায়ে সামরিক শক্তি প্রয়োগের গুরুতর অভিযোগ ওলন্দাজ সরকারের স্কন্ধে ন্যস্ত হইতে পারে। তথাপি অভিযোগ বর্জিত অতি মৃদু এই শান্তি প্রস্তাব স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইল এবং তাহার ফলে প্রস্তাবের আলোচনা দিনের পর দিন মুলতুবী হইয়া চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন বিলম্বিত করিতে লাগিল। প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত গৃহীত হইল বটে, তথাপি প্রশ্ন রহিয়া যায়, ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট যদি তদনুযায়ী কার্য করিতে সম্মত না হন—তাহা হইলে কি হইবে? প্রস্তাবের গ্রহণ অথবা বর্জন কি ওলন্দাজ সরকারের খুশী-খেয়ালের খেলা, অথবা তাহা কার্য্যকরী করিবার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদ কঠোরতর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত? ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের অতীতের আচরণ ও বর্তমান মনোভাব হইতে এরূপ সন্দেহ পোষণ করা অযৌক্তিক হইবে না যে, রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের প্রস্তাব তাঁহাদের দ্বারা যথাযোগ্য শ্রদ্ধার সহিত সম্বর্ধিত না হওয়াই সম্ভব। তাহা যদি হয়, সেক্ষেত্রে এশিয়া সম্মেলনের কর্তব্য কি হইবে সম্মেলনের সভাপতিরূপে পণ্ডিত নেহরু তাহা সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিয়াছেন: তিনি বলেন, 'এশিয়ার অন্তর্গত দেশসমূহের পক্ষ হইতে প্রাথমিক প্রতিবিধানস্বরূপ 'অর্থনৈতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গৃহীত হইবে এবং

দুর্ভাগ্যবশতঃ সে ব্যবস্থাও যদি উদ্ধত ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের চৈতন্য সম্পাদনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বলিয়া গণ্য না হয়, তাহা হইলে তাহার চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া কি আকারে দেখা দিতে পারে—পণ্ডিত নেহরু তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে তাহারও আভাস প্রদান করিয়াছেন: তিনি বলেন, মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত পন্থাই বিশ্ব সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র কার্যকরী পন্থা এবং ইন্দোনেশীয় সমস্যা সমাধান-কল্পে এশিয়ার অন্তর্গত দেশসমূহ শান্তিপূর্ণ সেই পন্থাই অনুসরণ করিবে। কিন্তু তৎসত্বেও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের অসংযত লোভ পররাজ্য গ্রাসের জন্যই যদি অধিকতর লালায়িত হইয়া উঠে, এশিয়া কোনক্রমেই পরশাসনের গ্লানি বহন করিবে না এবং সে গ্লানিভার অপনোদনের জন্য যে কোন পন্থাই সে অবলম্বন করিবে—তাহার পরিণাম বিশ্বের পক্ষে যত বিপজ্জনকই হোক না কেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদ তথা ওলন্দাজ সরকার পণ্ডিত নেহরুর এই সতর্ক সঙ্কেতের গুরুত্ব সময় থাকিতে সম্যকভাবে উপলব্ধি করিবেন কি?

———

ইন্দোনেশীয় সমস্যা ও সমাধান

ইন্দোনেশীয় সঙ্কটের সমাধান বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এত-দিনে দৃষ্টি সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; ভ্যান রয়েন-রোয়েম চুক্তি অনুযায়ী ওলন্দাজ সৈন্যবাহিনী রাজধানী যোগ্যকর্তা পরিত্যাগ করিয়া যায় গত ৩০শে জুন তারিখে এবং সেইদিনই গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্বয়ং সুলতান দুই হাজার বর্গমাইলব্যাপী অঞ্চলের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। গত ৬ই জুলাই তারিখে প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার সুকর্ণ ও

প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার হাতা প্রমুখ অন্তরীণাবদ্ধ জাতীয় নেতৃবৃন্দ মুক্তিলাভ করিয়া যথাযোগ্য অনুষ্ঠান ও আড়ম্বরসহ রাজধানীতে প্রবেশ করেন; কিন্তু সম্পাদিত চুক্তির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই দফাটি সহসা এবং সহজে কার্যে পরিণত হয় নাই। সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিষদের মধ্যস্থতায় বহু জটিল ও কুটিল পথ পর্যটন করিয়া অবশেষে এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। সে সুদীর্ঘ পর্যটনের ধারা অনুসরণ করিতে হইলে আমাদিগকে বর্তমান বৎসরের প্রারম্ভে ফিরিয়া যাইতে হইবে। গত ২৮শে জানুয়ারী তারিখে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নিম্নলিখিত মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়: (১) গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টকে যোগ্যকর্তায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; (২) যে সব গণতন্ত্রী নেতার গতিবিধি আজও নিয়ন্ত্রিত তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হইবে; (৩) গণতন্ত্রী সরকার যাহাতে স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে ইন্দোনেশিয়ায় যে কোন ব্যক্তির সহিত আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করিতে পারেন—সেরূপ ব্যবস্থা ও সুযোগ দান করিতে হইবে এবং (৪) গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের সহিত আলাপ-আলোচনা পুনরায় আরম্ভ করিতে হইবে। ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত সর্ত চতুষ্টয়ের মধ্যে শেষ তিনটি সর্ত মানিয়া লইলেন, কিন্তু প্রথম সর্ত, অর্থাৎ গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টকে এই মুহূর্তে রাজধানী যোগ্যকর্তায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সর্তটি স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত হইলেন না। ওলন্দাজ প্রতিনিধিদলের নেতা ডাক্তার ভ্যান রয়েন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিষদের দরবারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, নির্বাসিত গণতন্ত্রী সরকারকে এই মুহূর্তে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার অর্থ হইবে গণতন্ত্রী সেনাবাহিনীর বিধিসম্মত অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া; তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে এই যে, সমগ্র ইন্দোনেশিয়া ব্যাপিয়া হত্যা ও সন্ত্রাসবাদের অবাধ লীলা চলিতে থাকিবে এবং গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট তাহা সংযত করিতে অক্ষম হইয়া নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করিবেন

মাত্র। পক্ষান্তরে ইন্দোনেশীয় প্রতিনিধিদলের নেতা ডাক্তার রোমেন্ন বলিলেন, গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই হইল সেই প্রাথমিক সর্ত— যাহার উপর ভিত্তি করিয়া আলাপ-আলোচনা পুনরায় আরম্ভ করা সম্ভবপর; কারণ গবর্ণমেণ্ট যদি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্রী নেতৃবৃন্দ আলাপ-আলোচনা পরিচালনের পক্ষে পদাধিকারসম্মত যোগ্যতাই অর্জন করিবেন না এবং সেরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা যাহা কিছু বলিবেন অথবা করিবেন তাহার পশ্চাতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার সরকারী দায়িত্বের স্বীকৃতি থাকিবে না।

আলাপ-আলোচনা অচলত্ব প্রাপ্ত হইল এখানে আসিয়া এবং সে প্রতিরোধ উত্তীর্ণ হইবার পথ সন্ধান করিতে গিয়া এককালে যে দুইটি পরিকল্পনা পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত হইল, তাহার একটির নাম বীলপরিকল্পনা এবং অপরটি ক্যাবিনেট পরিকল্পনা নামে অভিহিত। অন্তর্বর্তী ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পথে যে প্রতিবন্ধক আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ওলন্দাজ হাইকমিশনার ডাক্তার লুই বীল নিম্নলিখিত তিন দফা সর্ত সম্বলিত একটি পরিকল্পনা পরিষদের সম্মুখে পেশ করিলেন: (১) ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র নামে অভিহিত হইবে; (২) সার্ব্বভৌম ক্ষমতা যত শীঘ্র সম্ভব হস্তান্তরিত হইবে এবং (৩) অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবার পর ক্ষমতা হস্তান্তর কার্য ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে হেগে এক গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন আহ্বান করা হইবে।

পরিকল্পনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ওলন্দাজ প্রতিনিধি বলিলেন, গণতন্ত্রী নেতৃবর্গের সহিত উল্লিখিত সর্তে চুক্তি সম্পাদন যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্রী সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন আপনা হইতেই মীমাংসিত হইয়া যাইবে। পরিকল্পনা দৃষ্টে প্রত্যক্ষতঃ মনে হয় যে, গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের পুনঃপ্রতিষ্ঠারূপ জটিল প্রশ্নটিকে এড়াইয়া যাইবার উদ্দেশ্যেই ওলন্দাজ

সরকার এই মধ্যপন্থা অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু গণতন্ত্রী সরকার কোনরূপ প্রতিশ্রুতি অথবা প্রলোভনের সহিতই আপনাদের রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য বিনিময় করিতে সম্মত হইলেন না, ফলে বীল-পরিকল্পনা পেশ হইবামাত্র পরিত্যক্ত হইল। অতঃপর ক্যাবিনেট পরিকল্পনা আসিয়া পরিষদ টেবিলে স্থান গ্রহণ করিল। গত ২৮শে জানুয়ারী তারিখে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ক্যাবিনেট পরিকল্পনা বস্তুতঃ তাহারই পুনরাবৃত্তি মাত্র, তবে তৎসহ পরিষদের পক্ষ হইতে এই সনির্বন্ধ অনুরোধ বিজ্ঞাপিত হইল যে, ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট অন্ততঃ যথারীতি প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াও আপাততঃ এই পরিকল্পনাটি যেন গ্রহণ করেন।৹

অতঃপর পরিকল্পনা দুইটি লইয়া সুরু হইল সুদীর্ঘ বিতর্ক ও সূক্ষ্ম বিচারবিশ্লেষণ। ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট সূচনা হইতেই অত্যন্ত সন্তর্পণের সহিত আলোচনার পথে পদবিক্ষেপ করিতেছেন এবং আপনাদের সাম্রাজ্যিক স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়া কখনও বা এক পা অগ্রসর হইয়াছেন, আবার কখনও বা প্রয়োজনবোধে পশ্চাদপসরণ করিয়াছেন। আলোচনা সূত্র চূড়ান্তভাবে ছিন্ন হইবার উপক্রম দেখিয়া বাস্তব বুদ্ধির বশে অচলায়তনের সৌধ-শিখর হইতে তাঁহারা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে একধাপ নামিয়া আসিলেন। ওলন্দাজ প্রতিনিধিদলের নেতা ডাক্তার ভ্যান রয়েন বলিলেন, রাজধানী যোগ্যকর্তায় গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন তাঁহারা আলোচনা করিতে সম্মত এই সর্তে যে, তৎসহ যুদ্ধ-বিরতি এবং প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কিত প্রশ্নও একত্র আলোচিত হইবে। তিনি আরও বলিলেন, আপোষ-রফার ঐকান্তিক আগ্রহবশেই ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়টি আলোচনায় সম্মত হইলেন এই আশার বশবর্তী হইয়া যে, তাঁহাদের সদিচ্ছাপূর্ণ এই ইঙ্গিত দীর্ঘ তিন মাসব্যাপী অচল অবস্থার অবসান ঘটাইতে সমর্থ হইবে। পরিশেষে ডাক্তার ভ্যান

রয়েন পরিষদকে একথা স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিলেন, আলোচনা শেষে গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে কোন সিদ্ধান্তই গৃহীত হোক না কেন, অপর দুইটি সর্ত যতক্ষণ না যথাযথরূপে পালিত হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা কার্যকরী করিবার কোনরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হইবে না। উল্লিখিত ব্যবস্থা দুইটির বিরুদ্ধেই গণতন্ত্রী নেতৃবর্গের প্রতিবাদ: তাঁহারা পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট যতক্ষণ না রাজধানী যোগ্যকর্তায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং মন্ত্রী পরিষদের সদস্যগণ যতক্ষণ না মুক্তিলাভ করিয়া স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইতে পারিতেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিরতির নির্দেশ অথবা গোলটেবিল বৈঠকে অংশ গ্রহণ করিবার প্রতিশ্রুতিদানের পদাধিকার-সম্মত কোন যোগ্যতা তাঁহাদের নাই।

ওলন্দাজ প্রতিনিধি সুকৌশলে এই জটিল প্রশ্নটি সম্পর্কে স্বীকৃতি এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেও গণতন্ত্রী সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয় আলোচনার পক্ষে এই সর্ব্বপ্রথম সম্মতিদান করিলেন এবং তাহার ফলে আলাপ-আলোচনার স্তিমিত ধারায় ধীরে ধীরে বেগ সঞ্চার হইতে লাগিল। ইন্দোনেশীয় প্রতিনিধিদল অন্তরীণাবদ্ধ প্রেসিডেণ্ট ও প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ ও আবশ্যক আলোচনার উদ্দেশ্যে বাঁকা দ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন এই আশা লইয়া যে, শেষ মুহূর্তে যদি কোন দারুণ মতভেদ না ঘটে, তাহা হইলে ইন্দোনেশীয় সঙ্কটের সমাধান সম্ভবতঃ দূরবর্তী নয়। গত ২২শে জুন তারিখে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কমিশনের আহ্বানে ব্যাটাভিয়ায় ওলন্দাজ গণতন্ত্রী প্রতিনিধিদলের এক মিলিত সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ফেডারলিষ্ট দলীয় প্রতিনিধিগণ এই ধরণের মিলিত আলোচনা-সভায় অংশ গ্রহণ করেন এই সর্ব্বপ্রথম। ওলন্দাজ প্রতিনিধি-দলীয় নেতা ডাক্তার ভ্যান রয়েন এই সভাতেই সর্ব্বসমক্ষে 'ঘোষণা করিলেন, যোগ্যকর্তা হইতে ওলন্দাজ সেনাবাহিনীর অপসারণ কার্য্য

আরম্ভ হইবে আগামী ২৪শে জুন হইতে এবং সে পর্ব্ব যদি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে পয়লা জুলাই তারিখের মধ্যে গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবেন। অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সভার কার্য সমাপ্ত হইবার পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কমিশনের সভাপতি মিঃ টি কে ক্রিচ্‌লী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিম্নলিখিত মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিলেন :

(১) ১৯৪৮ সনের ডিসেম্বর মাসে ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক পুলিশী ব্যবস্থা গৃহীত হইবার পূর্বে স্বাক্ষরিত 'রেণভিল্ চুক্তির' নীতি অনুযায়ী ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের যে জাতীয় ফেডারেল গবর্ণমেণ্ট কার্যরত ছিল, তাহারই হস্তে প্রকৃত, পুরিপূর্ণ এবং সর্তহীন সার্ব্বভৌম অধিকার ন্যস্ত করিতে হইবে ; (২) ইউনিয়ন গঠিত হইবে ওলন্দাজ রাজ্য ও ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের সমবায়ে এবং তাহা হইবে স্বেচ্ছাসম্মত সমান অংশ ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে ; (৩) ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা, অধিকার ও দায়িত্ব-অর্পণের সনদ রচনা করিতে হইবে . (৪) ইউনিয়নের অন্তর্গত অংশীদারদ্বয়ের মধ্যে কাহাকেও অপরের অপেক্ষা অধিক অধিকার ইউনিয়নের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে না ; অথবা ইউনিয়নের সাধারণ স্বার্থ কিংবা অংশীদারগণের বিশিষ্ট স্বার্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যতটুকু অধিকার ইউনিয়নের হাতে অর্পণ করার প্রয়োজন হয়, হস্তান্তরিত অধিকারের পরিমাণ তাহা হইতে আদৌ অধিক হইবে না এবং ইউনিয়ন অধিরাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হইবে না ; (৫) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কমিশন অথবা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক নিযুক্ত অপর কোন এজেন্সী লক্ষ্য করিবেন, গোলটেবিল বৈঠকে যে চুক্তি সম্পাদিত হইবে, ইন্দোনেশিয়ায় তাহা যথাযথভাবে পালিত হইতেছে কিনা।

পরিশেষে ডাক্তার ভ্যান রয়েন এই আশা ব্যক্ত করিলেন, গৃহীত

সিদ্ধান্তের ফলে যে কেবলমাত্র প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকের পথই প্রশস্ত হইবে তাহা নয়, ওলন্দাজ ও ইন্দোনেশীয় জনসাধারণের মধ্যে একটা স্থায়ী ও আন্তরিক মৈত্রী বন্ধনও প্রতিষ্ঠিত হইবে। সত্য কথা বলিতে গেলে ইন্দোনেশীয় সঙ্কট সমাধান কল্পে ওলন্দাজ-ইন্দোনেশীয় আলাপ-আলোচনা যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা শুধু ডাক্তার ভ্যান রয়েনের আন্তরিক ও সযত্ন প্রয়াসের ফলে এবং সে সঙ্কট যদি কোন দিন চূড়ান্ত-ভাবে মীমাংসিত হইয়া যায়, ডাক্তার ভ্যান রয়েনের ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দরুণই তাহা সম্ভব হইবে। ইন্দোনেশীয় জনসাধারণ এ সত্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াছে এবং তাহা করিয়াছে বলিয়াই ডাক্তার ভ্যান রয়েন আজ তাহাদের নিকট ইন্দোনেশিয়ার মাউণ্টব্যাটেনরূপে পরিচিত।

রয়েন-রোয়েম চুক্তি অনুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত ৩০শে জুন তারিখেই ওলন্দাজ সেনা বাহিনীর সর্বশেষ দল যোগ্যকর্তা পরিত্যাগ করিয়া যায় এবং সেই দিনই গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্বয়ং সুলতান দুই হাজার বর্গ মাইল পরিমিত যোগ্যকর্তা রেসিডেন্সীর শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার সুকর্ণ এবং প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার হাতা প্রমুখ নির্বাসিত গণতন্ত্রী নেতৃবৃন্দ আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর সহকারে রাজধানীতে প্রবেশ করেন ৬ই জুলাই তারিখে, উল্লসিত এবং উচ্ছলিত জনতা পথের দুইধারে দীর্ঘ শ্রেণী রচনা করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে। রয়েন-রোয়েম চুক্তি সম্পাদিত হয় গত মে মাসে, কাজেই অত্যন্ত বিলম্বে হইলেও তাহার প্রথমাংশ এতদিনে কার্যে পরিণত হইল। অতঃপর চুক্তির অবশিষ্ট কার্যক্রম দুইটী অনুসরণের কথা। এতৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে গত ১০ই জুলাই তারিখে গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের প্রথম অধিবেশন আহূত হয় ব্যাটাভিয়ায় এবং আলোচনার যতটুকু বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়

যে, চুক্তির দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ যুদ্ধবিরতির নির্দেশ প্রদান সম্পর্কিত অংশটি আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে কার্যকরী করা সম্ভব হইবে। যুদ্ধ অবশ্য চুক্তি সম্পাদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কার্যতঃ বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং *সৈন্যাপসারণ ও শাসন ক্ষমতা প্রত্যর্পণের কার্য এমন সুশৃঙ্খলার সহিত* সম্পন্ন হয় যে, কোন স্থানে একটিমাত্র অপ্রীতিকর ঘটনাও অনুষ্ঠানের শান্তি ও গাম্ভীর্য ব্যাহত করে নাই। চুক্তির দ্বিতীয় সর্ত সম্পাদিত হইবার পর গোলটেবিল বৈঠকের উদ্যোগ পর্ব আরম্ভ হইবে। গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন আহূত হইবে আগামী আগষ্ট মাসে এবং ক্ষমতা প্রত্যর্পণ ও ইউনিয়ন গঠন সম্পর্কিত বিষয়ে সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে বর্তমান বৎসরের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তর পর্ব নিষ্পন্ন হইবার কথা। ফেডারালিষ্ট দলীয় প্রতিনিধিদের মনোভাব ও কর্মপন্থার উপর গোলটেবিল বৈঠকের কৃতকার্যতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। এস্থলে ফেডারালিষ্ট দলের জন্মেতিহাসের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক; গণতন্ত্রী দলের স্বাধীনতার দাবী ও তাহা অর্জন করিবার জন্য সংগ্রামের তীব্রতা যতই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ওলন্দাজ কর্তৃক তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদী-সুলভ ভেদবুদ্ধির বশে জাতীয় দাবীর প্রাচীরগাত্রে ফাটল সৃষ্টি করিবার প্রয়োজনীয়তা ততই বেশী করিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। সে সুযোগ সমুপস্থিত হইল ওলন্দাজ, ইন্দোনেশীয় ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাবকে উপলক্ষ্য করিয়া। গণতন্ত্রী নেতৃবর্গ চাহিয়াছিলেন, অখণ্ড ইন্দোনেশীয়াকে উক্ত ইউনিয়নের একটি মাত্র সংস্থারূপে গণ্য করা হোক। সরকারী প্ররোচনায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় ফেডারালিষ্ট দল জন্মলাভ করিল ১৯৪৭ সনে এবং দুই বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতে জাভা, বোর্ণিয়ো প্রভৃতি দ্বীপের তেরটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য তাহাদের শাসনাধীনে আসিল। তাহারা ইন্দোনেশীয়ার রাজনীতি ক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল ইন্দোনেশিয়ার একটি স্বতন্ত্র সংস্থারূপে গণ্য

হইবার দাবী লইয়া। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করিয়াছে গণতন্ত্রী দল, তাহাদের ত্যাগ ও দুঃখবরণ, বীরত্ব ও আদর্শনিষ্ঠা স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিয়াছে। কেবল তাহাই নয়, গণতন্ত্রী দলকে যুগপৎ দুই ফ্রণ্টে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, একদিকে ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ এবং অপরদিকে সোভিয়েট প্ররোচিত কমিউনিষ্ট উপদ্রব দুই হাতে দুইটি শত্রুর বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ অন্তর্বিপ্লব সেই দুই হস্তে দমিত করিয়াছে; কাজেই ইন্দোনেশিয়ার ভাগ্য নির্ধারণ সম্পর্কিত প্রশ্নে শেষ কথা কহিবার অধিকার ন্যায়সম্মত ও রাজনীতিগতভাবে তাঁহাদেরই। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে ফেডারালিষ্ট দলের অনুমাত্র অবদান নাই ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট একথা বিশেষরূপে বিদিত রহিয়াও ফেডারালিষ্ট দলের দাবীর সমর্থন করিলেন এবং গণতন্ত্রী দলের জাতীয় দাবীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে ফেডারালিষ্ট দলীয় প্রতিনিধি দলকে গোলটেবিল বৈঠকের অন্যতম অংশীদাররূপে স্বীকার করিয়া লইলেন; ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে লীগ ও কংগ্রেস দলকে লইয়া যে লীলা অভিনয় করিয়াছিল, ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ উল্লিখিত দল দুইটিকে লইয়া ইন্দোনেশিয়ায় তাহারই পুনরাভিনয় করিতেছে মাত্র। আসন্ন গোলটেবিল বৈঠকে ফেডারালিষ্ট দলীয় প্রতিনিধিগণ যদি জাতীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ ও সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের উর্দ্ধে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারেন, তাহা হইলে ইন্দোনেশিয়ার সম্মিলিত জাতীয় দাবী জয়যুক্ত হইবেই।

প্যালেষ্টাইন প্রসঙ্গ

পৃথিবীতে ইহুদীগণই সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবিড়ম্বিত জাতি। জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, দর্শনে ও সাহিত্যে, শিল্পে ও সঙ্গীতে, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে এক কথায় সভ্য সমাজের সর্বস্তরে ও সকল ক্ষেত্রে তাহাদের অবদান অগ্রগণ্য। কিন্তু তথাপি এত বড় একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতির বাসভূমি বলিতে বিশ্বের বুকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থানও নাই। দেশ না থাকার দরুণ রাষ্ট্র গড়িয়া ওঠা সম্ভব হয় নাই এবং রাষ্ট্র গঠিত না হইবার জন্য রাজনীতির আধুনিকতম সংজ্ঞা অনুযায়ী জাতি বলিতে যাহা বুঝায় সে আখ্যায় অভিহিত হওয়াও ইহুদীগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। তাহার অনিবার্য ফল হইয়াছে এই যে, এত বড় একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও সুসভ্য জাতি কেবলমাত্র একটি ধর্মসম্প্রদায়মাত্ররূপে বিশ্বের বুকে আপনার অস্তিত্ব বাঁচাইয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। কাজেই ইহুদীগণের পক্ষ হইতে একটি নির্দিষ্ট বাসভূমি ও নিজস্ব একটি জাতীয় রাষ্ট্রের দাবী বহুদিন হইতেই ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। বিশেষ করিয়া হিটলারের ইহুদীনিধন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবার পর সে দাবী অধিকতর জোর ও যৌক্তিকতার সহিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দরবারে উপস্থিত হয়। অবশ্য এই দাবীর বিরুদ্ধে আরবদের প্রতিরোধও সমপরিমাণ জোর ও যুক্তি সম্বলিত।

প্যালেষ্টাইনকে কেন্দ্র করিয়া আরব-ইহুদী বিরোধ এবং বিতর্কের ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য। ব্যালফুর ঘোষণা অনুযায়ী প্যালেষ্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয় বহু পূর্বে এবং আরবগণ তদবধি ইহুদীদিগের প্রতিটি কথা ও কাজ এবং প্রত্যেকটি গতিবিধি অত্যন্ত সংশয় ও শঙ্কার সহিত নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছে।

প্যালেষ্টাইনে আরব ও ইহুদীগণ পাশাপাশি একত্র বাস করিয়া আসিতেছে সহস্র বৎসরেও কিছু অধিককাল ধরিয়া, কিন্তু এই সুদীর্ঘ দশ শতাব্দীর মধ্যে ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়গত কোন বড় রকমের সঙ্ঘর্ষ কোনদিন সংঘটিত হয় নাই। দেশ বিভাগ ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবই সর্ব্বপ্রথম তাহাদের প্রতিবেশিসুলভ মধুর সম্পর্ককে পরস্পরের প্রতি সংশয় ও শঙ্কায় জর্জরিত করিয়া তুলে। ব্যালফুর ঘোষণার প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিতে গিয়া আরবগণ বলে, প্যালেষ্টাইনের উপর ইহুদীগণের দাবী তাহারা কোনক্রমে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নয়, শুধু তাহাই নয়, সে দাবী পরাজিত ও পর্যুদস্ত করিবার জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে তাহারা বদ্ধপরিকর। ব্যালফুর ঘোষণার উল্লেখ করিতে গিয়া তাঁহারা মন্তব্য করে, প্যালেষ্টাইন বৃটিশের খাস মহল নয়। সুতরাং একের সম্পত্তি অপরকে দান করিবার ন্যায় ও নীতিগত কোন অধিকারও তাহার নাই। অবশ্য আরবগণ সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করে যে, বৃটেন আরবকে তুর্কির কবল হইতে মুক্ত করিয়াছে, কিন্তু সেই অধিকারে সে যদি মনে করিয়া থাকে যে প্যালেষ্টাইন তাহার হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি, তাহা হইলে সে ভ্রান্ত ধারণা যত শীঘ্র পরিত্যক্ত হয় ততই মঙ্গল। প্যালেষ্টাইন আবহমানকাল হইতে আরবদেরই আবাসভূমি এবং চিরদিন তাহা আরবীয় অধিকারেই থাকিবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বিপুল ইহুদী সমাজের প্যালেষ্টাইনে প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ পুনরায় প্রাধান্য লাভ করিল। ইহুদী-আরব বিরোধ কার্যতঃ শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে তখন হইতেই। ইহুদী সন্ত্রাসবাদ তখন সবে মাত্র মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে, ধ্বংসাত্মক আন্দোলন পরিপূর্ণ ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি লাভ করিবার পূর্ব্বেই তাহার মূলোচ্ছেদ হওয়া প্রয়োজন, এই উদ্দেশ্যে ইহুদী-আরব সমস্যার সূত্র ও সমাধান নির্ণয়ের জন্য একটি ইঙ্গ-মার্কিণ অনুসন্ধান

কমিটি গঠিত হইল ১৯৪৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে। উক্ত কমিটি ওয়াশিংটনে প্রায় তিন মাসকাল কার্যরত থাকিয়া শুনানী সমাপ্ত করে ২৯শে মার্চ তারিখে এবং ২০শে এপ্রিল তারিখে তাহার রচিত রিপোর্ট সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে যে দশটি সুপারিশ প্রদত্ত হয় তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান:—১৯৪৬ সালের মধ্যে এক লক্ষ প্রবাসী ইহুদী প্যালেষ্টাইনে প্রত্যাবর্তন করিবে; প্যালেষ্টাইনে আরব অথবা ইহুদী কোন প্রকার রাষ্ট্রই গঠিত হইবে না এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অছিগিরি যতদিন না প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিনের জন্য ম্যাণ্ডেটারী শাসনই প্রবর্তিত থাকিবে। বলা বাহুল্য, ইঙ্গ-মার্কিণ অনুসন্ধান কমিটির এই রিপোর্ট কোন পক্ষের সন্তোষ বিধানে সমর্থ হইল না। উপরন্তু রিপোর্ট সম্বন্ধে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলীর মন্তব্য উভয় পক্ষকে অধিকতর উত্তপ্ত ও উত্যক্ত করিয়া তুলিল: মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী বলেন, আরব ও ইহুদীদের যে সব গুপ্ত সেনাবাহিনী আছে, অবিলম্বে সেগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে এবং রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী সমস্ত কার্য যাহাতে যথোপযুক্ত শৃঙ্খলা ও দ্রুততার সহিত সম্পন্ন হয় সে বিষয়ে আরব ও ইহুদীগণকে পরিপূর্ণরূপে সক্রিয় সহযোগিতা দান করিতে হইবে। আরব ও ইহুদীগণ দেখিল কেবলমাত্র তাহাদের দাবীই যে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা নয়, পরন্তু গুপ্তবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিতে বলিয়া এবং তাহাদের স্বার্থবিরোধী একান্ত অবাঞ্ছনীয় ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতার দাবী জানাইয়া কার্য্যতঃ তাহাদিগকে অন্তর্যুদ্ধেই আহ্বান করা হইয়াছে। ইহার পর হইতেই ইহুদী সন্ত্রাসবাদ বৃটেনের বিরুদ্ধে অতিমাত্রায় সক্রিয় হইয়া উঠে। 'ইজরাইলের কণ্ঠ' গোপন বেতার কেন্দ্র হইতে আজ যে ভীতি প্রদর্শন উচ্চারণ করে, ষ্টার্ণ গ্যাং প্রভৃতি দুর্ধর্ষ ইহুদী সন্ত্রাসবাদী দলসমূহ দ্বারা অচিরে তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়।

এদিকে সমগ্র প্যালেষ্টাইন যখন হত্যা ও ধ্বংসলীলার তাণ্ডবে বিধ্বস্ত হইতেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক প্যালেষ্টাইন সমস্যা সম্পর্কে গঠিত একটি বিশেষ কমিটি তখন প্যালেষ্টাইনের ভাগ্য নির্ধারণ কার্যে নিযুক্ত। দীর্ঘদিন কার্যরত থাকিবার পর কমিটি তাহার মেজরিটি রিপোর্ট গত পয়লা সেপ্টেম্বর তারিখে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের সম্মুখে পেশ করিয়াছে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর হইতে দুই বৎসরের মধ্যে প্যালেষ্টাইন দুইটি স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন আরব ও ইহুদী রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া যাইবে এবং অন্তর্বর্তীকালের জন্য বৃটেন প্রয়োজন বোধ করিলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এক বা একাধিক সদস্যের সহযোগিতায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে প্যালেষ্টাইনের শাসনকার্য পরিচালন করিবে। এই প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হইবার ফলে ইহুদী সমাজের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহা বলা কঠিন; কারণ উক্ত সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এ সম্পর্কে কোন অভিমত আজও অপ্রকাশিত। কিন্তু আরব সমাজের মধ্যে যে ইহা দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে তাহার প্রমাণ লণ্ডনস্থ আরব অফিসের ডিরেক্টর জেনারেলের তীব্র মন্তব্য। তিনি বলিয়াছেন, কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত প্যালেষ্টাইন বিভাগব্যবস্থা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে সমরানল প্রজ্বলিত করিবে, সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে সঞ্চিত অপর্যাপ্ত রণসম্ভারের কথাও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। সাধারণভাবে আরবগণের বিশ্বাস, এই প্রতিরোধ সংগ্রামে তাহারা একক নয়; সিরিয়া, লেবানন, মিশর, ইরাক ও সৌদি আরব লইয়া গঠিত সমগ্র আরব লীগ বিপুল শক্তি লইয়া তাহাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে। এই বিভাগব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইহুদীদের আন্তরিক যদি কোন আপত্তি থাকিত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা বাহির হইয়া আসিত সবেগে ও স্বতঃস্ফূর্ত আকারে। তাহা যখন হয়

নাই, তখন তাহাদের তুষ্ণীভাব দেখিয়া ধারণা করিলে অযৌক্তিক হইবে না যে, সাগ্রহে না হইলেও স্বচ্ছন্দ চিত্তে তাহারা ইহা গ্রহণ করিবে।

প্যালেষ্টাইন বিভাগ সম্বন্ধে আরব ও ইহুদীদিগের ভাবগত পার্থক্যের হেতু মনস্তাত্বিক। তাঁহারা একে অপরের সম্বন্ধে শঙ্কিত ও সংশয়াম্বিত, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত কারণে। আরবগণ বাঁচিয়া আছে বিংশ শতাব্দীতে কিন্তু জীবন যাপন করিতেছে মধ্যযুগীয়। পক্ষান্তরে ইহুদীরা জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, উদ্যমে ও প্রগতিশীলতায় আধুনিক যে কোন পাশ্চাত্য জাতির সমকক্ষ। তাহাদের বিপুল কর্মোদ্যম প্যালেষ্টাইনের অংশ বিশেষকে বস্তুতঃ পাশ্চাত্যের কর্মশালায় পরিণত করিয়াছে: আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কর্ষিত ভুমি দেখিতে দেখিতে স্বর্ণশস্যে ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। সমুদ্রতীরবর্তী বন্দরগুলি জাহাজ নির্মাণরত শ্রমিকগণের অশ্রান্ত হাতুড়ির আঘাতে মুখর। চারিধারে নিয়ত কর্মচাঞ্চল্য ও নিপুণ কর্ম পটুতা। আরবগণ শঙ্কিত ও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ইহা দেখে এবং আপনাদের মধ্যযুগীয় শান্ত ও সমাহিত সমাজ-জীবনের সহিত তুলনা করে কিন্তু কোথাও কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায় না। তাঁহারা দেখে নিতান্ত অনাত্মীয় ও অপরিচিত এক জীবনধারা চতুর্দিক হইতে তাহাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত। দেখে এবং আতঙ্কিত হয় এই কথা ভাবিয়া যে, এমন এক দুর্জ্ঞেয় ও দুর্বোধ্যশক্তি তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে উদ্যত হইয়াছে যাহার সহিত তাহাদের জাতীয় সত্তার সম্পর্ক মাত্র নাই। এই অনাত্মীয় ও আগন্তুক সভ্যতার কবলেই কি তাহাদিগকে আত্মবিসর্জন দিতে হইবে। পক্ষান্তরে ইহুদীগণও আরবদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নিঃশঙ্ক নয়: তাহারা ভয় করে তাহাদের সরল জীবনধারাকে, তাহারা ভয় করে তাহাদের অখণ্ড সমাজ সংহতিকে এবং সর্বোপরি তাহারা শঙ্কিত হয় আরবদের দ্রুতবর্ধনশীল জন্মহারের দুর্বার জয়যাত্রা দেখিয়া। তাহাদের আতঙ্ক যদি অবিলম্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

হইতে বিক্ষিপ্ত ইহুদী সমাজকে আহরণ করিয়া আনা না হয়, তাহা হইলে প্যালেষ্টাইনের অধিবাসী মুষ্টিমেয় জনসংখ্যা আরবের জনসমুদ্রে অচিরে বিলুপ্ত হইবে। এই কারণেই বিদেশ হইতে প্যালেষ্টাইনে প্রত্যাবর্তনকামী ইহুদীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ করার জন্ম তাহারা অসন্তুষ্ট। এই জন্য ইহুদীদের স্থানান্তর কার্য বিলম্বিত করার দরুণ তাহারা বিক্ষুব্ধ; বৃটিশবিরোধী ইহুদী সন্ত্রাসবাদের মূলে এই দুইটি কারণই কার্যরত রহিয়াছে।

ইহাই হইল আরব-ইহুদী পারস্পরিক শঙ্কা ও সংশয়ের হেতু; কিন্তু প্যালেষ্টাইন বিভাগ সম্বন্ধে তাহাদের মনোভাবের পার্থক্য ভিন্ন কারণ হইতে উদ্ভূত। ইহুদীগণ জানে, লক্ষ লক্ষ স্বজাতীয়ের শোণিতপঙ্কিল ইউরোপের মাটী তাহাদের বাসগৃহ নির্মাণের যোগ্য স্থান নয়; ইহুদীগণ জানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাচ্য মহাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে বাস করিতে হইলে ক্রমবর্ধমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমুদ্রে অচিরে তাহাদিগকে নিঃশেষে নিমজ্জিত হইতে হইবে। সুতরাং প্যালেষ্টাইনে যতটুকু হোক যে পরিমাণ হোক পা রাখিয়া দাঁড়াইবার মত স্বাধীন মৃত্তিকা পাইলেই সন্তুষ্ট হওয়া তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। বস্তুতঃ প্যালেষ্টাইনই তাহাদের পক্ষে একমাত্র আশ্রয় ও আবাসভূমি, প্যালেষ্টাইনের বাহিরে বিস্তীর্ণ বিশ্বের বুকে আর যে কোন স্থানেই তাহারা যাক না কেন, সেখানে আগন্তুক ও আশ্রয়প্রার্থী ব্যতীত তাহারা আর কিছু নয়। পক্ষান্তরে আরবগণের বিশ্বাস প্যালেষ্টাইন বিভাগের প্রতিরোধসংগ্রামে তাহারা যদি পরাজিতও হয়, তথাপি পশ্চাদপসরণ করিবার মত বিশাল আরব-জগৎ তাহাদের পিছনে আস্তীর্ণ রহিয়াছে; সুতরাং আশ্রয় ও আবাসভূমির দিক দিয়া তাহারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। কিন্তু কর্মঠ ও উদ্যমশীল ইহুদীগণ যদি একবার প্যালেষ্টাইনে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের ভিত্তি পত্তন করিতে পারে, সে রাষ্ট্রের আয়তন

যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ইন্দ্রজাল বিদ্যার সাহায্যে সে রাষ্ট্রকে অচিরকাল মধ্যে তাহারা সর্বদিক দিয়া সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে সক্ষম হইবে। সুতরাং অবিভক্ত প্যালেষ্টাইনে চিরদিনের জন্য সংখ্যালঘু ইহুদীগণকে নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যে সংযত ও সঙ্কুচিত করিয়া রাখাই আরবদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ।

বিশ্বের রাজনৈতিক মঞ্চে শক্তি সংস্থাপনের ও সজ্জিতকরণের যে সতরঞ্চ খেলা চলিতেছে প্যালেষ্টাইন তাহারই একটি ঘুঁটি মাত্র। দেশ জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে কোথাও যদি কোন ক্ষুদ্রতম বিভেদ বিদ্যমান থাকে, উত্তম কূটনৈতিক কুশলতার সাহায্যে তাহাকে এরূপ বিস্তৃত ও বর্দ্ধিত কলেবর করিতে হইবে যে, সে ব্যবধান পক্ষদ্বয়ের পক্ষে অনতিক্রম্য হয় আর যদি পারস্পরিক শঙ্কা ও সংশয়ের প্রকাশ্য কোন হেতু না থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ বিদ্বেষের বিষ-বৃক্ষের বীজ সে মাটিতে রোপণ করিতে হইবে এবং কূটনীতির ভেলকি-বাজির সাহায্যে তাহাকে অচিরে বৃক্ষে পরিণত করিয়া অবিলম্বে ফলপ্রসূ করিতে হইবে ইহাই হইল বিশ্বের শক্তি চতুষ্টয়ের বর্তমান রাজনীতির মর্মকথা। অকল্যাণকর এই নীতির নিপুণ প্রয়োগের দ্বারাই ভারত দ্বিখণ্ডিত, প্যালেষ্টাইন বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত এবং মিশর বিভক্ত হইবার প্রতিক্ষায় প্রহর গণিতেছে। তৌল-দাঁড়ির ফের ভাঙ্গিবার জন্য যেমন একখানা গোটা ইট টুকরা করিয়া বাটখারা বানানো হয়, বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলির শক্তির মান-দণ্ডের সমতা রক্ষার জন্য তেমনি এক জাতি ও রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া একাধিকে পরিণত করা একান্ত প্রয়োজন।

———

প্যালেষ্টাইন পরিস্থিতি

আগামী ১৫ই মে তারিখে প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেটের মেয়াদ শেষ হইবে। প্রায় ত্রিশ বৎসরব্যাপী বৃটিশ শাসনের অবসান আনুষ্ঠানিক-ভাবে ঘোষণার পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে এবং মিঃ চার্চিলের ভাষায় বলিতে গেলে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সম্ভবতঃ মিঃ এ্যালান কানিংহাম 'সাম্রাজ্যের এই শ্রাদ্ধ বাসরে পৌরোহিত্য করিবেন।' তিনি ১৫ই মে-র দুইদিন পূর্বে প্যালেষ্টাইন শাসনের পাততাড়ি গুটাইয়া স্বদেশ যাত্রা করিবেন। প্যালেষ্টাইন পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি লক্ষ্য করিয়াও বৃটেন নির্দিষ্ট দিনে প্যালেষ্টাইন পরিত্যাগ কৃতসঙ্কল্প। অথচ বৃটেন বিদায় লইলে প্যালেষ্টাইনের শাসনভার এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিবার মত প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ আজও গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। এদিকে আরব-ইহুদী সঙ্ঘর্ষ যে অতি সত্বর যথারীতি ব্যাপক সংগ্রামে পরিণতি লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। সুসজ্জিত আরব-বাহিনী প্যালেষ্টাইন আক্রমণের জন্য অদূরে অপেক্ষা করিতেছে এবং ইহুদী সৈন্যও সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ও নিষ্ক্রিয় নয়। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বৃটেন প্যালেষ্টাইন হইতে পা বাড়াইবামাত্র যে মুহূর্তে কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃত্বের বিলোপ ঘটিবে, সজ্জিত ও সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীদ্বয় তদ্দণ্ডে পরস্পরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে তাহাদের সমস্ত শক্তি লইয়া এবং তাহার ফল হইবে প্যালেষ্টাইনের পক্ষে সকল দিক দিয়া বিপর্যয়কর। এই সুনিশ্চিত সর্বনাশা সম্ভাবনা সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়াই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অছিগিরির মেয়াদ আর দশ দিনের জন্য বর্ধিত করিবার নিমিত্ত বৃটেনের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করে, কিন্তু বৃটেন

সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আমেরিকা আশা করিয়াছিল, হয়ত এই কয়দিনের মধ্যে আপোষ রফার একটা পথ আবিস্কৃত হইবে, হয়তো তাহার ফলে প্যালেষ্টাইন অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। কিন্তু সে আশার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন পার্লামেণ্টে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, প্যালেষ্টাইন পরিত্যাগের নির্ধারিত দিন পরিবর্ত্তন করিতে বৃটেন অক্ষম, কারণ তাহা পার্লামেণ্টের নিয়মতান্ত্রিক অনুমোদনসাপেক্ষ এবং সে অনুমোদন লাভ করিবার জন্য পার্লামেণ্টের সমীপস্থ হইলে ইহা সুনিশ্চিত যে, উভয় হাউসের পক্ষ হইতে তাহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইবে। সুতরাং প্যালেষ্টাইনের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, বৃটেন নির্দিষ্ট দিনে প্যালেষ্টাইন পরিত্যাগ করিবেই।

এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির প্রান্তভাগে আসিয়া সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদকে দুইটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; প্রথমতঃ পবিত্র নগরী জেরুজালেমকে অনিবার্য বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করা এবং দ্বিতীয়তঃ প্যালেষ্টাইনের অন্তবর্তীকালীন শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা। প্রথম সমস্যা সম্পর্কে একটি কার্যকরী সমাধানে উপনীত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষরূপে সাময়িক যুদ্ধ বিরতির জন্য উনোর পক্ষ হইতে আরব ও ইহুদী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বহু অনুরোধ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। কিন্তু কোনপক্ষই তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। অবশেষে সাময়িক যুদ্ধ-বিরতির সর্ত ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলাপ আলোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের কনসাল রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই তিনজন সদস্যকে লইয়া একটি শান্তি কমিশন গঠিত হয় এবং আরব নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনার জন্য উক্ত কমিশন জেরিকো যাত্রা করেন। তথায় আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল রহমান আজমপাশা প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনার পর কমিশন প্যালেষ্টাইনে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্যালে-

ষ্টাইন গবর্ণমেণ্টের চীপ সেক্রেটারী সার হেনরী গায়নির সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখন পর্যন্ত আরব নেতৃবৃন্দ যুদ্ধ বিরতি সম্বন্ধে অব্যবস্থিত চিত্ত। এমন সময় বৃটিশ হাই-কমিশনার সার এ্যালান কানিংহাম আসিয়া এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং তাঁহার মধ্যস্থতার ফলে আরব নেতৃবৃন্দ যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। আরব অভিপ্রায় জ্ঞাত হইবার পর ইহুদী পক্ষও যুদ্ধ বন্ধ করিতে সম্মত হন এই সর্তে যে, ইহুদীদিগকে ওয়েলিং ওয়ালের মধ্যে প্রবেশের অধিকার দিতে হইবে এবং জেরুজালেম হইতে বিদেশী সশস্ত্র আরব বাহিনীকে অপসারিত করিতে হইবে। পবিত্র নগরীর নিরাপত্তা রক্ষার অনুকূলে উভয়পক্ষের সম্মতি সংগৃহীত হইবার পর উনোর অছি পরিষদের সম্মুখে জেরুজালেমের শাসন ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রশ্ন দেখা দেয়। এ সম্পর্কে দুইটি বিভিন্ন সূত্র হইতে দুইটি স্বতন্ত্র প্রস্তাব উত্থাপিত হয়: ম্যাণ্ডেটের মেয়াদ শেষ হইবার পর জেরুজালেমের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার জন্য অছি পরিষদ সাধারণ পরিষদের নিকট একটি সুপারিশ প্রেরণ করেন এবং বৃটেন প্রস্তাব করে, জেরুজালেমের পৌর-দায়িত্ব উদ্‌যাপনের জন্য আরব ও ইহুদী উভয়পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য একজন নিরপেক্ষ মেয়র নিযুক্ত করা হোক; বৃটেন এমন কথাও জানাইয়া দেয় যে, প্যালেষ্টাইন সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য ৯ই মে তারিখের পূর্বে প্যালেষ্টাইন গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইলে নগরীর শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার সামরিক অধিকার পর্যন্ত উক্ত মেয়রের হাতে ন্যস্ত করিতে বৃটেন প্রস্তুত। বৃটিশ প্রস্তাব সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে এবং অছি-পরিষদের প্রস্তাব যদিও এখনও বিচারাধীন, তথাপি এরূপ বিশ্বাস করিবার সঙ্গত কারণ আছে যে, উহাও শেষ পর্যন্ত গৃহীত হইবে।

অতঃপর দ্বিতীয় সমস্যা অর্থাৎ ম্যাণ্ডেটের মেয়াদ অন্তে মধ্যবর্তীকালের জন্য সমগ্র প্যালেষ্টাইনের শাসন সমস্যার কথা। এ সম্পর্কে কিউবা

প্রস্তাব করে, প্যালেষ্টাইনের অস্থায়ী শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত সকল বিষয় পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করিয়া দেখিবার জন্য একটি সাব কমিটি গঠন করা হোক এবং তৎসংক্রান্ত পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব অর্পণ করা হোক আর্জেন্‌টিনা, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ক্যানাডা, গুয়েটামেলা, ভারত, রাশিয়া ও আমেরিকা এই অষ্ট রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত এক প্রতিষ্ঠানের হাতে; পরিকল্পনা প্রস্তুত হইলে অষ্টরাষ্ট্র কমিটি পরীক্ষা ও পর্যালোচনার জন্য সাব-কমিটির নিকট তাহা পেশ করিবেন। সিরিয়া ও রাশিয়ার প্রতিনিধি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হন। সিরিয়ার প্রতিনিধি ফারিস এল খৌরী নিয়মতান্ত্রিকতার প্রশ্ন তুলিয়া বলেন, অছি সংসদ কর্তৃক গঠিত এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের প্যালেষ্টাইন শাসনের পক্ষে বিধিসঙ্গত কোন ভিত্তিই নাই। রুশীয় প্রতিনিধির আপত্তি কিন্তু ভিন্ন ধরণের; তিনি বলেন, প্যালেষ্টাইন শাসনের এই সাময়িক ব্যবস্থা আমেরিকারই নবতর সংস্করণ মাত্র, সেই পরিত্যক্ত পুরাতন পরিকল্পনার গাত্রে কিঞ্চিৎ পলেস্তারা করিযা নূতন আকারে পরিবেশন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

আগামী ১৪ই মে মধ্যরাত্রিতে বৃটিশ ম্যাণ্ডেটের পরমায়ুর শেষ হইবে, পর মুহূর্তেই যাহাতে স্বাধীন জুডীয় রাষ্ট্র জন্মলাভ করে ইহুদীগণ তাহার জন্য সকল আয়োজন সমাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। রাষ্ট্রের আইন-কানুন ও নিয়মাবলী ইতিমধ্যেই রচিত হইয়াছে; রাষ্ট্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। সদ্য গঠিত সিভিল সার্ভিস কমিশন ইতিমধ্যেই পঞ্চাশটি গুরুত্বপূর্ণ পদে লোক নিয়োগ করিয়াছেন। মন্ত্রী পরিষদের দপ্তর বিভাগ সমাপ্ত হইয়াছে এবং এমন কি ইহুদী এজেন্সী রাষ্ট্রের পক্ষে ৫ বৎসর মেয়াদে শতকরা তিন পাউণ্ড সুদে দুই কোটি পাউণ্ড জাতীয় ঋণ অবিলম্বে আহ্বান করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন; স্থির হইয়াছে সমুদয় অর্থ সমর

সম্ভার উৎপাদনে ব্যয়িত হইবে। সোভিয়েট রাশিয়া ইতিমধ্যেই সম্ভাবিত রাষ্ট্রের উদ্দেশে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইয়াছেন; সুতরাং বিনা প্রতিবাদে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, জুডীয় রাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সোভিয়েটের স্বীকৃতি লাভ করিবে এবং পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রও তাহাদের সমর্থন জানাইতে বিলম্ব করিবে না। এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়াই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্যালেষ্টাইন বিভাগ সম্বন্ধে তাহার পূর্ব নির্ধারিত মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়। প্যালেষ্টাইন যদি বিভক্ত হয় তাহার ফলে মধ্য প্রাচ্যে সোভিয়েট প্রভাবিত এক স্বাধীন ও শক্তিশালী জুডীয় রাষ্ট্রই জন্মলাভ করিবে এ সত্য আমেরিকা উপলব্ধি করিল বটে, কিন্তু কিছু বিলম্বে এবং যখন করিল, ঘটনাস্রোত তখন বহু দূর প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে।

ইহা হইল ইহুদী পক্ষের প্রস্তুতি ও কর্মতৎপরতার কথা; অপর দিকে আরব পক্ষও পরম নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চিত মনে কাল যাপন করিতেছে না। ট্রান্স জর্ডানের রাজা আবদুল্লা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ ও পরিষদের নিকট প্রেরিত এক নোটে এরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, বৃটিশ ম্যাণ্ডেটের অবসান ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র তীর্থভূমি প্যালেষ্টাইন আক্রমণ ও অধিকার করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প। এইজন্যই সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত আরব লিজিয়ন প্যালেষ্টাইনের বহির্দ্বারে প্রতীক্ষমান। তিনি এরূপ ইচ্ছাও ব্যক্ত করিয়াছেন যে প্যালেষ্টাইনের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইহুদীগণ আরবদের সহিত সমান অধিকার সম্ভোগ করিবে, কিন্তু রাষ্ট্রটি হইবে অবিমিশ্র আরব রাষ্ট্র। দুইটী বিরোধী শক্তির সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতি দেখিয়া মনে হয়, তাহাদের চরমশক্তি পরীক্ষার দিন আসন্ন প্রায়। জেরুজালেম রক্ষা সম্বন্ধে সর্বসম্মত চুক্তি সম্পাদিত হইলেও প্রজ্বলিত সমরানলের স্ফুলিঙ্গ তাহাকে আদৌ স্পর্শ করিবে না এরূপ নিশ্চয়তা দান করা অসম্ভব। তাহা ছাড়া সমগ্র ইউরোপ আজ একটী

বিস্ফোরণোন্মুখ বিরাট বারুদস্তূপ, কে বলিবে, প্যালেষ্টাইন সমরাগ্নির জলন্ত স্ফুলিঙ্গ অনুকূল বায়ুবেগে প্রবাহিত হইয়া তাহার বক্ষে আপতিত হইয়া বিশ্বদাহী দাবানল সৃষ্টি করিবে কি না ?

প্যালেষ্টাইনের শান্তিদূত

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে নিযুক্ত প্যালেষ্টাইনের শান্তিদূত কাউণ্ট ফোক বার্ণাদোত গত ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে জেরুজালেমের ইহুদী অধিকৃত অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইবার সময় আততায়ীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন। কাউণ্ট যে মোটরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাহাতে কর্ণেল সেরট এবং জেনারেল ল্যাণ্ডষ্ট্রোয়েমও তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন, সহযাত্রীদ্বয়ের মধ্যে কর্ণেল সেরটও আততায়ীর আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং জেনারেল ল্যাণ্ডষ্ট্রোয়েম সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরূপে আজও জীবিত। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, ইজরাইল গভর্ণমেণ্টর সামরিক জীপ ধরণের একটি মোটর গাড়ী সহসা সম্মুখে আসিয়া কাউণ্টের গাড়ীর গতিরোধ করে এবং সামরিক পোষাক পরিহিত জনৈক ব্যক্তি জীপ হইতে নামিয়া আসিয়া কাউণ্টের গাড়ীর জানালার মধ্যে টমীগানের নল ঢুকাইয়া দিয়া গুলী করে। জেনারেল লাণ্ডষ্ট্রোয়েম দেখিলেন, কর্ণেল সেরট তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছেন এবং কাউণ্টের দেহ সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। জেনারেল লাণ্ডষ্ট্রোয়েম ভাবিলেন, কাউণ্ট হয়তো আত্মরক্ষার

উদ্দেশ্যেই এরূপ ঝুঁকিয়া পড়িয়া থাকিলেন; তিনি ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিলেন, আপনি কি আহত? কাউণ্ট তাহার উত্তরে মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন মাত্র; তাহার পরেই তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ মোটরের মধ্যে লুটাইয়া পড়িল।

প্যালেষ্টাইন প্রসঙ্গ সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদে উত্থাপিত হইলে যুধ্যমান আরব ও ইহুদী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য কাউণ্ট বার্ণাদোত স্বস্তিপরিষদ কর্তৃক শান্তিদূত নিযুক্ত হন বর্তমান বৎসরের ২০শে মে তারিখে। কার্যভার গ্রহণ করিবামাত্র তিনি আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারেল আজম পাশার সহিত প্রাথমিক আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং সে কার্য সমাপ্ত হইলে ইজরাইল গভর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র সচিবের সহিত আলোচনা আরম্ভ করার উদ্দেশ্যে তেলআভিভ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বার্ণাদোত যে দুইটি উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কার্যে অগ্রসর হন, তাহার একটি স্বল্পমেয়াদী ও অপরটি দীর্ঘ মেয়াদী—(১) তিনি স্থির করিলেন প্রথমতঃ উভয় পক্ষকে যে কোন সর্তে হোক সামরিক যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে সম্মত করাইতেই হইবে এবং তাহা যদি সম্ভব হয়, তখন বিরত-সংগ্রাম শান্ত পরিবেশের মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সন্ধান করিতে হইবে। প্রাথমিক আলাপ আলোচনার ফলে কাউণ্ট তাহার প্রথম উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হইলেন এবং ৬ই জুন তারিখে ঘোষণা করিলেন, আরব এবং ইহুদী উভয় পক্ষই চারিসপ্তাহের জন্য যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। (২) অতঃপর ১৮ই জুন তিনি স্থায়ী শান্তি স্থাপনের কার্যে ব্যাপৃত হইলেন। দশদিন পর্যন্ত থাকিবার পর স্থায়ী শান্তির যে চুক্তিপত্র তিনি প্রণয়ন করিলেন, তাহাতে প্রস্তাবিত হইল, প্যালেষ্টাইনে আরব ইহুদী উভয় পক্ষের যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে, জেরুজালেম থাকিবে আরব অধিকারে এবং তথাকার ধর্ম্ম ও তীর্থস্থান গুলি রক্ষা করা হইবে উভয় পক্ষের যৌথ দায়িত্বে।

কিন্তু এ সন্ধিপত্র উভয় পক্ষের দ্বারাই প্রত্যাখ্যাত হইল। এইরূপে বার্ণাদোত প্যালেষ্টাইনে স্থায়ী শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ মনোরথ হইলেন বটে, তথাপি একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে যে, রক্তক্ষয়ী প্যালেষ্টাইন সংগ্রামের অন্ততঃ এই সাময়িক বিরতিও কাউণ্ট বার্ণাদোতের শ্রম, সহিষ্ণুতা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের ফলেই সম্ভবপর হইয়াছিল।

কাউণ্ট তাহার শান্তি দৌত্যের এই ব্যর্থতার চরম বিবরণ স্বস্তিপরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। সেই উদ্দেশ্যেই আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারেলের সহিত শেষ সাক্ষাৎ সমাধা করিয়া তিনি যখন জেরুজালেমের ইহুদী অধিকৃত অঞ্চলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় পথিমধ্যে তিনি নিহত হন। তাহার ফলে বার্ণাদোত সশরীরে স্বস্তিপরিষদে উপস্থিত হইতে পারিলেন না বটে কিন্তু প্যালেষ্টাইন পরিস্থিত সম্পর্কে তাহার শেষ রিপোর্ট যথাসময়ে সেখানে গিয়া হাজির হইয়াছে। বিবরণীর মুখবন্ধেই কাউণ্ট অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে আরব এবং ইহুদী উভয় পক্ষই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিবে, প্যালেষ্টাইনে শান্তি প্রতিষ্ঠার এরূপ কোন পরিকল্পনা তিনি প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। রিপোর্টে যে মূল সর্তগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা হইল—(১) শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। (২) ইজরাইল রাষ্ট্রের সীমানা চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট করিতে হইবে; (৩) সীমানা ও মানবিক অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক নিশ্চয়তা দান করিতে হইবে; (৪) ইহুদী রাষ্ট্রের বাহিরের দেশগুলির বণ্টন ব্যাপারে প্যালেষ্টাইনের আরবদের সহিত পুরা দস্তর পরামর্শ করিয়া আরব রাজ্যগুলির গবর্ণমেণ্ট সমূহের হাতে তাহা ছাড়িয়া দিতে হইবে; (৫) ইহুদী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় আরব আশ্রয় প্রার্থীদের প্রত্যাবর্তনের অধিকার সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে; (৬) আশ্রয়প্রার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং যাহারা প্রত্যাবর্তন

করিবে না, তাহাদের সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্পর্কিত বিষয় জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের শান্তি কমিশন দেখাশুনা করিবেন; (৭) টেকনিক্যাল বাউণ্ডারী কমিশন আরব ও ইহুদী রাষ্ট্রের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করিয়া দিবেন এবং সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠান তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। (৮) হাইফাকে মুক্ত বন্দর ও লিড্ডাকে বিমান ঘাটি বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে; (৯) তীর্থস্থান গুলির রক্ষা ও সেখানে সকলের প্রবেশাধিকার দিবার ব্যবস্থা করিয়া জেরুজালেমকে সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিতে হইবে; (১০) সম্মিলিতজাতি প্রতিষ্ঠানকে প্যালেষ্টাইন শান্তি কমিশন গঠন করিতে হইবে। সমগ্র প্যালেষ্টাইন পরিস্থিতি চরম অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, এই চুক্তিতে জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য তিনি সাধারণ পরিষদের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন।

উল্লিখিত সর্তাবলী আরবদের নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হইবার হেতু সুস্পষ্ট। ইজরাইলের রাষ্ট্রিক সত্তা বহু রাষ্ট্র কর্তৃক সরকারী ভাবে ইতিপূর্বেই স্বীকৃত হইয়াছে এবং এমনকি সেই সব রাষ্ট্রের কেহ কেহ সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের সদস্য। এই কারণে কাউণ্ট বার্ণাদোতকে ইজরাইলের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রিক সত্তা স্বীকার করিয়া লইয়া বিভক্ত প্যালেষ্টাইনের পরিপ্রেক্ষিতেই শান্তি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। কিন্তু আরবগণ প্যালেষ্টাইন বিভাগ কোনক্রমেই মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়, প্যালেষ্টাইনের উপর একছত্র আরব অধিকারই তাহাদের প্রথম ও প্রধান দাবী। কাজেই যে সন্ধি সর্তে ইজরাইলের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রিক সত্তা স্বীকৃত, আরবগণের তাহাতে সম্মত না হওয়াই স্বাভাবিক।

ইহুদীগণ কিন্তু এসম্পর্কে অত্যন্ত উদার। তাহারা চায়: (ক) বিস্তীর্ণ বিশ্বের বুকে গৃহহারা বেদুইন ইহুদী জাতির জন্য একটি নিজস্ব বাসভূমি এবং (খ) আপনাদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্বতন্ত্র জাতীয়

রাষ্ট্র। আকাংখিত এই দুইটি সামগ্রী যদি তাহারা লাভ করে, তাহা হইলে আরবদের অন্যতম অংশীদাররূপে প্যালেষ্টাইনে অবস্থান তাহাদের অনভিপ্রেত হইবে না।

কিন্তু তাহাদের অসম্মতির হেতু অন্যত্র নিহিত রহিয়াছে : (১) আরবীয় মুসলমানদের অত্যধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং তদুপরি তাহাদের জনসংখ্যার দ্রুত বর্ধমান হার দেখিয়া তাহারা আপনাদের সংখ্যাল্পতা সম্বন্ধে সতত সচেতন,—শুধু তাহাই নয় সর্বদা শঙ্কিত। অথচ সে স্বল্পতা সহসা পূরণ করিবার যে একটিমাত্র পথ তাহাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, আন্তর্জাতিক নির্দেশের দ্বারা তাহাও শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত। সে উপায় হইল প্রবাসী ইহুদীদিগকে যত শীঘ্র সম্ভব প্যালেষ্টাইনে ফিরাইয়া লইয়া আসা। কিন্তু আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রনের দ্বারা বহিরাগত ইহুদীর সংখ্যা পূর্ব হইতে নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট। ইহুদীগণ আশা করিয়াছিল নবরচিত সন্ধিপত্রে সে নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহৃত না হইলেও পর্যাপ্ত পরিমাণে শিথিল করা হইবে। কিন্তু বার্ণাদোত তাঁহার রচিত সর্বশেষ প্রস্তাবে এহেন প্রয়োজনীয় বিষয়কে মূল প্রস্তাবের অঙ্গীভূত পর্যন্ত করেন নাই। প্রসঙ্গ ক্রমে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র : "ইহুদী রাষ্ট্রে অন্যান্য সমস্যার সমাধান হইলে বহিরাগত ইহুদী সমস্যার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব হ্রাস পাইবে, আরব প্রতিবেশীদের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করিয়া বহিরাগত ইহুদী সমস্যা সংক্রান্ত নীতি স্থির করা সহজ হইবে।"

জাতীয় জীবনের মূল প্রশ্নটি যেখানে এইভাবে উপেক্ষিত, তাহার সমাধান যেখানে বৈরভাবাপন্ন আরব রাষ্ট্রের সুবিচার ও সুবিবেচনার উপর নির্ভরশীল, ইহুদীগণ যদি সানন্দে তাহাকে সম্বর্ধনা না করে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। দায়িত্ব সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানরূপে ইজরাইল রাষ্ট্র কেবলমাত্র তাহাদের অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াই বিরক্ত হইতে পারে, কিন্তু চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী দল ষ্টানগ্যাং এর মুখপত্র 'মিত্রাক'এ এই মর্মে একটি

সতর্ক বাণী প্রকাশিত হয় যে কাউণ্ট বার্ণাদোত যদি বহিরাগত ইহুদীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কোনরূপে সচেষ্ট হন, তাহা হইলে জেরু-জালেমে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহাকে হত্যা করা হইবে। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সদস্যগণও এইরূপ সতর্কতা জ্ঞাপক পত্রলাভের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হন নাই। এই কারণে ষ্টার্ণগ্যাং এর মুখপত্র মিত্রাক এর প্রকাশ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়া গত ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইজরাইল সরকার এক আদেশ জারি করেন। তাহার ফলে মিত্রাক এর প্রকাশ বন্ধ হইল বটে কিন্তু বার্ণাদোতের হত্যাকাণ্ড বাধাপ্রাপ্ত হইল না। কাউণ্ট জেরুজালেমের ইহুদী অধিকৃত অঞ্চলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইবামাত্র ষ্টার্ণগ্যাং তাঁহাকে হত্যা করিয়া প্রমাণ করিল যে তাহাদের সতর্কবাণী ভীতি প্রদর্শন মাত্র নয়।

বীভৎস এই হত্যাকাণ্ড সমগ্র পৃথিবীর নৈতিক বিরুদ্ধতা উদ্রিক্ত করিয়াছে। নৃশংস হত্যাকাণ্ডের এই দুঃসংবাদ যখন সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের দরবারে গিয়া পৌছিল, প্যারিসে উহার সাধারণ সভা তখন অধিবেশনরত। মর্মাহত সদস্যগণ তাহার প্রত্যুত্তরে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংকল্পবদ্ধ হইলেন, কারণ নৃশংসতার কথা বাদ দিলেও জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের শক্তি ও মর্যাদার বিরুদ্ধে ইহা একরূপ চ্যালেঞ্জ। অতঃপর প্যালেষ্টাইন সমস্যা সমাধানের জন্য সনদের সপ্তম পরিচ্ছেদ অনুযায়ী সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কি না, সে প্রশ্ন সদস্যগণের বিবেচনাধীনে আসিল।

এদিকে ইতি কর্তব্য নির্ধারণ. লইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান যখন আলোড়িত, ইজরাইল রাষ্ট্র তখন হত্যাকাণ্ডের নির্বিকার দ্রষ্টারূপে নিশ্চিত বসিয়া নাই। তাহার সৈন্য ও পুলিশবাহিনী হত্যাকারীর সন্ধানে ইহুদী অধিকৃত সমগ্র প্যালেষ্টাইন তোলপাড় করিতেছে এবং ষ্টার্ণগ্যাং এর সদস্যগণের সাক্ষাৎ পাইলে তাহাদিগকে ধৃত ও কারারুদ্ধ করিতেছে।

নিজের রাষ্ট্রের কর্তব্যের খাতিরে তো বটেই হত্যাকাণ্ডের নৈতিক গ্লানি ও কলঙ্ক হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিবার জন্যও হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ইজরাইল গবর্ণমেণ্ট বাধ্য। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের সভায় ইজরাইল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ ও বিরূপ মনোভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল, ইজরাইল সরকারের এই কর্মতৎপরতার ফলে তাহার তীব্রতা হয়তো কিছুটা পরিমাণ মন্দীভূত হইতে পারে। তথাপি জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের দিকে লক্ষ্য রাখিলে এরূপ সংশয় পোষণ করা অসঙ্গত হইবে না যে কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক বার্ণাদোতের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ইজরাইল গবর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে অভিযুক্ত হইতে পারেন। বস্তুতঃ এরূপ সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই উদ্ভূত হইয়াছে : সিরিয়ার প্রধান মন্ত্রী জামিল মর্দাম যে গত ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে দামাস্কাসে প্রকাশ্য ভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন যে কাউণ্ট বার্ণাদোতের হত্যা সম্পর্কে সিরিয়া সরকার জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের দরবারে তথাকথিত ইজরাইল গভর্ণমেণ্টকে প্রত্যক্ষভাবে অভিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অভিযোগ উত্থাপিত হইলে তাহা যে গৃহীত ও আলোচিত হইবে, আমরা তাহা ধরিয়া লইতে পারি ; সংশয় যাহা কিছু তাহা শুধু শেষ সিদ্ধান্ত লইয়া।

ইজরাইল রাষ্ট্রের জন্য সোভিয়েটের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ্য ও পরিচিত ব্যাপার ; এরূপ ক্ষেত্রে ইজরাইল গভর্ণমেণ্টকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়া অসম্ভব এবং তদপেক্ষা অসম্ভব—সোভিয়েট বিরোধিতা সত্ত্বেও সে সিদ্ধান্ত ভোটাধিক্যে গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী কার্যকরী কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা। পরিণতি যাহাই হোক, আপাততঃ এটুকু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে কাউণ্ট বার্ণাদোতের হত্যাকাণ্ডের দরুণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নৈতিক প্রতিবাদই জাগ্রত হয় নাই রাজনৈতিক জটিলতাও উদ্ভূত হইয়াছে।

কুয়োমিনটাং-কমিউনিষ্ট মিলন ?

কিছুদিন হইতে চীনে কুয়োমিনটাং ও কমিউনিষ্টদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে এমন পরস্পরবিরোধী সংবাদ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে যে, চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বহির্জগতের পক্ষে দুর্বোধ্য প্রহেলিকার মত হইয়া দাঁড়ইয়াছে। গতকল্য এইরূপ দুইটি স্ব-বিরোধী খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। উভয় সংবাদেরই উৎস স্থান লণ্ডন। এতদুভয়ের একটি সংবাদে প্রকাশ, চীনে গৃহযুদ্ধের আগুন আবার উগ্রতর আকারে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এবারের আক্রমণোদ্যোগ কমিউনিষ্ট বাহিনীর হাতে। মুকদেনের সহিত রেলপথের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে সাত দিক হইতে তাহারা জাতীয়বাহিনীকে আক্রমণ করিয়াছে। একই তারিখের অপর সংবাদটি হইতে জানা যায়, চীনা সরকারী সৈন্যদল ও কমিউনিষ্ট সৈন্যদলকে লইয়া একটি মিলিত বাহিনী গঠন করিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত ; পরের দিন এ সম্পর্কে এক চুক্তি সম্পাদিত হইবে। চুংকিং হইতে প্রাপ্ত ২৫শে ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদ দ্বারা শেষোক্ত খবরটি সমর্থিত হইতেছে। ইহা হইতে জানা যায়, ঐদিন অপরাহ্নে চীনা জাতীয়বাহিনীর মধ্যে কমিউনিষ্ট বাহিনীর আত্ম-বিলয়ের চুক্তি যথারীতি নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন চীনের জাতীয় সমর পরিষদের রাজনৈতিক বিভাগের অধিনায়ক জেনারেল চাং চিন্ চুং, কমিউনিষ্ট নেতা জেনারেল চু এন লাই এবং মধ্যস্থরূপে আমেরিকা যুক্ত-রাজ্যের রাষ্ট্রদূত জেনারেল জর্জ মার্শাল। চুক্তি অনুযায়ী স্থির হইয়াছে যে, তিনশত হইতে চারিশত ডিভিসন সৈন্য নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে, তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া দেড় বৎসরের মধ্যে কুড়িটি বাহিনী

গঠন করা হইবে এবং প্রেসিডেণ্ট চিয়াং কাইসেকের অধিনায়কত্বে পাশ্চাত্য প্রথায় তাহাদিগকে শিক্ষিত ও সংগঠিত করিয়া তোলা হইবে।

জানি না, এ সংবাদ কতদূর সত্য। চীনের অবস্থাপরম্পরার কথা স্মরণ করিয়া ইহাকেই চূড়ান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারিতেছি না। এই চুক্তি সম্পাদনের সংবাদ যদি সত্যই হয়—আমরা আশা করি, তাহা সত্যই হোক, তাহা হইলে কুয়োমিনটাং-কমিউনিষ্ট বিরোধের পঞ্চদশ বর্ষব্যাপী তিক্ত ইতিহাসের এতদিনে পরিসমাপ্তি ঘটিল। এই ইতিহাসের ক্রমিক ধারা যেমন জটিল, তেমনি দীর্ঘ। রুশ-বিপ্লবের পর বল্‌শেভিকগণ যখন নিজেরাই রাশিয়ার মাটিতে বেশ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে নাই, তখন হইতেই তাহারা প্রাচ্যদেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রণ্ট গঠনের জন্য চীনের সহিত আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। তাহার ফলে ১৯২৩ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত সান-ইয়াত-সেনের এই মর্মে এক চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, যেহেতু চীন এখনও 'সমাজবিপ্লব সঙ্ঘটনের উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়, সেই জন্য উক্ত মতবাদ প্রচার ভাবীকালের জন্য স্থগিত রাখিয়া, চীনের জাতীয় সংহতি গড়িয়া তুলিবার কার্যে উভয় দেশ পরস্পরের সহযোগিতা করিবে। সেদিনের বিশ্বের পরিস্থিতি চীনের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের সম্পূর্ণ অনুকূল। প্রথম মহাযুদ্ধের আঘাতে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মেরুদণ্ড তখন ভগ্নপ্রায়। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধান লক্ষ্য গ্রেটবৃটেন; প্রধানতঃ তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কুয়োমিনটাং-সোভিয়েট চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু বৃটেনও তখন ঘরে-বাহিরে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত। শ্রমিক বিক্ষোভ তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া তাহার অভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায় পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেছে। অপর দিকে ভারতের গণবিক্ষোভ প্রচণ্ড আঘাতে সারা দেশটাকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। প্রত্যক্ষ স্বার্থের কোন সম্পর্ক না থাকায় আমেরিকা ও ফ্রান্স চীন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। কমিউনিষ্ট

কুয়োমিনটাং-এর মিলিত শক্তির সহিত সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া বৃটেন কবে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া ধুঁকিবে সেই স্বর্ণ সুযোগের প্রতীক্ষায় জাপান দূরে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। চীনের জাতীয় বিপ্লবের আয়োজন সর্বদিক দিয়া সম্পূর্ণ। চৈনিক বিপ্লব সার্থক হইলে, সমগ্র এসিয়া তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে। নিখিল এসিয়া সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় উন্মুখ, এমন সময় সহসা বায়ু প্রতিকূল বহিল। ইতিমধ্যে লেনিনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। ষ্ট্যালিন ও ট্রটস্কির দ্বৈরথদ্বন্দ্বে সোভিয়েট রাশিয়া তখন এমন বিব্রত যে, বৈদেশিক ব্যাপারে মনোনিবেশ করিবার মত তাহার না ছিল সামর্থ্য, না ছিল সুযোগ। চীনের অভিজাত সম্প্রদায় কমিউনিষ্ট-কুয়োমিনটাং মিলনের ভাবী পরিণাম ভাবিয়া শঙ্কিত। বৃটেন তাহার সমূহ বিপদ আসন্ন দেখিয়া সন্ত্রস্ত। এই অবকাশে বৈদেশিক স্বার্থ ও দেশীয় আভিজাত্য সাধারণ স্বার্থ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। এদিকে কমিউনিষ্ট ও কুয়োমিনটাং-এর মিলিত সৈন্যদল সাংহাই আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে। জাতীয়বাহিনীর অধিনায়ক-রূপে চিয়াং কাইসেক সাংহাই অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং অবরোধ-কারী শ্রমিকদের হাত হইতে সাংহাই উদ্ধার করিয়াই কমিউনিষ্টদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। অতঃপর নানকিং-এ যে নূতন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল তাহারাই কমিউনিষ্ট দমনের কার্যে আত্মনিয়োগ করিল। ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মস্কোর সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নবগঠিত নানকিং সরকার রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার শেষ-সূত্রটুকু ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। এখন হইতে অশ্রান্ত সংগ্রাম ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়া কুয়োমিনটাং ও কমিউনিষ্ট দল স্ব স্ব অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইলেন। চিয়াং কাইসেকের শাসনের চাপে ও বাধায় কমিউনিষ্ট প্রভাব কখনও-বা সঙ্কুচিত হইয়াছে, আবার কখনও-বা সেই বাধা উপেক্ষা করিয়া প্রসার লাভ করিয়াছে।

দীর্ঘ দিনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আজ সমাপ্ত হইয়াছে বটে, তথাপি সংশয় হয়, এ মিলন কি সত্য সত্যই আন্তরিকতাপ্রসূত প্রয়োজনের তাগিদে সংঘটিত না অপর কোন উদ্দেশ্য সাধনের পারস্পরিক চাতুরী মাত্র? মিলন যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে এত কয়টি বৈদেশিক শক্তি চীনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আজও তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়া আছে কোন অজুহাতে? জাপানী আক্রমণের আশঙ্কা তিরোহিত, জাতির অন্তর্বিরোধ নিরস্ত; এখন চীনে তাঁহারা অবাঞ্ছনীয় অতিথি। এরূপ ক্ষেত্রে সসম্মানে যত শীঘ্র সম্ভব চীন ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া যাওয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু বর্তমান চীন অন্তর্বিরোধ ত্যাগ করিয়া ঐক্যবদ্ধ জাতীয় দাবী উপস্থিত করিতে না পারিলে চীন হইতে বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তি বিদায় গ্রহণ করিবে কি?

চীন যুদ্ধের গতি ও পরিণতি

দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের সমাপ্তির পর হইতেই চীন-গৃহযুদ্ধের বর্তমান পর্যায় এবং সম্ভবতঃ শেষ পর্যায়ের সূত্রপাত। তখন হইতেই ইহার শম্বুক-গতিতে বেগ সঞ্চার হইতে থাকে এবং ১৯৪৮ সনের প্রান্তসীমায় আসিয়া তাহা পরিপূর্ণ বেগপ্রাপ্ত হয়।

চীনা কমিউনিষ্ট বাহিনী উত্তর চীনের শৈল-অবরোধ হইতে বহির্গত হইয়া বিপুল বেগে দক্ষিণ ও মধ্যচীনে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং কুওমিনটাং বাহিনীর দুর্ব্বল প্রতিরোধ অনায়াসে পদদলিত করিয়া ইয়াংসী তীরে আসিয়া উপনীত হয়। জাতীয় চীনের রাজধানী নানকিংয়ে উপনীত হইবার পথে ইয়াংসী নদীই তাহাদের সম্মুখে একমাত্র প্রাকৃতিক

বাধা এবং ইয়াংসী নদীর উজানে ও ভাঁটিতে সে বাধা অতিক্রম করিবার জন্য কমিউনিষ্ট বাহিনী তখন উদ্যোগ ও আয়োজনে রত। মার্শাল চিয়াং কাইশেক তৎপূর্ব্বেই জাতীয় সেনাবাহিনীর আসন্ন বিপর্যয়ের আভাস পাইয়াছিলেন; তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ক্রমাগত পরাজয় বরণ করার ফলে সেনাদলের মনোবল ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। দফায় দফায় দলত্যাগের দরুণ তাহাদের সঙ্ঘ ও সংখ্যা-শক্তি অতি দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। প্রতিবিধানের অযোগ্য মুদ্রাস্ফীতির জন্য জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা চরমে আসিয়া উপনীত হইয়াছে এবং সর্ব্বোপরি, দীর্ঘকালব্যাপী গৃহযুদ্ধের দুর্ব্বহ ব্যয়ভারের চাপে জাতীয় চীনের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতে উদ্যত হইয়াছে।

মার্শাল চিয়াং-এর বাস্তব দৃষ্টির উন্মেষ
নববর্ষে বেতারে-যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব

মার্শাল চিয়াং উপলব্ধি করিলেন, মুমূর্ষু চীনকে বাঁচাইতে হইলে যে কোন উপায়ে আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধের আশু বিরতি আনয়ন করা একান্ত আবশ্যক। তাই ১৯৪৯ সনের গত পয়লা জানুয়ারী তারিখে বেতারযোগে চীনের অধিবাসিগণের উদ্দেশে নববর্ষের শুভেচ্ছার বাণী প্রচার করিতে গিয়া প্রসঙ্গতঃ তিনি চীনা কমিউনিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ বিরতির অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন; তিনি প্রস্তাব করিলেন, আপাততঃ কোনরূপ সর্ত সাব্যস্ত না করিয়া উভয়পক্ষ হইতে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ প্রদত্ত হোক এবং সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্ঘর্ষ স্থগিত হইয়া গেলে শান্ত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার দ্বারা স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সন্ধান করা যাইবে।

তাহার উত্তরে চীনা কমিউনিষ্ট বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মাও-সে-তুঙ বেতারযোগে জানাইয়া দিলেন, মার্শাল চিয়াং-এর প্রস্তাব

বিবেচনার সম্পূর্ণ অযোগ্য ; শুধু তাহাই নয়, নিম্নলিখিত আট দফা সর্তসম্বলিত এক পাল্টা প্রস্তাব তিনি ঘোষণা করিলেন :

(১) বিচারান্তে যাঁহারা যুদ্ধাপরাধিরূপে সাব্যস্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে শাস্তি দিতে হইবে ;

(২) বর্তমান ভূয়া শাসনতন্ত্রের বিলোপ সাধন করিয়া গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিতে হইবে ;

(৩) কুওমিনটাং কর্তৃক গঠিত ব্যবস্থা-পরিষদসমূহ ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে ;

(৪) প্রতিক্রিয়াশীল সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিয়া গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে তাহার পুনর্গঠন করিতে হইবে ;

(৫) বিদেশী আমলাতান্ত্রিক শক্তির মূলধন বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে ;

(৬) বর্তমান কৃষি আইনের সংস্কার সাধন করিতে হইবে ;

(৭) জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতামূলক যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, তৎসমুদয় নাকচ করিতে হইবে এবং

(৮) কুওমিনটাং গবর্ণমেণ্ট ও তাহার শাখা প্রতিষ্ঠানসমূহ হাত হইতে শাসনভার-গ্রহণের নিমিত্ত গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট গঠনের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সভা আহ্বান করিতে হইবে।

কুওমিনটাং দলের গোঁড়া ও রক্ষণশীল সদস্যগণ তন্মুহূর্তেই ঘোষণা করিলেন, কমিউনিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য এই কারণে যে, মার্শাল চিয়াং সমেত দলের যে ত্রিশজন বিশিষ্ট সদস্য কমিউনিষ্টগণ কর্তৃক পূর্ব হইতেই যুদ্ধাপরাধিরূপে চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছেন, নিহত হইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করিতে তাঁহারা কোনক্রমেই প্রস্তুত নহেন। কুওমিনটাং মন্ত্রিসভা কিন্তু তথাপি সরকারীভাবে সে

প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিলেন না, তাঁহারা বিচার-বিবেচনার জন্য সময় লইলেন এই আশায় যে, আলাপ-আলোচনার দ্বারা দাবীর মাত্রা যদি কিছুটা অবনমিত করা সম্ভব হয়। কমিউনিষ্ট কর্তৃপক্ষও সে সময় দিতে অসম্মত হইলেন না, কারণ বিপুল বাহিনী লইয়া ইয়াংসী অতিক্রমের জন্য যে প্রস্তুতি প্রয়োজন, তাহা তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই; নানকিং রক্ষা-ব্যবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধে কমিউনিষ্ট সামরিক কর্তৃপক্ষের ধারণা তখনও অত্যন্ত অস্পষ্ট।

এদিকে পেইপিঙ-এর পতন তখন আসন্নপ্রায়। কমিউনিষ্ট বাহিনী যখন পেইপিঙ নগরীর বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান, অত্যন্ত দ্রুততার সহিত গঠিত এক নাগরিক প্রতিনিধিদল কমিউনিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত সরাসরি সাক্ষাৎ করিলেন এবং আলাপ-আলোচনার শেষে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকেই পেইপিঙ-এর জন্য এক স্বতন্ত্র শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করিলেন। অবশ্য সে সন্ধি যদিও কার্যতঃ আত্মসমর্পণেরই নামান্তর, তথাপি তাহার ফল হইল এই যে, কমিউনিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেই চুক্তি-পত্রটিকে আদর্শ স্বরূপ সম্মুখে স্থাপন করিয়া নানকিং গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দিলেন যে, যেহেতু নানকিং সরকার জনসাধারণের আস্থাভাজন নহেন, অতএব তাঁহাদের সহিত যুদ্ধবিরতি অথবা স্থায়ী শান্তি সম্পর্কে কোনরূপ আলাপ-আলোচনা চালাইতে তাঁহারা অসম্মত; আলোচনা যদি একান্ত আবশ্যকই হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য জনসাধারণের প্রতিভূস্থানীয় নাগরিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিতে হইবে। জাতীয় চীনের অস্থায়ী সভাপতি জেনারেল লি-সুঙ-জেনের পক্ষে অবজ্ঞার এ আঘাত অত্যন্ত রূঢ় ও মর্মান্তিক।

চীনা কমিউনিষ্টগণ মার্শাল চিয়াং-এর বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করেন কাজেই মার্শাল চিয়াং জাতীয় গবর্ণমেণ্টের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে শান্তি সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হইতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি ইতিপূর্বেই চিয়াং কাইশেককে রাজনীতিক্ষেত্র

হইতে সাময়িকভাবে সরিয়া দাঁড়াইতে একরূপ বাধ্য করিয়াছেন ; তৎসত্ত্বেও এই রূঢ় প্রত্যাখ্যান !

কিন্তু এ আঘাতেও জেনারেল লি সুঙ-জেনের চৈতন্যোদয় হইল না, তিনি অদম্য উৎসাহে শান্তি স্থাপনের আশায় তথাপি আলোচনার সূত্র অনুসরণ করিয়া চলিলেন : তিনি একবারের জন্যও ভাবিয়া দেখিলেন না, কমিউনিষ্ট বাহিনী যে বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করিয়া এই দীর্ঘ ও দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, সে কি শুধু কুয়োমিণ্টাং দলের সহিত মন্ত্রি-পরিষদের কয়েকটি আসন বণ্টন করিয়া লইবার জন্য ? কদাচ নহে। তাহারা অগ্রসর হইয়া আসিতেছে দৃষ্টির সম্মুখে একটি সুস্পষ্ট আদর্শ লইয়া এবং তদপেক্ষা স্পষ্টতর একটি কর্মপন্থা অনুসরণ করিয়া ; কাজেই সামরিক পরাজয় ব্যতীত অন্য কোন কারণেই সে আদর্শ ও কর্মপন্থার অনুসরণ হইতে তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইবে না।

দিন যতই গত হইতেছে, আলাপ-আলোচনার ছদ্ম আবরণতলে ইয়াংসী অতিক্রমের প্রস্তুতি ততই সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। অবশেষে কমিউনিষ্ট বাহিনী একদিন মৈত্রীর মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া স্বরূপে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল এবং সুরু হইল ইয়াংসী অতিক্রম করিবার বিপুল অভিযান। রাজধানী ইতিপূর্ব্বেই নানকিং হইতে ক্যাণ্টনে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং তথা হইতে শাসনকার্য পরিচালিত হইতেছে, প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার সান-ফোর নেতৃত্বে। প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও কমিউনিষ্ট বাহিনী ইয়াংসী অতিক্রম করিল এবং তাহার পর নানকিং হইতে সাংহাই অবধি যাহা ঘটিল, তাহার ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত : জাতীয় চীনের রাজধানী নানকিং এবং বৃহত্তম বাণিজ্যিক বন্দর সাংহাই বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিল।

সাংহাই অধিকার সম্পূর্ণ করিবার পর মুহূর্তমাত্র বিরাম গ্রহণ না করিয়া কমিউনিষ্ট সেনাদল ক্যাণ্টন লক্ষ্য করিয়া দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। সবিস্ময়ে সকলেই প্রশ্ন করিতেছে, ধ্বংসাবশিষ্ট যে সৈন্যবল

আজও জাতীয় সরকারের অধীনে রহিয়াছে, শেষ সংগ্রামের জন্য তাহারা কোথাও দণ্ডায়মান হইবে কি? যদি হয়, তবে কোথায়? ক্যাণ্টনে অথবা অন্য কোথাও?

কৌতূহলী এ প্রশ্নের জবাব ভবিষ্যতের গর্ভে নিহীত, কিন্তু বর্তমানে ইহা বাস্তব সত্য যে, নানকিং এবং সাংহাই অধিকৃত হইবার পর চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি চীন সম্পর্কে কথা কহিবার রাজনৈতিক যোগ্যতা ও অধিকার অর্জন করিল। এই কারণে চীনস্থ বৈদেশিক শক্তিবর্গের সম্মুখে কমিউনিষ্ট গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃতির প্রশ্ন ইতিমধ্যেই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। মার্কিন গভর্ণমেণ্ট অবশ্য সূচনাতেই স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে সতর্ক করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, চীনা কমিউনিষ্ট গভর্ণমেণ্টের সহিত সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যাপারে স্বতন্ত্রভাবে অগ্রসর না হইয়া তাঁহারা যেন একটি সাধারণ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে সচেষ্ট হন, অন্যথায় কমিউনিষ্ট কর্তৃপক্ষ দর কষাকষির মাধ্যমে একের বিরুদ্ধে অপরকে প্রয়োগ করিবার বাঞ্ছিত সুযোগ অর্জন করিবেন। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ অতঃপর কমিউনিষ্ট গভর্ণমেণ্টের কর্মতৎপরতা গভীর আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতে থাকিবেন এবং কমিউনিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসরণ না করিয়া ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, গণতান্ত্রিক আদর্শ বর্জন করিয়া শাসনযন্ত্রের উপর দলীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন না করিয়া তথায় অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টির জন্য প্ররোচনা-দানে প্রবৃত্ত হন, সর্বোপরি স্বাধীন ও সার্বভৌম চীনা সাধারণতন্ত্র গঠন না করিয়া, তাহাকে সোভিয়েটের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করিতে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে সম্পর্ক নির্ধারণের প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বিচার করিতে হইবে এবং সে বিচারের সিদ্ধান্ত কমিউনিষ্ট গবর্ণমেণ্টের অনুকূল না হওয়াই স্বাভাবিক।

[illegible] বিষয়ও লক্ষণীয় যে, চীনে কমিউনিষ্ট অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার শেষ অধ্যায়ে সোভিয়েট চীন-স্থিত তাহার দূতাবাস বন্ধ করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং নূতন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত দূতাবাস বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। চীনের কমিউনিষ্ট দলের প্রতি এংলো-আমেরিকার মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সোভিয়েট এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা।

চীনের অদৃষ্ট চিন্তা করিতে গেলে হংকংকে বাদ দিয়া তাহা করা চলে না। হংকং চীনের মূল ভূভাগের অন্তর্গত বৃটিশ অধিকৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর।

কমিউনিষ্ট কর্তৃপক্ষ স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া দিয়াছেন যে, চীনের অভ্যন্তরে বৈদেশিক অধিকারের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইবে না এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও অনুরূপ দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া দিয়াছেন, হংকং-এর অধিকার তাঁহারা কোনক্রমেই হস্তান্তর করিবেন না। এরূপ ক্ষেত্রে হংকং লইয়া কমিউনিষ্ট চীন ও বৃটেনের মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটা সামরিক সংঘর্ষ সংঘঠিত হইবার একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা ও সম্ভাবনা পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে নিহিত রহিয়া গেল এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না।

চীন সোভিয়েট মৈত্রী

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কমিউনিষ্ট চীন ও সোভি[illegible] মধ্যে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। চুক্তি সম্পাদন [illegible] হইবার সঙ্গে সঙ্গে মস্কো রেডিওযোগে চুক্তি-পত্রের সর্তাবলীর যে [illegible] বিবরণ প্রচারিত হয়, তাহাতে উক্ত চুক্তিকে সোভিয়েট ইউনি[illegible] ও চীনের পিপ্‌লস রিপাব্লিকের মধ্যে মৈত্রী, সহযোগীতা ও পারস্পরিক সাহায্যমূলক চুক্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ১৯৪৫ সালে চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত যে চুক্তি সম্পাদন করে— আলোচ্য চুক্তি সাক্ষরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইল। মস্কো চুক্তি মোটামুটি দুইটি ভাগে বিভক্ত: তাহার মূল অংশটি একটি দীর্ঘ মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি এবং অপর অংশটি দুইটি স্বতন্ত্র চুক্তির সমবায়ে গঠিত। মূল চুক্তির সর্ত অনুযায়ী সাব্যস্ত হইয়াছে। (১) সোভিয়েট রাশিয়া চীনকে ৩০ কোটি মার্কিণ ডলারের সমপরিমাণ অর্থ জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য ঋণস্বরূপ দান করিবে; উক্ত ঋণ ১৯৫০ সালের পয়লা জানুয়ারী হইতে ১৯৫৪ সালের পয়লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে সমান পাঁচটি কিস্তিতে প্রদত্ত হইবে এবং উক্ত ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে পরবর্তী বৎসর হইতে দশ বৎসরের মধ্যে সমান দশটি কিস্তিতে; সোভিয়েট উক্ত ঋণ দান করিবে কিয়দংশ নগদ মুদ্রায় ও বাকী অংশ কল-কারখানা ও রেলওয়েসমূহের সাজ-সরঞ্জামরূপে এবং চীন উক্ত ঋণ পরিশোধ করিবে হয় নগদ মুদ্রায়, নয় কাঁচা মাল সরবরাহ করিয়া। (২) মাঞ্চুরিয়ান রেলওয়ের ও মাঞ্চুরিয়ায় অবস্থিত জাপানী কল-কারখানাসমূহের অধিকার চীনের হাতে প্রত্যর্পিত হইবে; (৩) জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হইবার পর অথবা ইতিমধ্যে

[illegible] মহাদেশের—[illegible]
[illegible]য়ী প্রভাব বিস্তার
তাহার মুখবন্ধে
[illegible]ন আদর্শ
[illegible]ংস্করণ

অন্যদিকে ইহাও লক্ষণীয় যে, [illegible]
হইবার শেষ অধ্যায়ে লেভিয়েন ও পোর্ট আর্থার হইতে তাহার সৈন্যবাহিনী
বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং উক্ত বন্দর দুইটী যথারীতি চীনের অধিকারভুক্ত
দূতাবাস বন্ধ রাখির অপরাংশ কতকটা সামরিক চুক্তির সামিল; তদ্দ্বারা
দলের প্রতি এংঘাছে যে, সোভিয়েট রাশিয়া ও কমিউনিষ্ট চীন যে,
সোভিয়েট এবং জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য সচেষ্ট হইবে
চীনেং চুক্তিবদ্ধ উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে কোন একটি যদি পুনর্জাগ্রত জাপানী
সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয় চীন অথবা অন্য যে কোন রাষ্ট্রের দ্বারা আক্রান্ত
হয়, তাহা হইলে অপর রাষ্ট্র তাহার সর্বশক্তি লইয়া আক্রান্ত রাষ্ট্রের পার্শ্বে
আসিয়া দণ্ডায়মান হইবে। সদ্য সম্পাদিত এই চুক্তির মেয়াদ হইবে
ত্রিশ বৎসর এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার অন্ততঃপক্ষে এক বৎসর পূর্বে
চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র-দ্বয়ের যে কোন একপক্ষ যদি চুক্তিবন্ধন ছিন্ন করিবার
অভিপ্রায় জ্ঞাপন না করেন, তাহা হইলে তাহার মেয়াদ আরও পাঁচ
বৎসরের জন্য বর্ধিত হইতে পারিবে।

এই চুক্তি সম্পাদন এশিয়ার তথা বিশ্বের আন্তর্জাতিক রাজনীতি
ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অতিশয় গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ এক রাজনৈতিক ঘটনা
এবং পিকিং গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ চৌ-এন-লাই মস্কো সম্মেলনে
ভাষণ দান প্রসঙ্গে সেই অভিমতই অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত
করিয়াছেন। তিনি বলেন,

"There can be no doubt that this close and sincere co-operation between China and Soviet union has profound historical meaning and will inevitably have a paramount influence on the cause of peace and justice of the Eastern peoples and of the world."

অতএব নিঃসন্দেহে একথা বলা যাইতে পারে যে, চীন ও সোভিয়েট

ইউনিয়নের মধ্যে স্থাপিত ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক সহযোগিতার এই সম্পর্ক এক গভীর ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ ঘটনা এবং প্রাচ্য মহাদেশের—তথা বিশ্বের জনগণের শান্তি ও সুবিচারের অনুকূলে তাহা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিবে। অবশ্য বিরোধী ব্লকদ্বয় যাহাই করুন না কেন, তাহার মুখবন্ধে থাকে বিশ্বশান্তি বিধানের ও বিশ্বের জনগণের মুক্তিসাধনের মহান আদর্শ ও পবিত্র প্রতিশ্রুতি; এমন কি, আণবিক বোমার উন্নততর সংস্করণ হইতে সুরু করিয়া হাইড্রোজেন বোমা পর্যন্ত নির্মিত হইতে চলিয়াছে সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই। কাজেই মামুলী আদর্শবাদিতার বাঁধা বুলি বাদ দিলেও একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, কমিউনিষ্ট চীনের মাধ্যমে সোভিয়েটের প্রাচ্য মহাদেশের বিশাল রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের পথ সুপ্রশস্ত হইল এবং চীনে কমিউনিষ্ট বিজয়ের ফলে এশিয়ার শক্তি-সাম্যের যে ভারকেন্দ্র সাময়িকভাবে বিচলিত হইয়াছিল মাত্র এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার দরুণ তাহা স্থায়ীভাবে ও সন্দেহাতীতরূপে সোভিয়েটের অভিমুখী হইল। এখন মালয়, ইন্দোনেশিয়া এবং ইন্দোচীনের কমিউনিষ্ট অভিযানকে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা ও প্রশ্রয় এবং পুষ্টি দান সোভিয়েটের পক্ষে সহজসাধ্য এবং শ্যাম প্রভৃতি দেশ পর্যন্ত কমিউনিষ্ট পার্টিসমূহের অনুকূলে সহযোগিতার কর প্রসারণ করা এখন আর তাহার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইবে না। মার্কিণ কর্তৃপক্ষ তাই এই চুক্তির গুরুত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহা করিয়াছেন বলিয়াই অত্যন্ত তৎপরতার সহিত তাঁহাদের বিশ্ব রাজনীতির বিরাট ষ্ট্রাটাজির ভারকেন্দ্র ইউরোপ হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্থানান্তরিত করিয়াছেন। বৃটেনও তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধে আদৌ অনবহিত নয়; তাই কমিউনিষ্ট চীনের স্বীকৃতি সম্পর্কে সে মার্কিণ-নিরপেক্ষ যে স্বাধীন মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিল, ইন্দোচীনের হো-চি-মীন গবর্ণমেণ্টের স্বীকৃতি ব্যাপারে তাহা প্রদর্শন করিতে সে কুণ্ঠিত; শুধু তাহাই নয়, অনুরূপ তৎপরতার সহিত বাও-দাই গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার

...ঙ্ক্ষিত ছিল না বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

...পিং ওয়াং ও মিঃ কাও যে সুদীর্ঘ সময় ধরিয়া মস্কোতে চুক্তি সম্বন্ধীয় আলোচনা চালাইতেছিলেন, মার্কিণ ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট কিন্তু তখন নিশ্চেষ্ট বসিয়াছিলেন না; আলোচনাধীন চুক্তির গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবহিত রহিয়াই তৎসম্পর্কিত গোপন তথ্য আহরণে তাঁহারা ব্যস্ত ছিলেন এবং চুক্তির সর্তাবলী সাধারণে প্রচারিত হইবার বহু পূর্বেই গোপন কূটনৈতিকসূত্রে তথ্য হিসাবে তাহার বিকৃত বিবরণ সংবাদপত্রে প্রচার করিয়া দেন। সম্ভবত; সেই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই মার্কিণ ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট সোভিয়েটের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে এইরূপ অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, বহির্মোঙ্গলিয়া, অন্তর্মোঙ্গলিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও সিংকিয়াং চীনের এই চারিটি প্রদেশ তাহার রাষ্ট্রীক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার জন্য সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তৎপর হইয়াছেন। গত গ্রীষ্মকালে সম্পাদিত হার্বিন চুক্তি সম্বন্ধে তাঁহারা যে তথ্য উদ্ঘাটিত করেন তাহা আরও চমকপ্রদ। তাঁহারা বলেন, হার্বিন চুক্তির সর্ত অনুযায়ী এইরূপ সাব্যস্ত হইয়াছে যে, লিওনিং ও আন্তং নামক চীনের প্রদেশ দুইটিতে আপাততঃ উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী সংস্থাপন করিতে হইবে এবং পরে সুযোগ-সুবিধামত উক্ত প্রদেশদ্বয় যথারীতি উত্তর কোরিয়ার অঙ্গীভূত করা হইবে। মস্কো চুক্তির প্রচারিত সর্তাবলীর সহিত মার্কিণ ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যের বিশেষ কোন সামঞ্জস্য নাই এবং ... নয়, কারণ ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট যে সকল তথ্য উদ্ঘাটন ... সামরিক ধরণের এবং মস্কো চুক্তির ...

[illegible] লাভ হইবে এমন ধারণা করিবার কোনই হেতু নাই, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে গোপনীয় সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনাও সমধিক; তাহা যদি হইয়া থাকে, তবে সে চুক্তির শর্তাবলীর স্বরূপ প্রকাশিত হইবে সম্ভাবিত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্কট সময়ে; মার্কিণ ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সে সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রমাণ সমর্থিত নাও হইতে পারে এবং সামরিক বিচার-বিবেচনার দিক হইতে সে চুক্তির স্বরূপ যেমনটি হওয়া সম্ভব বলিয়া তাঁহাদের মনে হইয়াছে হয়তো তাহাই তাঁহারা কল্পনায় রূপায়িত করিয়াছেন। সে যাহাই হোক মস্কো চুক্তির শর্তাবলী যে আকারে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও বিচার বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। পারস্পরিক মৈত্রী চুক্তি হিসাবে তাহার কল্যাণ-আশীর্ব্বাদ যে উভয় পক্ষেরই লভ্য হইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক এবং বস্তুতঃ হইয়াছেও তাহাই; কিন্তু একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, উত্তমর্ণ পক্ষ হিসাবে ইহা সোভিয়েটকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধার অধিকার দান করিয়াছে। প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায়, ঋণ বাবদ অর্থ ব্যতীত আপাততঃ চীনের পিপলস্ রিপাব্লিকের হাতে সোভিয়েট গবর্ণমেন্টকে নগদ দক্ষিণা স্বরূপ কিছুই দিতে হইতেছে না; মাঞ্চুরিয়ান রেলওয়ে ও মাঞ্চুরিয়ায় অবস্থিত প্রাক্তন জাপানী কল-কারখানাসমূহ এবং দাইরেন ও পোর্ট আর্থারের অধিকার প্রদানের শর্ত বর্তমানে পবিত্র প্রতিশ্রুতি মাত্র এবং তাহার পালন আবার এমন একটি শর্তের উপর নির্ভরশীল যাহা কার্যে পরিণত হওয়া সম্বন্ধে সঠিকভাবে কোন সময় নিরূপণ করা অসম্ভব। বলাবাহুল্য, সে শর্তটি হইল জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদন সম্পর্কিত এবং তৎসম্পর্কে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিস্থিতি এমন জটিল যে, দূর ভবিষ্যতেও সে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা বর্তমানে দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং নগদ দক্ষিণা হিসাবে [illegible] বর্তমানে দেয় কেবলমাত্র ঋণ বাবদ অর্থ, [illegible] [illegible] যে, সে উক্ত অর্থ দ্বারা সোভিয়েটের [illegible]

হইতে রেলওয়ের সাজ-সরঞ্জাম ও কল-কারখানার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয় করিবে এবং ঋণ পরিশোধ করিবে চা এবং অন্যান্য কাঁচা মাল সরবরাহ করিয়া। স্পষ্টতঃই দেখা যায়, চীনের বিশাল ভূখণ্ড আপাততঃ সোভিয়েটের কাঁচা মাল উৎপাদনের ক্ষেত্র ও তৈয়ারী মাল বিক্রয়ের বাজারে পরিণত হইয়া রহিবে এবং চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে সোভিয়েট অর্থনীতি অন্ততঃ চুক্তির মেয়াদ কালের জন্য সর্বময় কর্তৃত্ব সম্ভোগ করিবে। এই সম্ভাবনা সম্মুখে রাখিয়াই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ কমিউনিষ্ট চীনকে সূচনা হইতেই মার্কিণ বিরোধী নীতি অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন এবং চীনের কমিউনিষ্ট কর্তৃপক্ষও উপর্যুপরি অনুষ্ঠিত মার্কিণ স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ দ্বারা এমন অবস্থা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার ফলে মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক কমিউনিষ্ট চীনের স্বীকৃতির প্রসঙ্গ পর্যন্ত উত্থাপিত হইবার অবকাশ দেখা দেয় নাই। চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে মার্কিণ প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত না করিলে সোভিয়েট স্বার্থকে যে প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন এবং সেই সচেতনতা হইতেই মার্কিণকে চীনের বাণিজ্যিক ক্ষেত্র হইতে যথাসম্ভব দূরে ঠেকাইয়া রাখিবার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি। অবশ্য সোভিয়েটের প্রত্যক্ষ পরিচালনা ও অর্থ সাহায্যের আনুকূল্যে চীন অতি সত্বর শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া উঠিবে ইহা সুনিশ্চিত এবং সোভিয়েট স্বার্থ তাহাকে সেইভাবেই গড়িয়া তুলিতে আগ্রহী; কিন্তু তৎসত্বেও চীনের উপর দীর্ঘদিনের জন্য সোভিয়েট অর্থনৈতিক প্রভাব যে কায়েম হইল সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চীনের আকাশে 'রক্ত-তারকা' এতদিন কাব্যের রূপক মাত্র ছিল, এইবারে তাহা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়া সমগ্র এশিয়ার আকাশে তাহার রক্তিম আলোকরশ্মি বিকীরণ করিবে। সে আলোকছটা কিসের আভাস আজ নিশ্চিত করিয়া তাহা কে বলিবে!

সোভিয়েট তুরস্ক বিরোধ

সম্প্রতি তুরস্কে কমিউনিষ্ট বিরোধী বিক্ষোভ সহসা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইযাছে : মাত্র দিন কযেক আগে প্রায দশ হাজার লোকের এক জনতা শোভাযাত্রা সহকাবে সমগ্র সহর পবিভ্রমণ করিযা আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালযের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং জন কয়েক কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন অধ্যাপকের পদত্যাগের জন্য দাবী জানায। বিশ্ববিদ্যালয কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ সে দাবী মানিযা লইতে বাধ্য হন এবং সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকদের পদত্যাগ গৃহীত হইবার সংবাদ ঘোষিত হইলে, শোভাযাত্রীদল স্বস্থানে প্রস্থান করে। জড বিজ্ঞানের মতে প্রকৃতিব রাজ্যে আকস্মিকতার স্থান নাই, আপাতঃদৃষ্টিতে যাহা আকস্মিক রূপে প্রতিভাত হয়, তাহা কারণসলিলেব তলদেশে অলক্ষ্যে কার্যরূপে ক্রমবিকশিত হইযা উঠিতেছিল ; পূর্ণ বিকশিত আকারে যখন তাহা আমাদের দৃষ্টি গোচব হয, মাত্র সেই মুহূর্ত্তে আমরা তাহার আকস্মিক আবির্ভাব লক্ষ্য করি। প্রকৃতির রাজ্যেব মত রাজনীতিব ক্ষেত্রেও আকস্মিকতার অবকাশ নাই, সেখানে যাহা কিছু সংঘটিত হয, কার্যকরণ পবম্পরাবই তাহা অনিবার্য্য পরিণতি। সুস্থ মানব দেহে যদি সহসা কোথাও বিস্ফোটক উদ্গত হয, বুঝিতে হইবে সচ্ছন্দ শোণিত-প্রবাহ অবশ্যই কোথাও বিঘ্নিত ও বিষাক্ত হইযাছিল। এই জাতীয বাজনৈতিক বিক্ষোভও রাষ্ট্রদেহে সহসা উদ্গত বিস্ফোটকের মতই তাহা যখন আত্মপ্রকাশ করে, ধাবযা হইতে হইবে—রাষ্ট্রীক সম্পর্কের সহজ ও সচ্ছন্দ ধারা ব্যাহত ও বিষাক্ত হওযার ফলেই তাহার উদ্গম সম্ভব হইয়াছে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে তুরস্কের এই কমিউনিষ্ট বিরোধী বিক্ষোভকেও আকস্মিক দৈব-দুর্ঘটনা রূপে গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। বস্তুতঃ এ বিক্ষোভ কমিউনিষ্ট বিরোধী নয় সোভিয়েট

বিরোধী ; পদার্থের সহিত প্রতীকের যে সম্পর্ক তাহাই এবং পদার্থ ও প্রতীকের মধ্যে পার্থক্য নির্দ্ধারণ সর্ব্বক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তুর্কী জনতা যখন সাম্যবাদী অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছিল, তখন তাহাদের মনশ্চক্ষু কিন্তু লক্ষ্য করিতেছিল সোভিয়েটকে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নিঃসংশয়ে ধরিয়া লইতে পারা যায়, সোভিয়েট তুরস্কের রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের সহজ ও সচ্ছন্দ ধারা নিশ্চয়ই কোথাও বাধাগ্রস্ত বিষাক্ত হইয়াছে—যাহার ফলে রাষ্ট্র-দেহে বিক্ষোভরূপ বিস্ফোটকের উদ্ভব।

এই সঙ্গে রুশ-তুরস্ক সম্পর্কে ক্রম-বিবর্তনের ধারা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তুরস্ক ও সোভিয়েটের মধ্যে নিরপেক্ষতা ও বন্ধুত্বের নীতিতে চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৯২৫ সালে। তখন হইতে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত সে সম্পর্কের সহজ ও সচ্ছন্দ ধারা বিশেষ কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্কটকালে সে স্রোত ব্যাহত হয় সর্বপ্রথম এবং তাহার ফলে কৃষ্ণসাগরীয়-প্রণালি বক্ষে আবর্ত্ত ঘূর্ণিত হইয়া উঠে। ১৯৩৬ সালের মণ্ট্রোকন্‌ভেনসন অনুযায়ী কৃষ্ণসাগরীয়-প্রণালি সমূহের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্পিপত হয় তুরস্কের হাতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত তুরস্ক তাহার নিরপেক্ষতা সোভিয়েট স্বার্থের প্রতিকূলতা করিয়াছিল ঠিক সেই পরিমাণে, যে অনুপাতে চক্রশক্তিকে তাহা আনুকূল্য দান করিয়াছিল। তুর্কী কর্তৃত্বের সুযোগ লইয়া জার্মান ও ইতালীয় যুদ্ধ জাহাজ দার্দেনেলিশ প্রণালির ভিতর দিয়া কৃষ্ণসাগরে যথেচ্ছ যাওয়া-আসা করিয়াছে এবং শত্রুপক্ষের অবাধ গতিবিধি সোভিয়েট স্বার্থের পক্ষে অতিমাত্রায় ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়া তাহা নিবারণ করিতে পারে নাই ; কারণ মন্ট্রো কন্‌ভেনসন অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিকতার পথ যখন তাহার পক্ষে রুদ্ধ, তখন তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইলে সামরিক ব্যবস্থাই তাহার পক্ষে একমাত্র গ্রহণযোগ্য বিধান। কিন্তু তাহা করিতে গেলে কেবল যে

আর একটি প্রবল প্রতিপক্ষই সৃষ্টি করা হইবে তাহা নয় : মিত্র পক্ষীয় মৈত্রীবন্ধন পর্য্যন্ত শিথিল হইয়া যাওয়া সম্ভব। তাই অবস্থা বিপাকে পড়িয়া সোভিয়েট সে ক্ষতি চোখ-কান বুঝিয়া সাময়িকভাবে সহ্য করিয়া লয়। তথাপি সমর কালীন সঙ্কট সময়ে সোভিয়েট কর্ত্তৃক এ প্রশ্ন পট্সডাম সম্মেলনে উত্থাপিত হয় এবং চতুঃশক্তি সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপণীত হন যে, যুদ্ধান্তে মন্ট্রো কন্‌ভেনসন পুনর্বিবেচিত হইবে। পরে বার্লিন সম্মেলনে সে সিদ্ধান্ত পুনরায় সমর্থিত হয়। ১৯৪৫ সালের ১১ই আগষ্ট তারিখে আঙ্কারায় এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রচারিত হয় যে, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট নাকি মন্ট্রো কন্‌ভেনসন পুনর্বিচরের পক্ষে দাবী জানাইযাছেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত ১৩ই আগষ্ট তারিখে তুর্কী গভর্ণমেণ্টের হস্তে এ সম্পর্কে যে নোট প্রদান করেন, তাহা মস্কো পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ৮ই আগষ্ট। মন্ট্রো কন্‌ভেনসন পুনর্বিবেচিত হইবার স্বপক্ষে নোটের মুখবন্ধে যে যুক্তি প্রদর্শিত হয়, নিম্নে তাহা অংশত উদ্ধৃত হইল।

"যুদ্ধকালীন ঘটনাবলির দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে, ১৯৩৬ সালে সম্পাদিত মন্ট্রো চুক্তি অনুযায়ী কৃষ্ণ সাগরীয় প্রণালি সমূহের জন্য যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় তাহা কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী শক্তিসমূহের স্বার্থ রক্ষায সক্ষম হয় নাই অথবা শত্রুপক্ষীয় শক্তিগণকে তাহা ব্যবহার করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিতে সমর্থ হয় নাই।" এই যুক্তির অনুকূলে চক্রশক্তির জাহাজসমূহের অবাধ গতি-বিধির বহুতর দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়।

অতঃপর সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নোটে নিম্নলিখিত নীতির ভিত্তিতে নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন : (১) সকল দেশের বাণিজ্য জাহাজের চলাচলের জন্য প্রণালি-পথ সর্ব্বসময় উন্মুক্ত থাকিবে ; (২) কৃষ্ণ সাগরীয় তীরবর্তী শক্তিসমূহের যুদ্ধ জাহাজের অবাধ গতিবিধির জন্য প্রণালি সর্ব্বদা খোলা থাকিবে, (৩) কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী নয়—

এমন কোন শক্তির যুদ্ধ জাহাজকে বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে প্রণালি-পথ ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না; (৪) কৃষ্ণ সাগরে প্রবেশ করিবার ও তথা হইতে বাহির হইবার একমাত্র পথ হিসাবে প্রণালির শাসন-কর্তৃত্ব ন্যস্ত হইবে তুরস্ক ও কৃষ্ণসাগর তীরবর্তী অন্যান্য শক্তিবর্গের হাতে; (৫) তুরস্ক ও সোভিয়েট ইউনিয়নই একমাত্র স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ—যাহারা বাণিজ্য জাহাজ সমূহের গতিবিধির স্বাধীনতা ও প্রণালির নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সক্ষম; সুতরাং তাহারা মিলিতভাবে প্রণালির উপর এমন শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে যাহার ফলে কৃষ্ণ সাগরীয় শক্তি সমূহের স্বার্থের প্রতিকূল কোন উদ্দেশ্যে অপর কোন রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা ব্যবহার করা সম্ভব হইবে না।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তুর্কী রাষ্ট্রদূতের হাতে উল্লিখিত নোট প্রদান করিবার সঙ্গে সঙ্গে বৃটেন ও মার্কিনের নিকট তাহার প্রতিলিপি প্রেরণ করিলেন। সোভিয়েট নোট তুরস্কের সরকারী কর্তৃপক্ষ মহলে দারুণ উদ্বেগের সঞ্চার করিল; প্রণালির উপর নূতন শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্পর্কীয় সোভিয়েট দাবী স্বীকার করিয়া লওয়ার অর্থ যে সোভিয়েটকে তুরস্কের মাটিতে ঘাঁটি নির্মান করিবার ও সৈন্যদল স্থাপন করিবার অধিকার দান করা একথা বুঝিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। সোভিয়েটকে তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তুর্কী সরকার তাঁহাদের বৈদেশিক নীতির ঘোষণা প্রসঙ্গে পুনরায় বলিলেন, তুরস্কের পররাষ্ট্র নীতি কোনক্রমেই সোভিয়েট স্বার্থের প্রতিকূল হইবে না এবং সোভিয়েটের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব যাহাতে সর্বদা রক্ষিত হয়—তৎপ্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখা হইবে। অতঃপর সোভিয়েটের সহিত পারস্পরিক বন্ধুত্বের চুক্তি পুনঃ সম্পাদনের জন্য যত্নবান হইলেন, কিন্তু সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সে সম্পর্কে কোনরূপ আগ্রহ পরিলক্ষিত না হওয়ায় সে চেষ্টা পরিত্যক্ত হইল। তখন তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট চাহিলেন

এক নূতন চুক্তি সম্পাদন করিতে, কিন্তু সে প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইব,—কারণ প্রত্যুত্তরে সোভিয়েট সরকার অনুরূপ কোন বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের আভাস দেওয়া দূরে থাক, তুরস্কের বিরুদ্ধে সোভিয়েট বিদ্বেষের অভিযোগ আনয়ন করিলেন।

আপোষ-আলোচনার দ্বারা বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত হইবার সকল পথ রুদ্ধ দেখিয়া তুরস্ক গভর্ণমেণ্ট অবশেষে আত্মরক্ষার প্রতি মনোযোগী হইলেন। ১৯৪০ সাল হইতে দার্দেনেলিশ অঞ্চলে যে 'সামরিক আইন প্রবর্ত্তিত' ছিল, তুরস্ক গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৭ সালের ২৮শে মে তারিখে প্রথমেই তাহার মেয়াদ ছয় মাসের জন্য বর্দ্ধিত করিলেন—এই যুক্তিতে যে, কোন এক বৈদেশিক শক্তি যখন প্রণালি সম্বন্ধে এমন দাবী উত্থাপন করিয়াছেন —যদ্বারা তুরস্কের সার্ব্বভৌম মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা বিদ্যমান, সেই কারণে যে অঞ্চল পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগর, মধ্যপ্রাচ্য ও নিকট প্রাচ্যের নিরাপত্তার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তুরস্ক গভর্ণমেণ্ট সেখানে আত্মরক্ষা-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য। বলা বাহুল্য, সে ব্যবস্থা সামরিক ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা যতই সুনিশ্চিত হইয়া উঠিতেছে, ইউরোপের মানচিত্রে দার্দেনেলিস প্রণালির পয়ঃপ্রবাহ ততই প্রবলতর বেগে আহত ও আবর্ত্তিত হইয়া উঠিতেছে। ইউরোপীয় শক্তি সমূহের পরস্পর বিরোধী স্বার্থ সংঘাতে যে ঝড় উত্থিত হইতেছে, কৃষ্ণসাগরীয় তীরবর্ত্তী অঞ্চল নিঃসন্দেহে তাহার অন্যতম ঝটিকা কেন্দ্র।

রুশ-পারস্য বিরোধ

সম্প্রতি পারস্যে সোভিয়েট বিরোধী মনোভাব প্রবল ভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। পারস্যে ইহার উদ্ভব ইব্রাহিম হাকিমির প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ ব্যাপারকে উপলক্ষ করিয়া। হাকিমি ইঙ্গ-মার্কিণ চক্রের অন্তর্ভুক্ত লোক রূপে চিহ্নিত; তাহা ছাড়া সোভিয়েট-বিরোধী মনোভাবের জন্য তিনি চিরপরিচিত। ১৯১৯ সালে ইরাণ যখন কায়েকশাসের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল পারস্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী উত্থাপন করে, পারস্য মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য রূপে মিঃ হাকিমি সে দাবী সমর্থন করিয়াছিলেন এবং ১৯৪৫ সালে পারস্যের প্রধান মন্ত্রীরূপে সোভিয়েট-পারস্য সম্পর্কে তিক্ততা আনয়ন করেন তিনিই। এই সকল কারণে প্রধান মন্ত্রী পদে মিঃ হাকিমির নিয়োগ দ্বারা পারস্য সরকারের সোভিয়েট বিরোধী মনোভাবই সূচিত হয় বলিয়া সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের ধারণা এবং সে ধারণার অনুকূলে অন্য ঘটনারও অবদান রহিয়াছে। পারস্য-মার্কিণ সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে গত ৬ই অক্টোবর তারিখে। এই চুক্তি সম্পাদনের সংবাদ অবশ্য এখনও সাধারণে প্রকাশ নয়, সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জকে এ সম্পর্কে অবগত করাইবার পর সে খবর পারস্যের জনসাধারণের গোচর করা হইবে। তথাপি চুক্তি সম্পাদনের অপরিহার্য্য ফল যাহা হইবে তাহা পূর্ব্বাহ্নে অনুমান করিয়া লওয়া কষ্টসাধ্য নয়; সংবাদটী সাধারণে প্রকাশিত হইবার অব্যহিত পূরেই মার্কিণ হইতে এক সামরিক মিশন পারস্যে প্রেরিত হইবে এবং তাঁহাদের প্রত্যক্ষ পরিদর্শনে ও সক্রিয় সহযোগিতায় ইরাণের সৈন্যবাহিনী আধুনিকতম অস্ত্র সজ্জায় ও সামরিক শিক্ষায় দ্রুত পুনর্গঠিত হইয়া উঠিবে। তেহারাণস্থ সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতে পারস্য গভর্ণমেণ্টের ইঙ্গ-মার্কিণ অভিমুখীনতা লক্ষ্য

করিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন, তাহাকে নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে পরিচালিত করিবার জন্ত মিঃ হাকিমির প্রধান মন্ত্রীর আসনে সমাসীন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাই তেহারাণস্থ সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মিঃ হাকিমির নিয়োগ-বার্তা বিদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বিমানে আরূঢ় হইয়া তেহারাণ ত্যাগ করিয়া মস্কো অভিমুখে উড্ডীন হইয়াছেন। এই ঘটনার উপর মন্তব্য করিতে গিয়া কোন একটী ফরাসী পত্রিকা এমনও আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, হয়তো ইহাব ফলে পারস্য সোভিয়েট কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হইতে পারে।

সোভিয়েট-পারস্য মনোমালিন্যের ইহা বাহ্য ও আপাততঃ হেতু, তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে অন্যত্র। ধর্ম্মের তত্ত্ব যেমন গুহায় নিহিত থাকে, রুশ-ইরাণ সম্পর্কের কূটনৈতিক তত্ত্ব তেমনি নিহিত আছে তৈল-খণির গর্ভে। বস্তুতঃ তৈলই রুশ-ইরাণ সম্পর্কের গোড়ার কথা। ইহা শুধু এই ক্ষেত্রেই নয়; পৃথিবীর সর্বত্র এবং সর্বকালে তৈলই প্রবল ও দুর্বলের মধ্যে সম্পর্ক নির্দ্ধারণের মাধ্যম; তাহার প্রাচুর্যে সম্পর্ক প্রীতির ও কার্পণ্যে কঠোর হয়: সম্পর্ক-শকটের চাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈল দান কর, তাহা সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে গড়াইতে থাকিবে; তৈল দান বন্ধ কর, অথবা তাহার পরিমাণ হ্রাস কর, চাকায় একদিকে তর্জন-গর্জন ও অপরদিকে অনুযোগ-অভিযোগের বিচিত্র কলরব বাজিয়া উঠিবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করিয়া দিল যে, লৌহ আধুনিক যুদ্ধের স্নায়ু এবং তৈল তাহার শোণিত। যুদ্ধকালীন সময়ে নিয়মিতভাবে ও পর্যাপ্ত পরিমাণ শোণিত সরবরাহ লাভের উদ্দেশ্যে সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট পারস্য সরকারের নিকট তৈল-চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব প্রেরণ করেন। ইরাণের প্রধানমন্ত্রীরূপে সৈয়দ মহম্মদ তাহার উত্তরে সোভিয়েট গভর্ণমেন্টকে জানাইয়া দেন যে, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উত্তর পারস্যের তৈলখনি সম্বন্ধে কোনরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া পারস্য সরকারের ইচ্ছা

নয় ; তাহা ছাড়া, বৈদেশিক সৈন্তবাহিনী যতক্ষণ পারস্তের রাজ্যসীমায় অবস্থান করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনরূপ চুক্তি যদি সম্পাদিত হয়ও তাহা হইলে পারস্তের জনসাধারণ ধারণা করিবে, সে চুক্তি উভয় পক্ষের স্বেচ্ছা-সম্মত নয়, প্রবল পক্ষীয় সেনাদলের উপস্থিতির চাপে দুর্বল পক্ষ চুক্তি সম্পাদানে বাধ্য হইয়াছে, সেরূপ চুক্তি স্থায়ী ও সুফলপ্রদ হইবে না। তৈল-চুক্তি সম্পর্কীয় আলাপ-আলোচনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল সোভিয়েট বৈদেশিক দপ্তরের ভাইস কমিশনারের উপর ; প্রত্যাখানের দরুণ অতিমাত্রায় রুষ্ট হইয়া তিনি সৈয়দ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার আরম্ভ করিলেন। মহম্মদ সৈয়দের সোভিয়েট-বিরোধী কার্য-কলাপের দীর্ঘতালিকা উদ্ধৃত করিয়া সোভিয়েট রেডিও সৈয়দ গবর্ণমেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য ইরাণী ভাষায় ইরাণের জনসাধারণের নিকট আবেদন প্রচার করিতে লাগিল। এদিকে আলাপ আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে দেখিয়া সোভিয়েট কমিশনার তেহারাণ ত্যাগ করিয়া মস্কো যাত্রা করিলেন। সমরকালীন সঙ্কট মুহূর্তে সোভিয়েটের বিরাগ অর্জন বিপজ্জনক বোধ করিয়া মহম্মদ সৈয়দ পদত্যাগ করিলেন ; সৈয়দ মন্ত্রিসভার পতন ঘটিল এবং তৎস্থলে গঠিত হইল নূতন মন্ত্রি পরিষদ। অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি সম্ভাবনা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে মজলিশ এই মর্মে এক আইন বিধিবদ্ধ করিলেন যে, অতঃপর কোন মন্ত্রী অথবা প্রধান মন্ত্রী তৈল-চুক্তি সম্পর্কে অপর কোন জাতির সরকারী অথবা বেসরকারীপ্রতিনিধির সহিত কোনওরূপ আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। সমস্তার সমাধানের নিমিত্ত মহম্মদ বায়াৎ এই মর্মে এক আপোষ প্রস্তাব করিলেন যে, যথারীতি চুক্তি সম্পাদন না করিয়া উত্তর ইরাণের তৈল বিক্রয় ব্যবস্থার ভিত্তিতে নূতন করিয়া আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করা হোক। কিন্তু সে প্রস্তাব সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের মনঃপূত হইল না। এদিকে সোভিয়েট প্রভাবের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া গর্জিয়া

প্রদেশে উপজাতীয় অভ্যুত্থান আরম্ভ হইয়া গেল। কুর্দীস্থান ও আজার-বাইজান প্রদেশের সেপারেটিষ্ট দল সেই সুযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। কমিউনিষ্ট প্রভাবিত তুদে পার্টি সেই অবকাশে উত্তর পারস্যের ইঙ্গ-ইরানিয়ান তৈলক্ষেত্রে শ্রমিক বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট হইল এবং তাহার ফলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিয়া কার্য্য-বিরত হইল। ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের দাবী অবিলম্বে মানিয়া লইবার প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইলে ধর্ম্মঘটের অবসান ঘটিল বটে, কিন্তু উপজাতীয় অভ্যুত্থান ও সেপাবেটিষ্ট আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত হইলনা। পারস্য সরকার তখন বাধ্য হইয়া বিদ্রোহ দমনের জন্য উপদ্রুত অঞ্চলে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ কবিলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর বিদ্রোহ দমিত হইল, আজারবাইজান সেপারেটিষ্ট দলেব নেতা রাশিযায পলায়ন কবিলেন এবং কুর্দীস্থানের তুক্ত দলীয় নেতা আত্মসমর্পণ কবিলেন। পারস্যের আভ্যন্তরীন শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর তখন পর্যন্ত পারস্য পবিত্যাগেব কোন লক্ষণ দেখা গেল না। পারস্য সরকার একহাতে তুদে দলের নিধন সাধনে ব্যাপৃত হইলেন এবং অপর হস্তে সোভিযেট বাহিনীর পারস্য সীমায় অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে আবেদন পেশ করিলেন। পারস্য সরকার সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের তুষ্টি বিধানের জন্য আজারবাইজানে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন করিলেন। এতদিনে তৈল-চুক্তি সম্বন্ধীয ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার সর্ব্বশেষ প্রচেষ্টা সফল হইল: উত্তর পারস্যের তৈলখনি অঞ্চলের জন্য সোভিয়েট-ইরাণ যুক্ত কোম্পানী গঠিত হইল, সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট রেলওয়ে লাইন পারস্য গভর্ণমেন্টের হাতে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং তৈল-চুক্তিকে কেন্দ্র করিয়া সোভিয়েট-পারস্য বিরোধের জটিল সমস্যার এতদিনে একটা সাময়িক সমাধান সম্ভব হইতে দেখিয়া সোভিয়েটবাহিনী পারস্য পরিত্যাগ করিল।

আজ আবার আসন্ন তৃতীয় মহাযুদ্ধের উপকণ্ঠে আসিয়া অতীতের অমীমাংসিত ও অর্দ্ধ-মীমাংসিত সমস্যা সমূহ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে উদ্যত হইয়াছে। একদিকে স্পষ্টতঃ সোভিয়েট-বিরোধী মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তির প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হওয়া এবং অপর দিকে পারস্য সামরিক চুক্তি সম্পাদন সোভিয়েটকে পারস্য সম্বন্ধে পুনরায় সজাগ করিয়া তুলিয়াছে। সমগ্র মধ্য প্রাচ্যে আজ যে অশান্তির আগুন ধূমায়িত হইতেছে, কে জানে তৃতীয় মহাযুদ্ধের দাবানলরূপে তাহাই জ্বলিয়া উঠিবে কি না, কে জানে—তাহার শিখা উত্তর পারস্যের তৈল ক্ষেত্র স্পর্শ করিয়া বিপুল বহ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি করিবে কি না!

কোমিন ফর্মের জন্মকথা

ইউরোপের নয়টি দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সমবায়ে নূতন একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমেনিয়া, হাঙ্গারী, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জেকোশ্লোভাকিয়া-সোভিয়েট-রাশিয়া ও ইতালীয় কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিগণ গত সেপ্টেম্বর মাসে ওয়ার্সতে যে গোপন সম্মেলনে মিলিত হন, তাহাতেই এই নূতন প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং নয়টি দেশের রাজধানী হইতে তাহা গঠিত হইবার গুরুত্বপূর্ণ বার্তা যুগপৎ ঘোষিত হয় গত ৫ই অক্টোবর তারিখে। সরকারীভাবে এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হইয়াছে 'ইনফর্মেশন বুরো,' সংক্ষেপতঃ ইহা কোমিনফর্ম, কোমিণ্টার্ণ নয়। ওয়ার্স সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের কার্য হইবে, বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিসমূহের মধ্যে ভাব ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজন হইলে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে তাহাদের কর্মতৎপরতা সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ করা। রাশিয়া

ভিন্ন অন্যান্য দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির দুর্বল মনোভাব ও দ্বিধাগ্রস্ত র্মতৎপরতা ওয়ার্স প্রস্তাবে অতিশয় তীব্র ভাষায় সমালোচিত হইয়াছে। মালোচনা-প্রসঙ্গে বলা হয়, পৃথিবী বর্তমানে স্পষ্টতঃ দুইটি বিরোধী শিবিরে পরিণত হইয়াছে। একটি সাম্রাজ্যবাদী এবং অপরটি াম্রাজ্যবাদ বিরোধী; এরূপ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে ইলে ইউরোপের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির কর্তব্য, এ ব্যাপারে অগ্রণী হইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া; কিন্তু কার্যতঃ দেখা যাইতেছে, কমিউনিষ্ট পার্টিসমূহ আপনাদের শক্তি সম্বন্ধে যে পরিমাণে সন্দিগ্ধ, শত্রুপক্ষের সামর্থ্য সম্পর্কে কৃতনিশ্চয় ঠিক সেই অনুপাতে; ফলে তাহারা শঙ্কিত দ্বিধাগ্রস্ত ও দুর্বল। তদুপরি পার্টিগুলির মধ্যে কোনরূপ সংহতি বা সঙ্ঘবোধ না থাকা হেতু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কোন বলিষ্ঠ সাধারণ কর্মপন্থা গ্রহণ ও অনুসরণ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। এই কারণে প্রস্তাবে কমিউনিষ্ট পার্টিসমূহকে আহ্বান করা হইয়াছে তাহাদের স্ব স্ব দেশের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এরূপ প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে যে, কোনরূপ আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ ও অনুসরণ করা কার্য্যতঃ তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্টগুলির সহিত সেই সেই দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সাম্প্রতিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করিলে ওয়ার্স-প্রস্তাবকৃত সমালোচনার সত্যতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইবে। যুদ্ধ পরবর্তী যুগে এই সেদিন পর্যন্ত ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি আপন আপন দেশের জাতীয় শ্রমিক অথবা সমাজতান্ত্রিক সরকারের সহিত সব বিষয়ে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। ইহা অবশ্য তাহাদের যুদ্ধকালীন সংস্কার ও ঐতিহ্যের ধারা। দ্বিতীয় মহাসংগ্রামের সঙ্কটকালে প্রাক্তন তৃতীয় আন্তর্জাতিক তথা সোভিয়েট রাশিয়া ফ্যাসীবাদ ও

নাৎসীবাদ দমনের অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্যের অজুহাতে কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিকে তাহাদের দেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত সর্তহীন সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করিবার যে নির্দেশ দান করেন, যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পরেও তাহা পরম বিশ্বস্ততার সহিত অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে। সেই নীতির অনুসরণক্রমেই তাহারা বিভিন্ন দেশে কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য উদ্যোগী হইযাছে ; কোথাও বা সে প্রচেষ্টা সফল হইয়াছে। কোথাও বা প্রস্তাবিত অংশীদারগণের পক্ষ হইতে আসিযাছে সরাসরি প্রত্যাখ্যান। এমন কি, কোন কোন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি আপনাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অপ্রযোজনীয় বোধে তদ্দেশীয় শ্রমিক অথবা সমাজতান্ত্রিক দলের মধ্যে আত্মবিলয় সাধন করিবার প্রস্তাব পর্যন্ত স্বতঃপ্রণোদিত হইযা উত্থাপন করে, কিন্তু অপর পক্ষ কর্তৃক সে প্রস্তাব সমাদৃত হয় নাই। বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টি এইরূপ প্রস্তাব লইযা ইংলণ্ডের শ্রমিক দলেব দরবারে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইয়াছে এবং প্রতিবার শ্রমিকদল সে আবেদন অবজ্ঞার সহিত অগ্রাহ্য করিয়াছে। পোল্যাণ্ড, হাঙ্গারী ও চেকোশ্লো-ভাকিয়াতেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। সেখানেও সমাজতান্ত্রিক দলের সহিত মিলিত হইবার পক্ষে কমিউনিষ্ট পার্টিব প্রস্তাব যে কেবলমাত্র প্রত্যাখ্যাতই হয় তাহা নয় ; তাহাদেব উপর্যুপবি আবেদন নিবেদনের চাপে বিব্রত হইয়া সমাজতান্ত্রিক দলের কার্যকরী সমিতি এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় যে, ভবিষ্যতে কেবল যে দলীয় মিলনের পক্ষে কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক উত্থাপিত কোন প্রস্তাবই বিবেচিত হইবে না তাহা নহেএমন কি, উভয় দলের পক্ষ হইতে অতঃপব কোনরূপ মিলিত ঘোষণা প্রচারিত হইবে না এবং উভয় দলীয সদস্যগণ কোন সাধারণ অধিবেশনে পর্যন্ত সম্মিলিত হইবেন না। এইরূপে দলীয় মিলন ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায মিলিত গভর্ণমেণ্ট গঠনের আশায় বহু স্থানে বিড়ম্বিত হইয়া কমিউনিষ্ট

পার্টিগুলি গতিপথে থমকিয়া দাঁড়াইল, পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া উপলব্ধি করিল, গন্তব্য পথ পরিহার করিয়া কোথা হইতে আসিয়া তাহারা কোথায় উপনীত হইয়াছে। ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ ও সর্তহীন সহযোগিতার আগ্রহের স্থলে জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল সমালোচনা ও সক্রিয় প্রতিরোধের কঠোর মনোভাব। পশ্চিম ইউরোপে ফরাসী, বেলজিয়াম ও ইতালীয় কমিউনিষ্ট পার্টি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা বর্জন করিয়া বাহির হইয়া আসিল ; ইংলণ্ডের শ্রমিকদল সম্পর্কে বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির মনোভাব সর্তাধীন সহযোগিতা হইতে সর্তহীন বিরুদ্ধ সমালোচনায় রূপান্তরিত হইল এবং পূর্বে ইউরোপে পোল্যাণ্ড চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গারীতে সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দলের মধ্যে সদ্ভাব ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির মধ্যে বিরূপ মনোভাব অতিদ্রুত বিস্তারলাভ করিতে লাগিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে একে একে ইউনিয়নে ও কারখানাসমূহে স্বতন্ত্র কমপন্থী অনুসরণের নির্দেশ প্রচারিত হইতে লাগিল এবং ট্রেড ইউনিয়নের দক্ষিণ পন্থী সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃবর্গ অভিহিত হইতে থাকিলেন একতার শত্রুরূপে। কমিউনিষ্ট পার্টিসমূহের আপোষ ও আত্মসমর্পণমূলক মনোভাব মোড় ফিরিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু পরস্পরেব মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী বিচ্ছেদ ও ব্যবধান হেতু তাহারা এরূপ বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল যে, বলিষ্ঠ নীতি আশ্রয় করিয়া কোন একটি সাধারণ পন্থা অনুসরণ করা তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহা ছাড়া রুশীয় প্রভাবমুক্ত এমন একটি প্রবল স্বাতন্ত্র্যবোধ তাহাদের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে যাহার ফলে তাহাদের মনে প্রতীতি জন্মাইয়াছে যে, বাহিরের কোন নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে স্ব স্ব জাতীয় ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ বিচরণের অধিকার তাহাদের অক্ষুণ্ণ। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ অতিশয় উৎকট আকারে আত্মপ্রকাশ করিল মার্শাল প্ল্যানকে উপলক্ষ্য করিয়া।

সোভিয়েট রাশিয়ার মতে মার্শাল প্ল্যান সমগ্র ইউরোপকে আত্মসাৎ করিবার জন্য আমেরিকার অর্থনৈতিক অক্টোপাশের ব্যাকুল বাহুজাল বিস্তার মাত্র; অথচ রুশ অভিমত এ হেন অনিষ্টকর পরিকল্পনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে গিয়া কমিউনিষ্ট পার্টিসমূহ দ্বিধায় ও সংশয়ে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। ইতালীয় কমিউনিষ্ট পার্টি মার্শাল প্ল্যান অনুমোদন করিল এবং চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের কমিউনিষ্ট দল স্পষ্টতঃ তাহা অনুমোদন না করিলেও তাঁহাদের আপন আপন দেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনার প্রথম অধিবেশনে তাহারা অন্ততঃ বিরোধিতা করে নাই। ইউরোপের আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত কমিউনিষ্ট পার্টিসমূহের মতিগতি ও মনোভাব লক্ষ্য করিযা সোভিয়েট রাশিয়ার এই সবপ্রথম চমক ভাঙ্গিল। পূর্ব ইউরোপ সম্বন্ধে সে আদৌ উদ্বিগ্ন নয়, কারণ তাহা তাহার প্রভাবেব পরিধির অন্তর্গত; তাহার দুশ্চিন্তা পশ্চিম ইউরোপ, বিশেষ করিযা ফ্রান্স ও ইতালীর কমিউনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে, কারণ সমগ্র ইউরোপে এই দুইটি দলই সর্বাপেক্ষা অধিক সুগঠিত, শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। এদিকে বৃহৎ শক্তি চতুষ্টযের আগামী নবেম্বর অধিবেশন আসন্ন-প্রায। এই অধিবেশনের সাফল্যের উপব সোভিয়েট-রাশিয়াব নূতন করিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ সম্পর্ক নির্ধারণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। সম্মেলনেব উদ্দেশ্য যদি ব্যর্থ হয, রাশিয়া ইউরোপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। অতএব পূবাহ্নেই সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং সেই প্রযোজনের অনুবোধেই 'কোমিনফর্মের' উদ্ভব।

এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠান সোভিয়েট রাশিযা কর্তৃক যে কোন আখ্যায় অভিহিত হোক না কেন, বিশ্ববাসীর বিচারে ইহা পুনর্জাত তৃতীয় আন্তর্জাতিক ছাড়া আর কিছু নয়। মঃ ষ্ট্যালিন ও প্রাভদা হইতে আরম্ভ করিয়া সোভিয়েটের বহু দায়িত্বশীল মুখপাত্র ও মুখপত্র অবশ্য এই আখ্যার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, প্রাক্তন

কোমিণ্টার্ণ যে হিসাবে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ছিল, বর্তমান 'কোমিনফর্ম' তদনুযায়ী কোন ক্রমেই কমিউনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশনালরূপে অভিহিত হইতে পারে না। কোমিণ্টার্ণের কর্তব্য ছিল, বিশ্বের বিভিন্ন কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিরূপে একটি সাধারণ মঞ্চে সম্মিলিত করা এবং পার্টির অভ্যন্তর হইতে নূতন শক্তিশালী নেতৃত্ব গড়িয়া তোলা। কোমিণ্টার্ণ সে ঐতিহাসিক দায়িত্ব সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত করিয়াছে; কাজেই বর্তমানে তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রচেষ্টা কালের ঘড়ির কাঁটাকে কয়েকঘর পিছাইয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ঐতিহাসিক দায়িত্বের যে সংজ্ঞা সোভিয়েট কতৃপক্ষ আজ দিতেছেন তাহা অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট ও আবছা। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে পূর্ব, দক্ষিণ ও মধ্য ইউরোপের বহু ধনতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বিপর্যস্ত হইয়াছে, ইউরোপের সর্ব বৃহৎ রাষ্ট্রে শ্রমিক দলীয় শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের উত্তাল তরঙ্গ সপ্ত সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানসমূহকে নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষায় আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে। এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের জন্ম। শ্রমিক সমাজকে তাহার শ্রেণীগত স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া নবগঠিত এক শক্তিশালী বৈপ্লবিক নেতৃত্বের অধীনে লইয়া আসা অবশ্যই তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ঐতিহাসিক দায়িত্বের অন্যতম ছিল; কিন্তু তাহাই লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যে উপনীত হইবার উপায় মাত্র। রুশ বিপ্লবের বহ্নিকুণ্ডে বর্তিকা ধরাইয়া পৃথিবীর দেশে দেশে ও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে জ্বলন্ত স্পর্শ ছোঁয়ান এবং পৃথিবীময় বিপ্লবের বহ্নিবলয় রচনা করিয়া বিশ্ব বিপ্লব সার্থক করাই ছিল তাহার একমাত্র লক্ষ্য। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই তৃতীয় আন্তর্জাতিক এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছিল; এই আদর্শ অধিগত করিবার উদ্দেশ্যেই লেলিনের বলিষ্ঠ ও বৈপ্লবিক নেতৃত্বাধীনে বিশ্বের দিকে দিকে সুরু হইয়াছিল তাহার

বিজয় অভিযান, তখনও রাশিয়ার অর্থপূর্ণ সমাজবিপ্লব বিশ্ব বিপ্লবের মাঝখানে আপন সার্থকতার সন্ধান করিতেছিল। কিন্তু লেলিন লোকান্তরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ষ্ট্যালিন এই দুইটি অভিন্ন ও অভিভাজ্য ঐতিহাসিক ঘটনাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা দান করিলেন; তদবধি রুশ বিপ্লবের ভগ্ন শাখা বিশ্ববিপ্লবের বিরাট বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, রুশ বিপ্লবের ইতিহাস পরিণত হইল বিশ্ব বিপ্লবের বিরাট গ্রন্থের এক প্রক্ষিপ্ত অধ্যায়ে। এইরূপে কোমিণ্টার্ণের কর্তব্য এক নব কলেবর লাভ করিল। এতদিন তাহার দায়িত্ব ছিল বিশ্ব বিপ্লবের আয়োজন সম্পন্ন করিয়া তাহার সঙ্ঘটন সার্থক করা; এখন হইতে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করা হইল তাহার পবিত্রতম কর্তব্য। দেখিতে দেখিতে আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান রূপান্তরিত হইল সোভিয়েট রুশের বৈদেশিক নীতির বাধ্যতম বাহনে; রুশ ভল্লুকের লাঙ্গুলাগ্রভাগরূপে তাহা আন্দোলিত ও নিরস্ত হইতে লাগিল, নত ও উন্নত হইতে থাকিল মূল দেহের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রাধীনে। তৃতীয় আন্তর্জাতিক এই রূপে বিশ্ব রাজনীতির বিপুলতর অঙ্গন হইতে বিদায় লইয়া রুশীয় স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গৃহকোণে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সোভিয়েট রুশকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার যে পবিত্র দায়িত্ব সে একদা অশুভক্ষণে আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিল, তাহারই পরিপূর্ণ উদ্‌যাপনকল্পে সে আত্মবিলয় সাধন করিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্কটকালে। সোভিয়েট রাশিয়া আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের বিলয় মূল্যে নাৎসীবাদ-নিধনের অনুকূলে ইঙ্গ-মার্কিণ সহযোগিতা অর্জন করিল।

'কোমিনফর্ম' গঠনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার এবং বিশ্লেষণ করিতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদ বিধ্বংসী শক্তিরূপে শ্রমিক বিপ্লব বর্জিত হইয়াছে বহু পূর্বে এবং তৎপরিবর্তে এক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অন্য সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতা অর্জন নীতিরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাসংগ্রাম সমাপ্ত হইবার সঙ্গে

সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রগুলি ইঙ্গ-মার্কিণ নায়কতায় তাহাদের সাধারণ শত্রু সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইতেছে—এ ঘটনা সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু সে আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে সহযোগিতা লাভের জন্য আজ তাঁহারা দ্বারস্থ হইবেন কাহার? জাপান ও জার্মাণী বিশ্বের রাজনৈতিক মঞ্চ হইতে অন্তর্হিত হইবার ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহের শ্রেণী যে পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়াছে, তাহাদের সন্নিবদ্ধতা ঘনতর হইয়াছে ঠিক তদনুপাতে কাজেই কূটনীতির সাহায্যে ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসীর ঐক্য বন্ধনের মাঝখানে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস বর্তমানে বিড়ম্বনা মাত্র। বিশ্বের দুইটি বিরোধী আদর্শ আজ জীবন মরণ সংগ্রামে সংঘাতশীল; এ যুদ্ধে জয়লাভের অর্থ জীবন, পরাজয়ের অর্থ মৃত্যু এ কথা তাহারা নির্ভুলভাবেই বুঝিয়াছে। সুতরাং সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে আসন্ন দুর্দিনে সে দিক হইতে সাহায্য লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই। আর আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের কথা, তাহার অস্তিত্ব কর্মনাশা জলে বহু পূর্বেই বিসর্জিত হইয়াছে। ষ্ট্যালিন আজ স্বহস্তে কর্তিত 'ইঞ্চকেপ রকের ঘণ্টা ধ্বনি 'কর্মনাশার গভীর অতলে নিনাদিত হইতে শুনিতেছেন, কিন্তু নিরুপায়। সে নিমজ্জন পুনরুদ্ধারের সর্ব সম্ভাবনা বিরহিত। অথচ আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতেই হইবে; সেই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়াই সোভিয়েট আজ 'কোমিনফর্ম' গঠনে উদ্যোগী। ইহা আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শ্রমিকের বিশ্ব সঙ্ঘ নয়; সঙ্কীর্ণ ইহার পরিধি, সংক্ষিপ্ত ইহার গঠন। যে নয়টি দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সমবায়ে 'কোমিনফর্ম' গঠিত তাহাদের মধ্যে সাতটি পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েট প্রভাবের পরিধির অন্তর্গত এবং অবশিষ্ট দুইটি অবস্থিত পশ্চিম ইউরোপে। প্রথম সাতটি আস্তৃত রহিবে সোভিয়েট রাশিয়ার আত্মরক্ষার বহির্ব্যূহরূপে এবং বাকী দুইটি অর্থাৎ ফ্রান্স ও ইতালীয় দল শত্রু শিবিরের অভ্যন্তরে কীলকরূপে প্রবিষ্ট রহিবে; এই উদ্দেশ্যেই এই দুইটি কমিউনিষ্ট পার্টির জন্য নূতন

প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে বিশিষ্ট স্থান রচনা করা হইয়াছে। বিশ্বের একমাত্র শ্রমিক রাষ্ট্র আজ ভাগ্য বিড়ম্বনায ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক বিপ্লবের আহ্বান দিবার নৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত; কাজেই আত্মরক্ষার জন্য আপনার চতুর্দিকে কৃত্রিম আবেষ্টনী রচনা করা ছাড়া তাহার আর গত্যন্তর কোথায। প্রশ্ন এই, শ্লথ-গ্রন্থি ও শিথিল-স্নায়ু এই সদ্য গঠিত শ্রমিক প্রতিষ্ঠান নিদানের পক্ষে কতখানি নির্ভরযোগ্য হইবে ?

টিটো বনাম ষ্ট্যালিন

টিটো-ষ্ট্যালিন সংঘর্ষ যে সুরু হইয়া গিযাছে সে বিষয়ে সন্দেহের অব-কাশ মাত্র নাই; এখন প্রশ্ন হইল, কোন ঘটনাকে আশ্রয করিযা সে সংঘর্ষের সূত্রপাত ? ইহার মূলে কি বাজনৈতিক আদর্শগত কোন পার্থক্য বিদ্যমান, অথবা সোভিয়েটের সর্বগ্রাসী কবল হইতে যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রীক স্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্ন লইযাই এই সংঘর্ষেব সূচনা ? সেদিন এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে জনকযেক মার্কিণ সাংবাদিক দ্বারা বিরোধেব হেতু সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইলে মার্শাল টিটো বলেন, মঃ ষ্ট্যালিন তাঁহাকে কোনদিনই প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই এবং বিরোধের সূত্রপাত বস্তুতঃ ১৯৪৪ সাল হইতে। স্পষ্টতঃই দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের তখনও বিরতি ঘটে নাই এবং মার্শাল টিটো তখন যুগোশ্লাভ মুক্তি ফৌজের অধিনায়করূপে দখলদার জার্মাণ বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনা করিতেছেন। মার্শাল টিটো বিরোধের সূত্রপাতের সময়

সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করিলেও অনুরূপ স্পষ্টতার সহিত তাহার হেতু নির্ধারণ করিলেন না এবং আভাসে ইঙ্গিতে শু এইটুকুমাত্র ব্যক্ত করিলেন যে, মঃ ষ্ট্যালিন সম্ভবতঃ ভাবিয়াছিলেন, মার্শাল টিটোর ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীকে অনায়াসে করায়াত্ত করিয়া যথেচ্ছ পরিচালন করা সহজসাধ্য হইবে, কিন্তু পারস্পরিক আলাপ আলোচনার ঘনিষ্টতর সান্নিধ্যে আসিয়া যখন তিনি দেখিলেন, মার্শাল টিটোর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি ভ্রান্ত ধারণা পোষন করিয়াছেন, তখন হইতেই টিটোর বিরুদ্ধে তাঁহার মানসিক বিরাগ সঞ্জাত হইতে থাকে এবং কালক্রমে সেই বিরাগই বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়।

হেতু বিশ্লেষণ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও টিটো-ষ্ট্যালিন সংঘর্ষের মূল তত্ত্ব ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছেন। সোভিয়েট অতি সহজে পূর্ব ইউ-রোপের প্রায় প্রতিটি রাজ্যকেই আপনার তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে, শুধু পারে নাই ফিনল্যাণ্ড ও যুগোশ্লাভিয়াকে। ফিনল্যাণ্ড বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয় ; তবে যুগোশ্লাভিয়া কোন কারণেই তাহার রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌমত্ব সোভিয়েটের হাতে সমর্পণ করিতে সম্মত হইল না এবং অচিরে রুশ-যুগোশ্লাভ বিরোধ রাজনৈতিক আদর্শ ও আঞ্চলিক অধিকারের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিল। রাজনৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রে মতদ্বৈধতা দেখা দিল কোমিন ফর্মকে উপলক্ষ্য করিয়া : কোমিনফর্ম যদিও বাহ্যতঃ আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শ্রমিক প্রতিষ্ঠানরূপে পরিচিত, কিন্তু কার্যতঃ তাহা প্রাক্তন কোমিণ্টার্নের মতই সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতির বাহন ব্যতীত আর কিছু নয়। কোমিনফর্মের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া মার্শাল টিটোর পক্ষে এ সত্য উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইল না। তিনি দেখিলেন, কোমিনফর্মের সদস্যপদ লাভের পক্ষে যোগ্যতা বৈপ্লবিক নিষ্ঠা অপেক্ষা সোভিয়েট আনুগত্যই অধিকতর প্রয়োজনীয় এবং কোমিনফর্মের মঞ্চ সদস্যগণকে সেই পাঠ অভ্যাস করাইবারই প্রাথমিক পাঠশালা : বৈশিষ্ট্য শুধু এই যে, সে পাঠশালা সোভিয়েটের জমিদারী

বৈঠকখানায় না বসিয়া, বসে সোভিয়েট প্রভাবিত পূর্ব ইউরোপের বারো-য়ারী আটচালায়। মার্শাল টিটো সোভিয়েটিককরনের এই পরোক্ষ পন্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপন করিলেন কোমিনফর্মের প্রকাশ্য অধিবেশনে; ফলে সোভিয়েট স্তুতির ঐক্যতান মঞ্চে অন্ততঃপক্ষে একটি যন্ত্রেও অসঙ্গতির সুর বাজিয়া উঠিল। উৎকর্ণ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ সে শব্দে সচকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা অভিযোগ করিলেন, যুগোশ্লাভিয়ার পররাষ্ট্র নীতি সোভিয়েটের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই অভিযোগের জের টানিয়া কোমিনফর্মের কণ্ঠ মার্শাল টিটোর বিরুদ্ধে জঘন্যতার অভি-যোগের উচ্চারণে মুখর হইয়া উঠিল: সে অভিযোগ যথাক্রমে প্রতিক্রিয়া-শীলতা হইতে সুরু করিয়া ফ্যাসিষ্ট পন্থার মাধ্যমে বৈদেশিক শক্তির পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তিতে পরিসমাপ্ত হইল। যথাসময়ে দণ্ডাজ্ঞা আসিয়া আসরে অবতীর্ণ হইল দোষকে অনুসরণ করিয়া এবং কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মার্শাল টিটো কোমিনফর্ম হইতে ব হস্কৃত হইলেন।

ইহাই হইল রাজনৈতিক আদর্শবাদগত সংঘাতের ইতিহাস; আঞ্চলিক অধিকারগত সংঘাতের জন্ম বৃত্তান্ত ইহা হইতেও প্রাচীন। বিজয়ী শক্তি-বর্গ চূড়ান্ত জয়লাভের নিশ্চিত সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়াই সমরকালীন সঙ্কট সময়ে ইয়াল্টা ও পট্সডামে বসিয়া যখন যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ পরাজিত জার্মাণী ও ইতালীর অধিকৃত রাজ্যসমূহের বণ্টননামা রচনা করিতেছেন, মার্শাল টিটো সম্ভবতঃ সেই সময়েই ইতালীর অধিকারভুক্ত ত্রিয়েস্তে বন্দর এবং অষ্ট্রীয়া-যুগোশ্লাভ সীমান্তবর্তী ও অষ্ট্রীয়ার দক্ষিণ প্রান্তস্থ কোরিন্থিয়ার উপর যুগোশ্লাভিয়ার দাবী জ্ঞাপন করিয়া রাখেন। তাঁহার ভরসা ছিল, মঃ ষ্ট্যালিন অন্ততঃ তাঁহার এ দাবী সমর্থন করিবেন এবং পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ কর্তৃক যাহাতে সে দাবী স্বীকৃত হয় সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, সোভিয়েটের পক্ষ হইতে সে দাবী সমর্থন করিবার সবল ও সুস্পষ্ট কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত

হইল না। মার্শাল টিটো তথাপি সম্ভাব্য সোভিয়েট সাহায্য ও সমর্থনের উপর নির্ভর করিয়াই ত্রিয়েস্তে অধিকারের জন্য সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন; এদিকে অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বৃটিশ ও মার্কিণ সামরিক কর্তৃপক্ষ যখন আক্রমণ প্রতিরোধের নিমিত্ত সক্রিয় হইয়া উঠিলেন, অথচ সৎসত্ত্বেও বহু প্রত্যাশিত সোভিয়েট সমর্থনের সাক্ষাৎ মিলিল না, তখন অনন্যোপায় হইয়া তিনি পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইলেন; ফলে ত্রিয়েস্তে-লাভের আশা তাহাকে চিরতরে পরিত্যাগ করিতে হইল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে জটিলতর অবস্থার উদ্ভব হইল কোরিন্থিয়ার উপর উত্থাপিত যুগোশ্লাভ দাবী হইতে। কার্যতঃ সে দাবীর পরিণতি কি হইয়াছে তাহা যদিও পরিজ্ঞাত নয়, তথাপি সেই ঘটানকে উপলক্ষ্য করিয়া সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট সেদিন মার্শাল টিটোর বিরুদ্ধে এই মর্মে এক অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন যে, টিটো গবর্ণমেণ্ট বৃটীশ সরকারের সহিত এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া কোরিন্থিয়ার উপর যুগোশ্লাভ দাবী প্রত্যাহার করিয়াছেন; শুধু তাহাই নয়, সে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এবং জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতামূলক এই চুক্তি সম্পাদনের কথা আজও যুগোশ্লাভ জনসাধারণের নিকট গোপন রাখা হইয়াছে। মার্শাল টিটো কোরিন্থিয়া সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আলাপ আলোচনার কথা স্বীকার করেন, কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করেন যে, সে আলোচনা গোপনও নয়, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতও নয়, বরঞ্চ তাঁহাদের পরামর্শক্রমেই তিনি সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। মার্শাল টিটো অতঃপর সে ইতিহাস উদ্ধৃত করিতে গিয়া বলেন, প্যারিসে যখন চতুঃশক্তির পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনের অধিবেশন চলিতেছিল, সেই সময়ে সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ ভিসিন্স্কিকে তিনি কোরিন্থিয়ার উপর যুগোশ্লাভ দাবীর কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া এই অনুরোধ জ্ঞাপন করেন যে, তিনি যেন সম্মেলনের সম্মুখে যুগোশ্লাভ দাবীর যৌক্তি-

কতা সপ্রমাণ করিয়া পাশ্চাত্য শক্তিবর্গকে এই কথাই জানিতে দেন যে, সে দাবীর স্বপক্ষে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের পরিপূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে। কিন্তু মঃ ভিসিন্স্কি সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আলাপ আলোচনায় লিপ্ত হইবার সুপরামর্শ প্রদান করেন। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট আজ সুবিধামত সে ইতিহাস বিস্মৃত হইয়াছেন এবং অজ্ঞতার ভান করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার যে অভিযোগ তাহার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আনয়ন করিতেছেন তাহার যোগ্যতম আসামী যদি কেহ থাকে তবে মার্শাল টিটোর মতে, তাহা সোভিয়েট সরকার স্বয়ং।

কিন্তু অভিযোগ উত্থাপনই লক্ষ্য নয়, উহা লক্ষ্যে উপনীত হইবার উপায় বা উপলক্ষ্য মাত্র। সোভিয়েটের আসল লক্ষ্য হইল যুগোশ্লাভিয়া হইতে টিটো নেতৃত্বের অপসারণ ও টিটো-গবর্ণমেণ্টের অবসান। গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার সহিত চূড়ান্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার উদ্দেশ্যে মঃ ষ্ট্যালিন সমগ্র পূর্ব ইউরোপকে সম্বল করিয়া যে গ্র্যাণ্ড ষ্ট্রাটাজী রচনা করিয়াছেন মার্শাল টিটো তাঁহার ব্যক্তিগত, জাতিগত ও রাষ্ট্রীক স্বাতন্ত্র্যবোধের বশবর্তী হইয়া যুগোশ্লাভিয়াকে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। ফলে সোভিয়েটের সর্বাত্মক-সমর পরিকল্পনা ত্রুটিযুক্ত ও ছিদ্রান্বিত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব ইউরোপ সোভিয়েটের আত্মরক্ষার বহির্ব্যূহ, তাহার প্রাচীরগাত্রে চুল পরিমিত ফাটলের অস্তিত্বও মঃ ষ্ট্যালিন স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাই টিটো নেতৃত্ব এবং টিটো গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর পর্দায় পর্দায় পঞ্চমে উঠিয়া চূড়ান্ত দণ্ডাদেশ দানের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে আনীত তাঁহার প্রথম অভিযোগ ছিল এই যে, সোভিয়েটের প্রতি তাহার মনো-ভাব বন্ধুভাবাপন্ন নয়, দেখিতে দেখিতে তাহা প্রতিক্রিয়াশীলতা, ফ্যাসিষ্ট পন্থা, সোভিয়েট বিরোধিতা এবং সর্বশেষে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সহিত

সখ্য প্রভৃতি সোপানশ্রেণী বাহিয়া যেখানে আসিয়া উপনীত হইলে মঃ ষ্ট্যালিন তথায় দাঁড়াইয়া যুগোশ্লাভিয়াকে স্পষ্টাক্ষরে শত্রুদেশ আখ্যায় অভিহিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে সুরু হইয়া গেল দ্বিমুখী প্রচার অভিযান, একদিকে যুগোশ্লাভিয়া-অষ্ট্রীয়া সীমান্তে আরম্ভ হইল সৈন্য চলাচল ও সামরিক কর্মতৎপরতা এবং অপরদিকে মঃ ষ্ট্যালিন ঘোষণা করিলেন, প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব ও গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধনের জন্য 'সৎ কমিউনিষ্ট এখনও যুগোশ্লাভিয়ায় প্রচুর সংখ্যক আছেন। বলা বাহুল্য টিটো গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ আয়োজনের জন্য ইহা প্রত্যক্ষ প্ররোচনা।

এদিকে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ টিটো-ষ্ট্যালিন সংঘর্ষের ক্রমপরিণতি গভীর আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন। এ সম্পর্কে পাশ্চাত্য রাজনীতিকগণের অভিমত দ্বিধা-বিভক্ত : এক পক্ষ মনে করেন, এ মতবিরোধের মধ্যে আদর্শগত আন্তরিকতা বিদ্যমান এবং মঃ ষ্ট্যালিন তাঁহার একনায়ক শাসনের ষ্টীম রোলারের পেষণে সমগ্র পূর্ব ইউরোপকে পিষ্ট করিয়া স্বমতের যে সমতল ক্ষেত্র প্রস্তুত কবিযাছেন, যুগোশ্লাভিয়া সত্য সত্যই তাহার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম। তাঁহাদের মতে, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের কর্তব্য, এই মতবিরোধের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা এবং পরোক্ষ কূটনৈতিক চাপ ও যুগোশ্লাভিয়ার অনুকূলে প্রত্যক্ষ পক্ষপাতিত্বের সাহায্যে সে ব্যবধান যতদূর সম্ভব বর্ধিত করিতে সচেষ্ট হওয়া। মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট দীর্ঘদিন ধরিয়া অত্যন্ত সতর্কতার সহিত টিটো-ষ্ট্যালিন সম্পর্কের ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করিবার পর সম্প্রতি যুগোশ্লাভিয়ার অনুকূলে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন এবং শিল্পোন্নয়নের নিমিত্ত ইস্পাতের কারখানার উপযোগী যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ত্রিশ লক্ষ ষ্টার্লিং ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সহিত যুগোশ্লাভিয়ার বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। পাশ্চাত্য রাজ-

নীতিকবর্গের অপর পক্ষ কিন্তু এই বিরোধের সত্যতায় ও বাস্তবতায় বিশ্বাসবান নহেন; তাঁহাবা মনে করেন, ইহা বিরোধ নয়, বিরোধের কৃত্রিম অভিনয় মাত্র এবং এই অভিনয় অনুষ্ঠানের গোপন উদ্দেশ্য হইল এই যে, সোভিয়েটের পক্ষে যে মার্কিণ সাহায্য অন্যথা দুষ্প্রাপ্য যুগো-শ্লাভিয়াকে বিরোধী পক্ষরূপে সম্মুখে স্থাপন করিয়া অতি সহজে তাহা অর্জন করা সম্ভব হইবে এবং কার্যকালে সে সাহায্য-সম্ভার ব্যবহৃত হইবে মার্কিণ তথা পাশ্চাত্য অন্যান্য শক্তিবর্গের বিরুদ্ধেই। এ যুক্তি অত্যন্ত কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয় এবং আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী তাহার অসারতাই প্রতিপন্ন করে। এ বিরোধ বাস্তব এবং সত্যকার। পাশ্চাত্য শক্তি-বর্গের সমর্থন ও সহানুভূতি যুগোশ্লাভিয়ার স্বপক্ষে মঃ ষ্ট্যালিন যদি নিঃসং-শয়ে একথা না জানিতেন, তাহা হইলে টিটো নেতৃত্ব অথবা তাঁহার গবর্ণ-মেণ্টের অস্তিত্ব তিনি এতদিন কিছুতেই বরদাস্ত করিতেন না এবং তাহার অপসারণের জন্য প্রয়োজন হইলে অকুণ্ঠিতচিত্তে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিতেন। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের প্রত্যক্ষ সমর্থন সে পথে দারুণ প্রতি-বন্ধক, কাজেই ষ্ট্যালিন সে পথ পরিহার করিয়া, যুগোশ্লাভিয়ার অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ প্ররোচিত করিয়া তুলিবার গোপনসুরঙ্গ পথ অনুসরণ করিবেন বলিয়াই মনে হয়। কোমিনফর্মের অন্তর্গত তথাকথিত 'সৎ কমিউনিষ্ট'-দিগের সাহায্যে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ জাগাইয়া তোলা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে যুগোশ্লাভিয়ায় চেকোশ্লোভাকিয়ান নাটকের পুনরভিনয় হইবে এবং প্রধান মন্ত্রী মাসারিক যে পথে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, মার্শাল টিটো হইবেন সেই পথেরই পরবর্তী যাত্রী। আর সে প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত না হইলে যুগোশ্লাভিয়া যে কেবলমাত্র সোভিয়েট রক্ষাব্যূহের প্রাচীরগাত্রে দুর্বলতম স্থানরূপেই বিরাজ করিবে তাহা নয়, পরন্তু সে দুর্বলতা ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত করিয়া শত্রুসৈন্যের প্রবেশপথ সুপ্রশস্ত করিবে।

সোভিয়েট-পারস্য বিরোধ

রুশ-পারস্য বিরোধ চরম সঙ্কটের অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। পারস্যের অভ্যন্তরে সৈন্য চলাচল ও অন্যান্য সামরিক কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে উভয় রাষ্ট্রই যদিও সম্পূর্ণ নীরবতা রক্ষা করিয়া চলিতেছেন, তথাপি বিবিধ বে-সরকারী সূত্র হইতে যে সমস্ত সংবাদ বাহির হইয়া আসিতেছে তাহা অতিশয় আশঙ্কাজনক। কেরাজে ইতিপূর্বে ছয়শত হইতে সাতশত মাত্র রুশ সৈন্য থাকিত, সম্প্রতি আরও দুই হাজার সৈন্য সেখানে আমদানী করা হইয়াছে এবং তৎসহ যুদ্ধোপকরণও আসিয়া পৌছিয়াছে প্রচুর পরিমাণে। কাজভিন হইতে আরও একটি সোভিয়েট সৈন্য বোঝাই ট্রেণ আসিতেছিল, কিন্তু বন্যার দরুণ মধ্যপথে তাহা আটকাইয়া গিয়াছে। তেহরাণ হইতেই রয়টার সংবাদ দিতেছেন, কেরাজে সোভিয়েট সৈন্য ও সমরোপকরণের নূতন চালান আসা সত্ত্বেও ইরাণ সরকার সেখানকার পারস্য-বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিবার কোন চেষ্টা করিতেছেন না। পারস্য মন্ত্রণা পরিষদের জনৈক সদস্য বলিয়াছেন, তেহরাণে পারস্য সৈন্যের শক্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ রটিয়াছে তাহা সর্বৈব মিথ্যা। তেহরাণে কিছু নূতন ইরাণী সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে সত্য কিন্তু তত্রত্য বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে তাহা প্রেরণ করা হয় নাই, পূর্ব্ব পারস্যের কোন একটি স্থান হইতে সোভিয়েট সৈন্য অপসারিত হইলে, উক্ত স্থান দখল করিবার জন্য যে ইরাণী সৈন্যদল প্রেরিত হয় তেহরাণ হইতে ৭৫ মাইল পূর্বে গার্মসার নামক স্থানে সোভিয়েট সৈন্য তাহাদের গতিরোধ করে; সেইজন্য ঐ সৈন্যদল পশ্চাদপসরণ করিয়া তেহরাণে আসিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হয়। পারস্যের অধিকাংশ সংবাদপত্রই বড় বড় হরফে সোভিয়েট সৈন্যের গতিবিধির সংবাদ প্রকাশ

করিতেছে। তন্মধ্যে একটি খবরের কাগজে প্রকাশ, অগ্রগামী রুশ-বাহিনী ও ইরাক সীমান্তের মাঝখানে ব্যবধান বর্তমানে সত্তর মাইল মাত্র। বোগদাদস্থ ইরাকী রাষ্ট্রনায়কগণ সীমান্ত হইতে একশত মাইল দূরবর্তী কোন এক স্থানে বসিয়া সতর্ক দৃষ্টিতে ঘটনাস্রোত লক্ষ্য করিতেছেন।

এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রের প্রকাশিত খবর ছাড়া, নির্ভরযোগ্য সরকারীসূত্র হইতে প্রাপ্ত কোন সংবাদ নাই বলিলেই চলে। তবে কিছুদিন পূর্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব মিঃ বার্ণেশ পারস্যের অভ্যন্তরে সোভিয়েট সৈন্য চলাচলের সংবাদ ঘোষণা করিবার সময় বলেন, এ সংবাদ নির্ভর-যোগ্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিভাগও তাঁহার এই উক্তির সমর্থন করেন। এ বিষয়ে সরকারী স্বীকৃতি থাক বা না থাক, পরবর্তী ঘটনাপরম্পরা আসন্ন সঙ্কটের নিশ্চিত আভাস নিঃসন্দেহে ব্যক্ত করে। সোভিয়েটের তুলনায় পারস্য অতি দুর্বল রাষ্ট্র। তাই উত্তেজনার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যখন পারস্যের উপর সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প, তখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও প্রতিকার প্রার্থনা করা ছাড়া পারস্যের আর গত্যন্তর কোথায়! পারস্য সরকার যখন এইজন্য প্রস্তুত হইতেছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিলেন, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট কোনরূপ প্রতিবাদ প্রেরণ সোভিয়েট সরকার বৈরিতার কার্য বলিয়া মনে করিবেন এবং তাহা সত্ত্বেও ইরাণ গবর্ণমেণ্ট যদি সেকার্যে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সোভিয়েট সরকারের পক্ষেও যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ উন্মুক্ত রহিবে। দুর্বলের পক্ষে ইহা হইতে শোচনীয় দুরবস্থার কথা কি কল্পনা করাও সম্ভব? সামরিক অভিযান প্রতিরোধ করিতে যে অসমর্থ, সে তাহার বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ পর্যন্ত জ্ঞাপন করিতে পারিবেনা, তদুদ্দেশ্যে গঠিত নিরাপত্তা

পরিষদের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পারিবে না—নাৎসী জুলুমও যে ইহার নিকট লজ্জায় মাথা হেঁট করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর গঠিত রাষ্ট্রসঙ্ঘকে সোভিয়েট রাশিয়া 'দস্যুসঙ্ঘ' নামে অভিহিত করিয়াছিল সে তাহার সভ্য পর্যন্ত ছিল না; কাজেই তাহার কৃতকার্যের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট তাহার কোন জবাবদিহিও ছিল না; কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ—তথা নিরাপত্তা পরিষদ গঠনের মূলে সোভিয়েটের সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা বিদ্যমান, আজিও সে তাহার অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য। এরূপক্ষেত্রে তাহারই স্বরচিত প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তাহার এই বিভীষিকা বা বিরূপ মনোভাবের যৌক্তিকতা কি? যুক্তি যদি এই হয় যে, যেহেতু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তথা নিরাপত্তা পরিষদে ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব সমধিক, সেইজন্য তাহার সন্ধান ও সিদ্ধান্ত উল্লিখিত উভয় রাষ্ট্রের স্বার্থসম্মত হইতে বাধ্য, আমরা সে যুক্তি মানিয়া লইতেছি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রাশিয়া যদি ইরাণ সরকারকে নিরাপত্তা পরিষদে তাহার অভিযোগ উত্থাপন করিবার অবাধ অধিকার দিত, তাহাতে রাশিয়ার লাভ বই ক্ষতি হইত না। বিচার-বিতর্কের সময় পরিষদের সদস্যরূপে সে প্রমাণ করিবার সুযোগ পাইত যে, মধ্য ও দূরপ্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যেই সে এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, নিজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। কিন্তু পরিষদে প্রসঙ্গমাত্র উত্থাপনের বিপক্ষে তাহার আপত্তি কি নিজের দুষ্ট বিবেক ও দুরভিসন্ধিমূলক কার্যতৎপরতার কথাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে না?

এদিকে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের এই হুম্‌কির ভয়ে পারস্য সরকার যখন সংশয় দোলায় দোদুল্যমান এবং সেই অব্যবস্থিত চিত্ততার ফলে নিরাপত্তা পরিষদে প্রতিবাদ প্রেরণ যখন দিনে দিনে বিলম্বিত হইয়াই চলিয়াছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তখন চব্বিশ ঘণ্টার মেয়াদে এক জরুরী নোট

ইরাণ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিলেন। ইহার দ্বারা জানান হইল, ইরাণ সরকার যদি আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রেরণ না করেন, তাহা হইলে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া সে প্রতিবাদ পেশ করিবেন। বেচারী পারস্য সরকার! দুই দিক হইতে দুই প্রবল রাষ্ট্র যদি যুগপৎ তাহার উপর দুই পরস্পর-বিরোধী চাপ প্রয়োগ করে, সে কাহাকে তুষ্ট ও কাহাকেই বা রুষ্ট করিবে! যাহা হউক, পারস্য সরকার কোনক্রমে তাঁহাদের মতিস্থির করিয়া ফেলিয়াছেন এবং মার্কিণ গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, রুশীয় সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট তাঁহারা বিচার প্রার্থী। আগামী ২৫শে মার্চ নিউইয়র্ক সহরে পরিষদের যে অধিবেশন হইবে, সোভিয়েট-ইরাণ সমস্যার আলোচনা হইবে তাহার অন্যতম কার্যক্রম। এ সম্বন্ধে পরিষদের যে সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা বহু বিচার ও বিতর্ক সাপেক্ষ। ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট সংশ্লিষ্ট সরকারদ্বয়কে জানাইয়া দিয়াছেন যে পারস্য বা তুরস্ক যদি আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ-বিরোধী সেই আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য মার্কিণ সরকার তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবেন।

এখন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে দুইটি পথ উন্মুক্ত : হয় ইঙ্গ-মার্কিণ ভীতি প্রদর্শন উপেক্ষা করিয়াই পরিকল্পিত পথে দৃঢ়চিত্তে আগাইয়া যাওয়া, নয় সঙ্কটের আশঙ্কায় পশ্চাদপসরণ করিয়া, অন্ততঃপক্ষে স্তব্ধ হইয়া আপোষ-আলোচনার মধ্য পন্থা অনুসরণ করা। যদি প্রথম পন্থা অনুসৃত হয়, তৃতীয় মহাযুদ্ধ ও তজ্জনিত অভাবনীয় ধ্বংসলীলা অবশ্যম্ভাবী। আর যদি শেষোক্ত পন্থা অনুসরণ করা হয়, বিশ্ব হয়তো আসন্ন আর একটি বিনাশ-যজ্ঞ হইতে কিছুদিনের জন্য অব্যাহতি লাভ করিবে। কোন্ সম্ভাবনা লইয়া অনতিদূরভবিষ্যৎ আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে কে জানে!

সোভিয়েট রুশের রূপান্তর

সোভিয়েট রাশিয়া বর্ত্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল রাষ্ট্রসমূহের অন্যতম। জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, শক্তিতে ও সম্পদে একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অপর কোন রাষ্ট্রই সম্ভবতঃ তাহার সহিত তুলনীয় নয়। তাহার বিপুল জনসংখ্যা আছে, বিশাল আয়তন আছে, আছে অপরিমেয় উৎপাদন শক্তি, অসাধারণ উদ্ভাবনী ক্ষমতা, জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে রণ-নিপুন দুর্দ্ধর্ষ সেনাবাহিনী এবং সর্ব্বোপরি আছে সমাজতন্ত্র সম্মত অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয়ও শাসন ব্যবস্থা। এ সবই সত্য, কিন্তু এ সব তাহার বিশেষণ, বিশেষত্ব নয়। দিগ্বিজয়ী নবতর সাম্রাজ্যবাদের বার্ত্তাবাহীরূপে সে বিশ্বে আগমন করে নাই; সে আসিয়াছিল বিশ্বের শাসিত ও শোষিত জনসাধারণের মুক্তির বাণী বহন করিয়া, প্রচলিত সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি সাথে লইয়া। সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রীক সত্তার ইহাই স্বরূপ ও সংজ্ঞা এবং তাহার সাফল্য ও সার্থকতার যদি যাচাই করিতে হয়, তবে এই কৃতকার্যতার কষ্টিপাথরেই তাহা বিচার্য। অবশ্য সে ব্রত সফল করিতে হইলে, সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে উল্লিখিত বিশেষণ সমূহের অধিকার অপরিহার্য এবং সোভিয়েট সে অধিকার সমূহ আয়ত্ত করিয়াছে আশাতীতরূপে। এখন বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে সোভিয়েট তাহার অর্জ্জিত সম্পদ ও শক্তির কতটুকু অংশ প্রয়োগ করিয়াছে আত্মপ্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে এবং কতটুকুই বা নিয়োজিত করিয়াছে নিজের জীবনব্রত উদ্‌যাপন কল্পে।

যন্ত্র যুগের প্রথম প্রভাতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও কার্ল মার্কস্ তাঁহার

সত্যসন্ধী দার্শনিক দৃষ্টির সাহায্যে যন্ত্র সভ্যতার ক্রম পরিণতি লক্ষ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন: তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যান, যন্ত্রশিল্পের দ্রুত বর্দ্ধমান উৎপাদন শক্তি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে উৎকট সমস্যার সৃষ্টি করিবে একমাত্র সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই তাহার চরম সমাধান নিহিত। বাষ্প ও বিদ্যুত যন্ত্র শাকটের দুইটী দুর্মদ ও বেগবান বাহন তাহাদের দুর্বার গতিবেগের আঘাতে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করিবে কল্পনাতীত রূপে, কিন্তু বর্তমান সমাজব্যবস্থার কল্যাণে উৎপন্ন মালের ক্রয় ক্ষমতা সমাজের সর্বস্তরে বিরাজ করিবে না, মাত্র শ্রেণীবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিবে, অথচ প্রতিযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপাদন কার্য বন্ধ হইবার নয়, যন্ত্র দানবের জঠরাগ্নি অনির্বাণ রাখিবার জন্য প্রয়োজন নিত্য নবনব কাঁচামালের আহুতি প্রদান; ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের পর্বত প্রমাণ স্তূপের চাপ একদিকে যেমন সমাজের শ্বাসবোধ করিবে, অন্যদিকে তেমনি বাড়াইয়া তুলিবে বঞ্চিত জনসাধারণের সর্বগ্রাসী বুভুক্ষা। এতদুভয়ের মধ্যে যদি সামঞ্জস্য সাধিত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য: মার্কসীয় দর্শনে ইহাই শ্রেণী সংঘাত নামে অভিহিত। শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ সমাজের সর্বনিম্ন স্তর হইতে যে শ্রমশক্তি আহরণ করিয়া আপনাদের সেবায় নিযোজিত করিতেছে সেই সর্বহারা ও সর্ব সংস্কার মুক্ত শ্রমিক শ্রেণীই হইবে সে সংগ্রামের নায়ক ও ভাবী সমাজ বিপ্লবের অগ্রদূত; তাহাদের বলিষ্ঠ বাহুর আঘাতে যুগজীর্ণ ও সমস্যাকীর্ণ পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা সমূলে ধ্বসিয়া পড়িবে এবং তাহার স্থলে শ্রেণী বৈষম্যহীন এমন এক নূতন সমাজ ব্যবস্থা জন্মলাভ করিবে যেখানে মানুষ যন্ত্রের সেবায় উৎসর্গীকৃত হইবে না। যন্ত্রই মানুষের সেবায় নিঃশেষে নিয়োজিত হইবে।

মার্কসের সে স্বপ্ন-রূপ পরিগ্রহ করিল রুশ বিপ্লবের মধ্যে: স্বৈরাচারী জার-শাসন তন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া ও অভিজাত সমাজ-ব্যবস্থার বিলোপ

সাধন করিয়া সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী সেখানে আপনার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিল, কিন্তু মার্কসীয় সমাজ দর্শনের যুক্তি অনুযায়ী সমাজ-বিপ্লব কোন একটীমাত্র দেশে সার্থক ও সম্পূর্ণ হইতে পারে না, কারণ চতুর্দিকে বিরুদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার সমুদ্র-বক্ষে সে হইবে ক্ষুদ্র দ্বীপ বিশেষ এবং ক্রুদ্ধ সাগর তরঙ্গের উদ্ধত আঘাতে তাহার অস্তিত্ব যে কোন মুহূর্ত্তে বিপর্যস্ত হইতে পারে। তাই প্রথম সমাজ বিপ্লবের বহ্নিকুণ্ডে বর্ত্তিকা ধরাইয়া বিশ্ব বিপ্লবের দাবানল জ্বালাইয়া তুলিবার আয়োজন দ্রুত হস্তে সম্পন্ন করাই মার্কসীয় দর্শনের বিধান। এ তত্ত্বের সারবত্তা উপলব্ধি করিতে সোভিয়েট রাশিয়ার অধিক বিলম্ব হইল না ; সে অচিরেই দেখিল, তাহার প্রচারিত সামাজিক আদর্শ ও রাষ্ট্রীক নীতি বিশ্বের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের চিত্তে ভীতি উৎপাদন করিয়াছে এবং তাহার বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানিবার উদ্দেশ্যে তাহারা অত্যন্ত দ্রুততার সহিত সজ্জিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে।

রুশ বিপ্লবের নায়ক লেনিন শিশু সোভিয়েটের এই আসন্ন বিপদ প্রত্যক্ষ করিলেন এবং অনুরূপ ত্বরার সহিত তৎপর হইলেন তাহার প্রতিবিধানের জন্য। তাহার ফলে একদিকে অভ্যন্তরে যেমন অর্থনীতি-ক্ষেত্রে কলেবর লাভ করিল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও সামরিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হইল দুর্দ্ধর্ষ লালফৌজের ; অপরদিকে বাহিরে তেমনি জন্মলাভ করিল আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শ্রমিক প্রতিষ্ঠান কোমিণ্টার্ণ। বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের জন্য, বিপ্লব পরিচালনের রীতি ও কৌশল অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করিবায় উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের ও জাতির যুবকগণ দলে দলে আসিয়া রাশিয়ার সমবেত হইতে লাগিলেন ; কোমিণ্টার্ণের সভায় বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর বিচিত্র স্বার্থ ও সমস্যা সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোন হইতে আলোচিত হইতে লাগিল ও তৎসম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং কর্ম্মপন্থা গৃহীত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সমগ্র বিশ্বের সর্বহারা শ্রমিক

শ্রেণী অভিন্ন স্বার্থ ও সম-ভ্রাতৃত্বের এক নিগূঢ় বন্ধনে এমন নিবিড়ভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়িল যে, তাহার বিরাট দেহের কোন এক প্রান্তে সামান্যতম আঘাত লাগিলে সমগ্র দেহ-যন্ত্র উঁচুস্বরে বাঁধা বীণার মত বেদনায় বাজিয়া উঠে।

লেনিনের প্রেরণা এই আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রাণশক্তির উৎস, লেনিনের নেতৃত্ব তাহার নিয়ন্তা ও নিয়ামক। কিন্তু লেনিন ইতিমধ্যে লোকান্তরিত হইলেন এবং তাঁহার লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার রাষ্ট্রমঞ্চ ষ্ট্যালিন ও ট্রট্স্কির ক্ষমতা অধিকারের প্রতিযোগিতার মল্লক্ষেত্রে পরিণত হইল। কিন্তু বস্তুতঃ এই প্রতিযোগিতা দুইটী ব্যক্তির মধ্যে নয়, দুইটী নীতির মধ্যে : ট্রট্স্কি বিশ্ব বিপ্লবের পক্ষপাতী। তিনি চান রুশ বিপ্লবের বহ্নিকুণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিয়া দিকে দিকে বিপ্লবের অনির্ব্বাণ হোমাগ্নি জ্বালাইয়া তুলিতে, অন্যথায় রুশ-বিপ্লব তাঁহার মতে তাৎপর্যহীন ও নিরর্থক। পক্ষান্তরে ষ্ট্যালিন চাহিলেন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক বিপ্লবের বিপজ্জনক দায়িত্বভার হইতে সোভিয়েটকে ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া আভ্যন্তরীণ শক্তি সংগঠনের কার্যে, তাহাকে একান্তভাবে নিয়োজিত করিতে। প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত ষ্ট্যালিন জয়ী হইলেন এবং ট্রট্স্কিকে রুশীয় রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে নির্বাসিত হইতে হইল। এতদিন পর্যন্ত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক শ্রমিক বিপ্লবের দায়িত্ব পালন ও আভ্যন্তরীণ শক্তি সংগঠনের কার্য পরস্পরের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সমান তালে পা ফেলিয়া চলিয়া আসিতেছিল, এতদিন পর্যন্ত একের সমধিক প্রসারে অপরের সমুচিত বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু এইবারে ঘটনাস্রোত ধীরে ধীরে মোড় ফিরিতে লাগিল।

রাষ্ট্রক্ষমতা ষ্ট্যালিনের করায়ত্ত হইবার অব্যবহিত পরে ১৯২৫ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির চতুর্দ্দশতম বার্ষিক অধিবেশন আহুত হয় এবং সেই অধিবেশনেই কোমিণ্টার্ণের রূপান্তর কার্য অনুষ্ঠান

সহকারে নিষ্পন্ন হয় সর্বপ্রথম। একটীমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রবাদ জয়যুক্ত হইবার অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত ও গৃহীত হয় এই অধিবেশনে এবং সে তত্ত্বের অনুকূলে সমর্থন জ্ঞাপন করিতে গিয়া যে অপূর্ব যুক্তির অবতারণা করা হয়—আন্তর্জাতিক শ্রমিক বিপ্লবের প্রতি তাহা চরম দণ্ডাদেশরূপে চিরদিন স্মরণীয় হইয়া রহিবে: "For the victory of socialism in Soviet Russia the Victory of Revolution in other countries is not essential except for the purpose of safeguarding Soviet Republic aganist foreign imperialist intervention". অর্থাৎ সোভিয়েট রাশিযায় সমাজতন্ত্রবাদ জযযুক্ত হইবার জন্য অন্যান্য দেশে বিপ্লবের বিজয় একান্ত অপরিহার্য নয়; বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপ হইতে সোভিয়েট গণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য যতটুকু মাত্র আবশ্যক, তাহার প্রয়োজনীয়তা তদপেক্ষা অনুমাত্র অধিক নয়। সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্ভাবিত এই তত্ত্ব কোমিণ্টার্ণ তাহার পূর্ণ অধিবেশনে স্বীকার করিয়া লয় এবং ১৯২৮ সালে ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে তাহা প্রস্তাবাকারে উপস্থাপিত হইলে, সোভিয়েট প্রতিনিধিগণের সংখ্যাধিক্য হেতু তাহা অতি সহজে সমর্থিত ও স্বীকৃত হইয়া যায়।

কোমিণ্টার্ণের নব রূপান্তরের ইহাই সূত্রপাত। কোমিণ্টার্ণ এখন হইতে আর আন্তর্জাতিক শ্রমিক বিপ্লবের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান নয়, সে শুধু সোভিয়েট বৈদেশিক নীতির বাহন ও সোভিয়েট স্বার্থরক্ষার জন্য প্রহরারত কুকুর মাত্র। ইতিমধ্যে ১৯৩৩ সালে হিটলারের নায়কতায় নাৎসী জার্মানী জন্ম লাভ করে এবং ইহারই অনতিকাল মধ্যে রোম-বার্লিন-টোকিওর ত্র্যহস্পর্শ সংঘটিত হয়। এখন হইতে কোমিণ্টার্ণ তাহার অধোনতি পথে দ্রুতপদে অবতরণ করিতে থাকে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক বিপ্লবের সম্ভাবনা হইতে সোভিয়েটের ব্যবধান দিনে দিনে বর্দ্ধিত হয়। ফ্যাসী ও নাৎসী শক্তির সমুত্থান দেখিয়া সন্ত্রস্ত সোভিয়েট রাশিয়া কেবল

মাত্র আন্তর্জাতিকতা বর্জন করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না : একদিকে রুশীয় জনসাধারণের চিত্তে উগ্র জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবার জন্য সচেষ্ট হইল এবং অপরদিকে শ্রেণী সংগ্রামের মার্কসীয়,তত্ত্ব পরিহার করিয়া নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে সকল শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির ভাব সৃষ্টি করিতে যত্নবান হইল। স্পেনীয় বিপ্লবে 'পপুলার ফ্রণ্ট' তত্ত্বের উদ্ভব এই প্রচেষ্টারই প্রত্যক্ষ ফল। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতা লাভ করিতে হইলে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের শাসনভার যে সব শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের হাতে ন্যস্ত—তাহাদেরও সহযোগিতা অর্জন করিতে হইবে এবং তাহা করিতে হইলে ধনতান্ত্রিক দেশের গবর্ণমেণ্ট সমূহের সহিত সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের একই মঞ্চে উপবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সে পথ সুগম করিবার জন্য আবিষ্কৃত হইল 'Main aggressor', অর্থাৎ প্রধান আক্রমণকারী তত্ত্বঃ সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট আক্রমণোদ্যোগের পরিমাণ অনুযায়ী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কাল্পনিক শ্রেণী বিভাগ সৃষ্টি করিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী প্রভৃতি তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে পংক্তিভুক্ত করিলেন এবং ইতালী, জার্মাণী ও জাপান হইল বিশ্বরাষ্ট্রের দরবারে অপাংক্তেয়। অতঃপর সুরু হইল প্রথমোক্ত শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলির সহিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের চুক্তি সম্পাদনের পালা।

ইত্যবসরে অদূরে দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পদধ্বনি শ্রুত হইল। মঃ ষ্ট্যালিন সন্ত্রস্ত হইয়া নিতান্ত সংস্কার বশেই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে ভীতি প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়া উঠিলেন, If the bourgiosie chooses the path of war. The working classes of the capitalist countries will choose'the path of revolution." অভিজাত সম্প্রদায় যদি যুদ্ধের পথ বাছিয়া লয়, তাহা হইলে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সর্বহারা সম্প্রদায় বিপ্লবের পথ বাছিয়া লইবে। ইহা বিশুদ্ধ লেনিনীয় তত্ত্ব : "Turn

the imperialist war into civil war"—অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত কর—লেনিনের ইহ বিশ্ববিখ্যাত বৈপ্লবিক বাণী এবং মঃ ষ্ট্যালিন ভাল ভাবেই জানেন যে, সে মহাবাণী উচ্চারণ করিবার অধিকার হইতে তিনি আপনাকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করিয়াছেন; তাই সেই অন্তঃ-সারশূন্য আস্ফালন না জাগাইল ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের মনে সন্ত্রাস, না আনিল শ্রমিক শ্রেণীর চিত্তে প্রেরণা; শূন্য গর্ভ শাসন বাক্য উচ্চারিত হইয়াই শূন্যে বিলীন হইয়া গেল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন কার্যতঃ রণক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হইল, তখন এতাবৎকাল ধরিয়া সাধিত ক্রমবিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ কোমিণ্টার্ণের অদৃষ্টে যাহা ঘটা উচিত ছিল—তাহা সংঘটিত হইতে বিলম্ব হইল না; ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী চিত্ত হইতে সোভিয়েট সম্পর্কে সংশয় ও শঙ্কার শেষ চিহ্নটুকু মুছিযা ফেলিবার জন্য মঃ ষ্ট্যালিন কোমিণ্টার্ণের বিলোপসাধন করিলেন; প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠানরূপে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে বহু পূর্বে, এতদিনে তাহার পারলৌকিক কার্য সম্পন্ন হইল মাত্র। মঃ ষ্ট্যালিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিকে নির্দ্দেশের জন্য সোভিয়েটের মুখাপেক্ষী না হইয়া সেই সেই দেশের জনসাধারণের অভি-প্রায় অনুযায়ী কার্য্য করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক বিপ্লবের এককালীন নেতা সোভিয়েট জনসাধারণকে জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে শ্লাভ ও টিউটনিক জাতির মধ্যে জীবন-সংগ্রামরূপে অভিহিত করিলেন। আন্তর্জাতিক বিপ্লবশকটের চক্রনেমীর বিপরীতমুখী একটি আবর্ত্তন এতদিনে সম্পূর্ণ হইল।

দ্বিতীয় বিশ্ব সংগ্রাম সমাপ্ত হইবার পর যুদ্ধকালীন সহযোগী ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসীর সহিত সোভিয়েটের স্বার্থ সংঘাত অপরিহার্য ঘটনারূপে দিনে দিনে যতই স্ফুটতর হইয়া উঠিতে লাগিল, মঃ ষ্ট্যালিন ততই যে কোন আকারে হোক একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা

বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। কারণ সোভিয়েটের নিজস্ব স্বার্থে, শুধু তাহাই নয়, রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থে বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিকে সোভিয়েটের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীনে আনয়ন করা দরকার, অথচ সরাসরি তাহা করিতে গেলে পাছে তাহা সাম্রাজ্যিক অধিকারের আকার ধারণ করে, এইজন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের একটা সূক্ষ্ম যবনিকার ব্যবধান রক্ষা করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই উদ্ভব হইল 'কোমিনফর্মের' : কার্যতঃ ইহা পরলোকগত কোমিণ্টার্ণেরই নব কলেবর লাভ, তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কোমিণ্টার্ণের পশ্চাতে তবু কিছুটা বৈপ্লবিক ঐতিহ্য ছিল, কিন্তু কোমিনফর্ম সে সংস্কার মুক্ত পরিবেশ রুশীয় জাতীয়তার মানস সন্তানরূপেই ভূমিষ্ট হইয়াছে। কোমিণ্টার্ণ রূপান্তরিত হইল কোমিনফর্মে, নয়া গণতন্ত্র প্রাক্তন পপুলার ফ্রণ্টের নবতর ও উন্নততর সংস্করণরূপে আত্মপ্রকাশ করিল ; এখন প্রশ্ন হইল এই : সোভিয়েট রাষ্ট্রের সত্তা ও স্বরূপ বহু পূর্বেই রূপান্তর লাভ কবিযাছে, এই পরিবর্ত্তন পরম্পরার মাঝখানে তাহাব রাষ্ট্রীক কাঠামোই কি শুধু অপবিবর্ত্তিত রহিয়া যহিবে ?

ইতালীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য

ইতালির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও বিলয়ের ইতিহাস অতি বিচিত্র। ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ যখন কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্র ও তৈয়ারী মাল-বিক্রয়ের বাজারের সন্ধানে বিশ্বের দিকে দিকে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, বিশেষ করিয়া আফ্রিকা মহাদেশ নিজেদের মধ্যে বাঁটিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন পর্যন্ত ইতালি তাহার ভৌগোলিক অবস্থানের বিবর হইতে মুখ বাহির করে নাই বলিলেও চলে। সমুদ্রগামী ইতালীয় জাহাজসমূহে কয়লা বোঝাই করিবার বন্দর হিসাবে ইতালি বাব-এল-মাণ্ডেব প্রণালীর তীরবর্তী 'আসাব' নামক স্থানটি ক্রয় করে। ১৮৬৯ সালে ইহাই ইতালির সর্বপ্রথম আফ্রিকান অধিকার এবং ইহাকে ভিত্তি করিয়াই পরবর্তী যুগে তাহার বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠন করা সম্বন্ধে ইতালি বহুদিন পর্যন্ত মন স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই, এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে সে উপনীত হইল ১৮৮৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। ঐইদিন ইতালি কর্তৃক লোহিত সাগরের তীরবর্তী মিশরীয় বন্দর 'মাসোয়া' অধিকৃত হয়। এই অধিকার ব্রিটেনের সম্মতি ও প্রত্যক্ষ সাহায্যের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। মিশরীয়গণ মাসোয়া পরিত্যাগ করিতে উদ্যত, অথচ ব্রিটেনের গ্ল্যাডষ্টোন মন্ত্রিসভার ইচ্ছা নয় যে, ইংরাজ-সৈন্য কর্তৃক তাহা অধিকৃত হয়; এরূপ ক্ষেত্রে ইতালি, আবিসিনিয়া ও ফরাসী—এই তিনটি দেশের যে কোন একটির অধিকারে তাহা চলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রার্থিত্রয়ের গুণাগুণের তুলনামূলক বিচার করিয়া ইতালিকেই

যোগ্যতম মনে করিলেন (অবশ্য, এ সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ স্বার্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই গৃহীত হয়) এবং অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করিবামাত্র ইতালি মাসোয়া অধিকার করিয়া বসিল।

অবশ্য ইতালির এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পশ্চাতে ছিল বার্লিন কনফারেন্সের আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহের প্রেরণা। ১৮৮৪ সালে আফ্রিকার ভাগ্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের এক সম্মেলন আহূত হয় বার্লিনে এবং সম্মেলনের আলোপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পরস্পরের মধ্যে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ নিঃশেষে বণ্টন করিয়া লইতে চলিয়াছে : এমন কি, যে বিসমার্ক এতদিন পর্যন্ত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের বিরোধী ছিলেন, তিনিও আফ্রিকার বণ্টলামায় স্বাক্ষর ও সম্মতিদান করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। ইতালির শাসন কর্তৃপক্ষও এতদিন পর্যন্ত এ কর্মপন্থার পরিপন্থী ছিলেন, কিন্তু ১৮৮১ সালে ফরাসী কর্তৃক টিউনিস এবং ১৮৮২ সালে ব্রিটেন কর্তৃক মিশব অধিকৃত হইবার পর ইতালিতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের অনুকূলে তুমুল আন্দোলন গড়িয়া উঠিতে থাকে। বার্লিন-সম্মেলন সমাপ্ত হইবার পর সে আন্দোলন এমন তীব্র হইয়া উঠিল যে, তাহার চাপ উপেক্ষা করা ইতালির শাসন-কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হইল না। সাম্রাজ্যবাদী জনমতের পক্ষ হইতে দাবী উত্থাপিত হইলে ত্রিপোলিতানিয়া ও সাইরেনাইকা অধিকারের জন্ম কিন্তু ইতালিয় গভর্ণমেণ্ট ইউরোপীয় জনমতের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় সে দাবী মানিয়া লইতে সম্মত হইতে পারিলেন না, উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় প্রহর গণিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে ক্রিপসি ১৮৮৭ সালে প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপক্ষীয় আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহারই প্রেরণায় ইতালীয় সৈন্যবাহিনী আবিসিনিয়া

উপত্যকার অংশবিশেষ অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু ১৮৯৬ সালের ১লা মার্চ তারিখে ইতালীয় সেনাদল আবিসিনিয়া সৈন্য-বাহিনীর নিকট অ্যাডোয়ায় যে নিদারুণ পরাজয় বরণ করিল, তাহার ফলে এক দিকে যেমন ইতালীয় 'অগ্রগমন-নীতি' ব্যাহত হইল, অপরদিকে তেমনি ক্রিপসি তাঁহার কর্মজীবনের প্রারম্ভেই ভাগ্যবিপর্যয়ে পতিত হইয়া ইতালির রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে চিরতরে অপসারিত হইলেন। ইতালি আবিসিনিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইল এবং সন্ধি-সর্ত অনুযায়ী ইতালি এরিত্রিয়া মাত্র স্বাধিকারে রাখিয়া আর সব স্থান বর্জন করিল।

এদিকে ১৮৮৯ সাল হইতেই ইতালি সোমালিল্যাণ্ডে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করিতে অরেম্ভ করিয়াছে। বেনাদিরের শাসনকার্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনের উদ্দেশ্যে জাঞ্জিবারের সুলতানের অধীনে যথারীতি কয়েকটি সনদপ্রাপ্ত কোম্পানী গঠন করিয়া যান ক্রিস্‌পিই, কিন্তু কোম্পানীগুলি অকর্মণ্য প্রমাণিত হওয়ায় সোমালিল্যাণ্ড ইতালীয় গভর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আসে ১৯০৫ সালে।

ইতালি সরকার ত্রিপোলিতানিয়া ও সাইরেনাইকা অধিকারের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন; ১৯০৯ সালে দেখা গেল, বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রায় প্রত্যেকটিরই পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষ সমর্থন ইতালীয় অভিযানের পশ্চাতে রহিয়াছে। তাই প্রধান মন্ত্রী গিয়োলিত্তি কতকটা জনমতের চাপে বাধ্য হইয়া এবং কিছুটা বৃহৎ শক্তিবর্গের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হইয়া তুচ্ছতম অজুহাত উপলক্ষ্য করিয়া তুরস্ককে আক্রমণ করিয়া বসিলেন। কিন্তু ইতালীয় সৈন্যবাহিনী তুরস্কে আবিসিনিয়া অপেক্ষা তীব্রতর বাধার সম্মুখীন হইল। বস্তুতঃ এ যুদ্ধের পরিণাম কি হইত বলা কঠিন। কিন্তু নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ১৯১২ সালে বল্‌কান যুদ্ধ বাধিয়া উঠায় তুরস্ক ত্রিপোলিতানিয়া ও সাইরেনাইকার বিনিময়ে ইতালির সহিত সন্ধি স্থাপনে

বাধ্য হইল। এই যুক্ত অধিকারদ্বয়ই ইতালি কর্তৃক 'লিবিয়া' নামে অভিহিত হয়।

অতঃপর রোডস ও ইজিয়ান সাগরের তীরবর্তী দোদোকানিজ দ্বীপপুঞ্জও ইতালির অধিকারে আসে। ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধিয়া উঠিল ১৯১৪ সালে; সংগ্রামের সুযোগ গ্রহণ করিয়া লিবিয়ার আদিম অধিবাসিগণ ইতালির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে দেখা গেল, ইতালির বিস্তীর্ণ আফ্রিকান ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ত্রিপোলি ও তন্নিকটবর্তী কযেকটি স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়াছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সিনর মুসোলিনী ইতালীয় রাষ্ট্রের কর্ণধাব হইলেন এবং ফ্যাসিস্তশাসিত ইতালিতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তাবের দাবী দিনে দিনে উগ্রতর হইতে লাগিল। প্রাক্‌-ফ্যাসিস্ত যুগে ইতালীয় জনসাধারণকে ঔপনিবেশিক মনোভাবাপন্ন কবিবার উদ্দেশ্যে 'কলোনিয়াল ইনষ্টিটিউট' নামক একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু ফ্যাসিস্ত সরকারের সর্বাত্মক কর্মতৎপরতার কল্যাণে তাহা অতি দ্রুত দেশময় পরিব্যাপ্ত হইযা পড়িল এবং অসংখ্য সভা সমিতি ও সংবাদপত্রেব মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের অনুকূল প্রচারকার্য বিরামহীন বেগে পরিচালিত হইতে থাকিল। মুসোলিনী স্বযং রোমক সাম্রাজ্য গঠনের উন্মাদ আকাঙ্ক্ষায় মাতিয়া উঠিলেন এবং দেশ ও জাতিকে তাহার তাড়নায় ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিলেন। পুনরায় আবিসিনিয়া আক্রমণ এই প্রচার-কার্যেরই পরিণত ফল। আবিসিনিয়া পূর্ববর্তী আক্রমণ পর্যুদস্ত করিয়াছিল বটে, কিন্তু নব বল দৃপ্ত ইতালির আধুনিকতম অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত সৈন্যবাহিনীর এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না; আবিসিনিয়ার পতন ঘটিল এবং দর্পিত ফ্যাসিস্ত সরকার সদম্ভে ও সোল্লাসে ফুকারিয়া উঠিলেন: "Adowa avenged"!

অর্থাৎ, অ্যাডোয়ার পরাজয়ের প্রতিশোধ গৃহীত হইল।

যথাসময়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণদামামা বাজিয়া উঠিল এবং মুসোলিনীর দুরাকাঙ্ক্ষা পুনরায় ফণা মেলিয়া নাচিয়া উঠিল তাহার তালে তালে। তাহার পরবর্তী ইতিহাস অতিশয় সংক্ষিপ্ত। ইতালি প্রায় অর্ধশতাব্দী-ব্যাপী শ্রম ও সাধনার বলে যে বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল, মুসোলিনী রাজনৈতিক জুয়াখেলায় তৎসমুদায়ই বাজি রাখিলেন এবং যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করিয়া ইতালিকে রিক্ত, নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত করিলেন।

মুসোলিনী ইতালির ভাগ্যসূত্র হিটলারের সমর-শকটের সহিত সংলগ্ন করিয়া গেলেও সে বন্ধন শেষ পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে নাই; ইতালি সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া মিত্রশক্তিবর্গের সহিত মিলিত হইল এবং ইতালীয় ফ্যাসিস্ত বাহিনীর ধ্বংসাবশেষ পরিণত হইল ইউরোপীয় মুক্তিফৌজের সংগঠনে। ইতালি মূলে আক্রমণকারী রাষ্ট্র হইলেও পরবর্তী ভূমিকার বলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দরবারে বিশেষ আচরণ পাইবার দাবী রাখে এবং সেই দাবীর উপরে দণ্ডায়মান হইয়াই তাহার হস্তচ্যুত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইবার অধিকার জ্ঞাপন করিয়াছে। কিন্তু ইহা সে ভালভাবেই জানে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে বিশ্বময় যে পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের দুরাকাঙ্ক্ষার কোনই সঙ্গতি নাই। বিশেষ করিয়া, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে ইতালীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারণ সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনার ধারা তাহার সে অভিজ্ঞতাকে অধিকতর দৃঢ়তা দান করিয়াছে। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা স্যর বি নরসিং রাও ইতালিকে লক্ষ্য করিয়া স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে মরুভূমির উষরতা আদর্শের অগ্রগতির পথে আদৌ অন্তরায় নয়।

ইতালীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত প্রশ্ন সম্মিলিত

জাতিপুঞ্জ পরিষদে উত্থাপিত হয় বিগত বসন্তকালীন অধিবেশনেই। কিন্তু পরস্পরবিরোধী বিতর্ক ও বিতণ্ডার ফলে কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রচনা করা পরিষদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড, লিবিয়া এবং এরিত্রিয়া বর্তমান অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ইহাদের সম্পর্কে ভারতীয় প্রতিনিধি ও যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি দুইই পৃথক প্রস্তাব পরিষদের সম্মুখে পেশ করেন।

ভারতীয় প্রস্তাবের মর্ম এইরূপ :—

লিবিয়াকে স্বাধীনতা দান করিতে হইবে।

তবে সমগ্র লিবিয়া একটিমাত্র রাজ্যে পরিণত হইবে অথবা সাইরেনাইকা, ত্রিপোলিতানিয়া ও ফেজান নামক যে তিনটি পৃথক প্রদেশের সমবায়ে লিবিয়া গঠিত, তাহাদের লইয়া যে রাষ্ট্র গঠিত হইবে, তাহার কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয় অথবা ইউনিটারী হইবে, তাহা নির্ধারিত হইবে জনমতের সাহায্যে ; এই কারণে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা প্রস্তাব করেন, ১৯৪৬ সালের ব্রিটিশ মন্ত্রি-মিশনের অনুকরণে পরিষদ কর্তৃক তিনজন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন গঠিত হোক, উক্ত কমিশন স্থানীয় অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করিবার পর সাইরেনাইকা, ত্রিপোলিতানিয়া ও ফেজানের নিমিত্ত 'এমন এক প্রতিনিধিমূলক গণপরিষদ গঠনের ভিত্তি রচনা করিবেন, যাহার মাধ্যমে সমগ্র সমস্যা সম্পর্কে লিবিয়ার 'জনমত স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তরূপে অভিব্যক্ত হওয়া সম্ভব হইবে।

সোমালিল্যাণ্ড ও এরিত্রিয়ার স্বায়ত্তশাসন লাভের অযোগ্যতা সম্বন্ধে পরিষদে যে অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে, ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা তাহা মানিয়া লইতে সম্মত হন নাই ; তিনি প্রস্তাব করেন, কমিশন কর্তৃক তথাকার অভ্যন্তরীণ অবস্থা পুনরায় পর্যবেক্ষিত হোক এবং পর্যবেক্ষণান্তে কমিশন যদি পূর্ব সিদ্ধান্তই বহাল রাখেন, তাহা হইলে

এরিত্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডকে সাময়িকভাবে আন্তর্জাতিক অছিগিরির অধীনে আনয়ন করা হোক।

ছয় দফা সর্তসম্বলিত মার্কিণ প্রস্তাব নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

(১) লিবিয়াকে তিন বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা দান করিতে হইবে। (২) স্বাধীনতা দান সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইতালি, যুক্তরাষ্ট্র, সাইরেনাইকা ও ত্রিপোলিতানিয়া—এই ছয়টি দেশের সদস্যগণ লইয়া গঠিত এক কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হইবে। (৩) পূর্ব এরিত্রিয়া যুক্ত হইবে ইথিয়োপিয়ার সহিত এবং মাসোয়া ও আসমারার জন্য স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যাল সনদ রচনা করিতে হইবে। (৪) পশ্চিম এরিত্রিয়া ইঙ্গ-মিশরীয় সুদানের সহিত যুক্ত হইবে। (৫) ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড ইতালীয় অছিগিরির অধীনে আনীত হইবে এবং (৬) ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের সীমানা নির্ধারণের নিমিত্ত ইতালি, ইথিয়োপিয়া ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত অপর একজন সদস্য লইয়া একটি কমিশন গঠন করিতে হইবে।

স্পষ্টতঃই দেখা যায়, ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতার প্রস্তাবের সহিত মার্কিণ প্রস্তাবের মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান।

মার্কিণ প্রতিনিধি সোমালিল্যাণ্ড ও এরিত্রিয়ার স্বায়ত্তশাসন লাভের অযোগ্যতা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয়। শুধু তাহাই নয়, উক্ত দুই স্থানের জনমতের দাবী উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় ইতালীয় শাসনের অধীনে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত।

ভারতীয় প্রতিনিধি কমিটির অযোগ্যতার যুক্তি মানিয়া লইতে অক্ষম হইয়া নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানাইয়াছেন এবং তদন্ত শেষে যদি পূর্ব সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়, তাহা হইলে অন্তবর্তীকালের জন্য ইতালির হাতে তাহাদিগকে সমর্পণ না করিয়া আন্তর্জাতিক অছিগিরির অধীনে আনয়ন করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন।

সোভিয়েট এবং তাঁহার দলীয় প্রতিনিধিগণ অবশ্যই উভয় প্রস্তাবই অগ্রাহ্য করিয়া এই মুহূর্তে লিবিয়া, সোমালিল্যাণ্ড ও এরিত্রিয়াকে পূর্ণ স্বাধীনতাদানের দাবী জ্ঞাপন করেন।

বলা বাহুল্য, তাঁহাদের এই দাবীর পশ্চাতে আদর্শগত উদারতা অপেক্ষা ইঙ্গ-মার্কিণ সমর-প্রস্তুতির আশঙ্কাই সমধিক। তাঁহাদের সংশয়, স্বাধীনতা দান সম্পর্কে বিলম্বিত কর্মপন্থা গ্রহণের তাৎপর্য উক্ত স্থানগুলিকে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করিবার জন্য কালহরণের অপকৌশল মাত্র।

অবস্থা বুঝিয়া ইতালি এক উদারতার দৃষ্টান্ত লইয়া সম্মেলনের সম্মুখে সমুপস্থিত, সে কেবলমাত্র সোমালিল্যাণ্ড ব্যতীত সমগ্র আফ্রিকান উপনিবেশের উপর তাহার দাবী প্রত্যাহার করিয়াছে। ইহার ফলে পরিষদসদস্যগণের একটা বিশিষ্ট অংশের মনে ইতালির অনুকূল মনোভাব যে সৃষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তদুপরি সোমালিল্যাণ্ড ও এরিত্রিয়া সম্পর্কিত মার্কিণ প্রস্তাব তাহার স্বপক্ষেই রহিয়াছে।

রাজনৈতিক সাব কমিটি কর্তৃক একুশটি জাতির সদস্যসম্বলিত যে কমিটি ইতিপূর্বে গঠিত হয়, তৎকর্তৃক এই মর্মে সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে যে, ১৯৫২ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে লিবিয়াকে স্বাধীনতা দান করিতেই হইবে। সুতরাং লিবিয়ার ভাগ্য নির্ধারিতই হইয়া আছে—একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

ইঙ্গ-মার্কিণ মনোভাব ও ইতালীয় প্রস্তাব হইতে মনে হইয়াছিল যে সোমালিল্যাণ্ড ও এরিত্রিয়ার জন্য সম্ভবতঃ ইতালীয় অছিগিরিই অপেক্ষা করিতেছে। শেষ পর্যন্ত গত ১৭ই অক্টোবর তারিখের লেক সাক্সেসের সংবাদ হইতে জানা যায় যে, উক্ত তারিখে 'রাজনৈতিক সাব-কমিটি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দশ বৎসর পর সাধারণ পরিষদ যদি অন্যরূপ সিদ্ধান্ত না করেন, তবে ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড স্বাধীনতা লাভ করিবে।

ইতিমধ্যে অছিগিরির ব্যবস্থা করা হইবে। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় সম্মিলিত জাতিপরিষদ কেবল যে তাহার অগ্রগতির পথে থমকিয়াই দাঁড়াইল তাহা নয়, কয়েক পদ পশ্চাদপসরণও করিল এবং গণতন্ত্রের মর্যাদা উপেক্ষা করিয়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের দাবীর নিকটেই আত্মসমর্পণ করিল।

উত্তর আতলান্তিক চুক্তি

দীর্ঘ আট মাসব্যাপী আলাপ-আলোচনার পর আতলান্তিক চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইয়াছে এবং চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির সম্মতিক্রমে সর্তাবলী সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা, লুকসেমবুর্গ ও হল্যাণ্ড—এই সাতটি রাজ্য বর্তমানে চুক্তিপত্রে সম্মতি দান করিয়াছে এবং তাহাদের স্ব স্ব পার্লামেণ্ট কর্তৃক যথারীতি অনুমোদিত হইবার পর তাহারা আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবে আগামী ৪ঠা এপ্রিল তারিখে। এতদ্ব্যতীত যদিও ইতালী, নরওয়ে, ডেনমার্ক, আইসল্যাণ্ড ও পর্তুগাল উপস্থিত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত আমন্ত্রিত হইয়াছে, তথাপি স্বার্থসংশ্লিষ্ট যে কোন রাষ্ট্রের প্রবেশের জন্য পথ সেখানে সতত উন্মুক্ত। তেরোটি সর্তসম্বলিত এই চুক্তির আয়ুকাল হইবে কুড়ি বৎসর, স্বাক্ষরকারী কোন রাষ্ট্রই তৎপূর্বে চুক্তিবন্ধন ছিন্ন করিতে পারিবে না এবং দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর তৎকালীন পরিবর্তিত পরিবেশের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া উত্তর আতলান্তিক মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তার নিমিত্ত সর্তাবলী পুনঃ পরীক্ষার ও পরি-

বর্তনের প্রয়োজন যদি অনুভূত হয়, তাহা হইলে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের সনদের সহিত সামঞ্জস্য সহকারে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে সে পরীক্ষা ও পরিবর্তন সাধন করা যাইবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের সনদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চুক্তিপত্রটি এরূপ ভাবে রচিত হইয়াছে—যাহাতে সনদের আদর্শ ও কর্মপন্থার সহিত তাহার কোন একটি সর্তও সংঘাতশীল না হয়। স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ এই কারণেই চুক্তিপত্রের মুখবন্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শের উপর তাঁহাদের পরিপূর্ণ আস্থা পুনর্স্থাপন করিয়াছেন এবং সেই আদর্শের অনুবর্তী হইয়াই পৃথিবীর প্রতিটি জাতি ও রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই প্রথম সর্তে স্বীকৃত হইয়াছে যে, যে কোন আন্তর্জাতিক বিরোধে জড়িত হইলে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ বলপ্রযোগের নীতি বর্জন করিয়া সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের সনদে বর্ণিত শান্তিপূর্ণ উপায়ে এরূপভাবে তাহার মীমাংসার জন্য চেষ্টিত হইবেন, যাহাব ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি,শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা অণুমাত্র বিঘ্নিত না হয়। দ্বিতীয় সর্তে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রীতির সম্প্রসারণ-অভিপ্রায ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিরোধ যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহেব যে কোন একটি বা একাধিকের উপর সশস্ত্র আক্রমণের আকার পরিগ্রহ করিতে পারে, এরূপ সম্ভাবনার কথা চুক্তিপত্রের রচয়িতাগণের পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব হয় নাই এবং সে সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়াই তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। উল্লিখিত সর্ত-চতুষ্টয়ের মধ্যে পঞ্চম সর্তটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং বস্তুতঃ ইহাই যে সমগ্র চুক্তি-বন্ধন ব্যাপারের মেরুদণ্ড—একথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পঞ্চম সর্তে স্বীকৃত হইয়াছে, যে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার আতলান্তিক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরকারী যে কোন একটি বা একাধিক রাষ্ট্রের

উপর সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালিত হইলে তাহা চুক্তি-সর্তে আবদ্ধ সমগ্র রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপরেই আক্রমণরূপে গণ্য হইবে; সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের সনদ-বর্ণিত একান্ন ধারা অনুযায়ী তাহারা একক অথবা সমবেতভাবে আক্রান্ত রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রসমূহের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইবে; আক্রমণ প্রতিরোধের নিমিত্ত সনদের উক্ত ধারাবলেই সশস্ত্র প্রতিরোধ সমেত যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে; সর্তে ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে যে, যে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হোক না কেন, তাহা নিরাপত্তা পরিষদের গোচর করা হইবে এবং সে ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে ততক্ষণ, যতক্ষণ না নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। ষষ্ঠ সর্তে সশস্ত্র আক্রমণের সংজ্ঞা ও ব্যাপ্তি নির্দেশ করা হইয়াছে; ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের যে কোন একটি, ফরাসী অধিকৃত আলজিরিয়া, যে কোন পক্ষের ইউরোপস্থ দখলদার সৈন্য, উত্তর আতলান্তিক ও কর্কটক্রান্তির উত্তর দিকস্থ অঞ্চলে অবস্থিত যে কোন পক্ষের অধিকৃত যে কোন দ্বীপ অথবা উক্ত অঞ্চলের যে কোন পক্ষের যে কোন জাহাজ অথবা বিমানের উপর আক্রমণ সশস্ত্র আক্রমণরূপে বিবেচিত হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ ডীন এ্যাকেসান ওয়াশিংটনের এক সাংবাদিক সম্মেলনে আতলান্তিক চুক্তি সম্পর্কে বিবৃতি দিতে গেলে উপস্থিত সাংবাদিকগণ কর্তৃক উক্ত চুক্তি ও আমেরিকার উপর তাহার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রায় সত্তর মিনিট ধরিয়া প্রশ্নবাণে জর্জরিত হন। প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে পঞ্চম সর্তের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি বলেন, কোন দেশে সঙ্ঘটিত বিশুদ্ধ অন্তর্বিপ্লব সশস্ত্র আক্রমণরূপে পরিগণিত হইবে না এবং সেরূপ বিপ্লবের বিরুদ্ধে পঞ্চম ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে মাত্র তখনই বৈদেশিক সাহায্য যখন তাহার স্বপক্ষে আসিয়া দাঁড়াইবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের সনদের সহিত পরিপূর্ণ সঙ্গতি রক্ষার উদ্দেশ্যে সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় যথাক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ অতীতে যেসব চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার কোনটিই বর্তমান চুক্তির সহিত সংঘাতশীল নয় এবং ভবিষ্যতে যে সকল চুক্তি সম্পাদন করিবেন, তাহাও সদ্যসম্পাদিত চুক্তির বিরোধী হইবে না। অবশিষ্ট সর্তগুলি গঠনতান্ত্রিক প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহাদের না আছে বিশেষ কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব, না আছে জটিল কোন কূটনৈতিক তাৎপর্য।

নূতন ও প্রাচীন পৃথিবীর মধ্যে শান্তিকালে সম্পাদিত ইহাই সর্বপ্রথম চুক্তি এবং উভয় গোলার্ধের পঁচিশ কোটি লোক অধ্যুষিত প্রায় সত্তর লক্ষ বর্গমাইল পরিমিত স্থান এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইল। বিশাল ভূখণ্ডের এই বিরাট জনসমষ্টি এই সর্তে চুক্তিবদ্ধ যে, স্বাক্ষরকারী দেশের যে কোন একটি আক্রান্ত হইলে সে আক্রমণ অবশিষ্ট আর সকলের বিরুদ্ধেও পরিচালিত বলিয়া গণ্য হইবে এবং সে আক্রমণ প্রতিরোধ-কল্পে সমস্ত দেশ তাহাদের সম্মিলিত শক্তি লইয়া আক্রান্ত দেশের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইবে। আতলান্তিক চুক্তির ইহাই বৈশিষ্ট্য এবং তাহার রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব এইখানে। বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন এই চুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বলেন, বস্তুতঃ ইহা আত্মরক্ষামূলক চুক্তি, কিন্তু কোন রাষ্ট্র যদি তাহাব অবচেতন মনেও আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা পোষণ করিয়া থাকে, তবে এ-চুক্তি তাহার পক্ষে হইবে বিপদসূচক সতর্ক সঙ্কেত স্বরূপ। স্পষ্টতঃ কোন রাষ্ট্রের নাম উল্লিখিত না হইলেও বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, এ-উক্তি সোভিয়েটকে লক্ষ্য করিয়াই উচ্চারিত, এ-চুক্তি সোভিয়েটের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই সম্পাদিত। সোভিয়েট তাহার সম্পর্কে এই চুক্তির তাৎপর্য ও তাহার বিপজ্জনক সম্ভাবনা সম্বন্ধে যথাসময়ে সচেতন হইয়া উঠে এবং

একদিকে সাধারণভাবে তাঁহার সম্পাদন প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্ম ও অপরদিকে বিশেষভাবে নরওয়েকে প্রস্তাবিত চুক্তিবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য চেষ্টিত হয়। চুক্তি সম্পর্কিত আলাপ আলোচনা যখন বেশ কিছুদুর অগ্রসর, মঃ ষ্ট্যালিন এই সময়ে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন, তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্মিলিত ভাবে যুদ্ধকে বিশ্ব-রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে চিরনির্বাসিত করিয়া ঘোষণা প্রচার করিতে প্রস্তুত এবং এমন কি, এ সম্বন্ধে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার জন্ম যদি প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন হয়, তাহাও তিনি করিতে সম্মত। মঃ ষ্ট্যালিন ভাবিলেন, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ এই কথাই প্রচার করিতেছেন যে, এ চুক্তি নিছক আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণ আশঙ্কা হইতেই ইহার উদ্ভব ; এরূপ ক্ষেত্রে এই ঘোষণা একদিকে যেমন বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে সোভিয়েট আন্তরিকতা সপ্রমাণ করিবে, অপরদিকে তেমনি আতলান্তিক চুক্তি সম্পাদনের অনুকূলে পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের প্রদর্শিত যুক্তি ও প্রয়োজনীয়তার তাহা মূলোচ্ছেদ করিবে। কিন্তু মঃ ষ্ট্যালিনের কুটনৈতিক এই কৌশল সংশ্লিষ্ট শক্তিসমূহের মনে বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না, ফলে বাক্যের অন্তঃসারশূন্য বুদ্বুদ অলক্ষ্যে বায়ুস্তরে বিলীন হইয়া গেল। সোভিয়েটের লক্ষ্য তখন নিপতিত হইল নরওয়ের উপর। স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ আতলান্তিক চুক্তিকে যে ভাবেই চিত্রিত করিতে চেষ্টিত হোন না কেন, সোভিয়েট কিন্তু তাহাকে সংশ্লিষ্ট শক্তিসমূহের রুশ-বিরোধী অভিযান ব্যতীত অন্য কোনভাবে গ্রহণ করে নাই এবং এই জন্যই নরওয়ে সম্পর্কে তাহার গভীর উদ্বেগ সঞ্জাত হইল : নরওয়ে এবং সোভিয়েট সীমান্ত পরস্পরের সহিত সংলগ্ন। এরূপ ক্ষেত্রে নরওয়ে যদি আতলান্তিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহার নৌ-বন্দর ও বিমানক্ষেত্রগুলি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ কর্তৃক সোভিয়েটের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনের অগ্রবর্তী ঘাঁটিরূপে ব্যবহৃত হইবে এমন আশঙ্কা

তাহার মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। সেই সংশয় ও শঙ্কার বশবর্তী হইয়াই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ নরওয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্মে একটি নোট প্রেরণ করিলেন, আতলান্তিক চুক্তি সম্বন্ধে তাঁহারা যেন অবিলম্বে তাঁহাদের মনোভাব ও সোভিয়েট সম্পর্কে উক্ত চুক্তির তাৎপর্য জ্ঞাপন করিয়া পাঠান। উত্তরে নরওয়ে গবর্ণমেণ্ট জানাইলেন, সমুদ্রতীরবর্তী দেশ হিসাবে নরওয়ের পক্ষে এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক; তাহা ছাড়া, সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদ যখন বিশ্বশান্তি রক্ষার পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণ শক্তিশালী নয়, তখন নিছক আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এইরূপ আঞ্চলিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া তাহার গত্যন্তর কোথায়! তবে কাহারও দ্বারা সোভিয়েটের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনের অগ্রবর্তী ঘাঁটিরূপে নরওয়েকে ব্যবহৃত হইতে দিবার কোনরূপ অভিপ্রায় যে নরওয়ে গবর্ণমেণ্টের নাই—একথাও তাঁহারা স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন। কিন্তু সে জবাব সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সন্তোষ বিধানে সমর্থ হইল না; সোভিয়েট কূটনৈতিক বিভাগ নরওয়ে গবর্ণমেণ্টকে বলিলেন, সোভিয়েটের সংশয় নিরসন কল্পে তাঁহাদের কর্তব্য সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সহিত একটি অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। অবশ্য সেরূপ কোন চুক্তি কার্যতঃ সম্পাদিত না হইলেও, সোভিয়েট কূটনৈতিক চাপের আশু ফল হইল ইহাই যে, আতলান্তিক চুক্তি সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনার পথে নরওয়েকে তাহার গতিবেগ সংযত করিতে হইল এবং স্বাক্ষরকারী অষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে নরওয়ে যদিও পূর্ব হইতেই অন্যতমরূপে পরিগণিত হইয়াছিল, তৎসত্ত্বেও আজ পর্যন্ত চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না।

নরওয়ে যখন এইরূপে সন্দেহ দ্বিধায় দোলায়মান, এমন সময় সুইডেনের পক্ষ হইতে তাহার ও ডেনমার্কের নিকট স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের আমন্ত্রণ আসিল এবং আলাপ আলোচনার

ফলে যে পাঁচটি সর্তে সম্মত হওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয়—তাহাদের মধ্যে পঞ্চম এবং সর্বশেষ সর্তটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ : প্রথম চারিটি সর্তে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, যে কোন একটি দেশ আক্রান্ত হইলে তাহা সমগ্র স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উপর আক্রমণরূপে গণ্য হইবে এবং সেক্ষেত্রে আক্রমণ প্রতিরোধের নিমিত্ত দেশরক্ষা পরিকল্পনা রচিত ও ও অনুসৃত হইবে যৌথভাবে। পঞ্চম সর্তে সাব্যস্ত হয়, দেশত্রয়ের যে কোন একটি আক্রান্ত হইলে, আত্মরক্ষার জন্য বাহির হইতে সাহায্য প্রার্থনা করা হইবে। বাহির বলিতে সোভিয়েটের প্রতি যে লক্ষ্য করা হয় নাই ইহা সুনিশ্চিত এবং তাহা যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, পশ্চিম ইউরোপীয় ব্লক এবং বিশেষ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই এই ইঙ্গিতের লক্ষ্য। কাজেই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া কর্তৃক আতলান্তিক চুক্তিপত্র যদিও অদ্যাপি স্বাক্ষরিত হয় নাই, তৎসত্বেও চুক্তির আদর্শ ও তাৎপর্য যে তাহাদের দ্বারা পঞ্চম সর্ত অনুযায়ী স্বীকৃত হইয়াই গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এইদিক হইতে বিচার করিলে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্র ত্রয়ের সম্ভাব্য অনাক্রমণ চুক্তির পঞ্চম ধারাটি আতলান্তিক চুক্তিতে উপনীত হইবার প্রাথমিক সোপানরূপে গণ্য হইবার যোগ্য।

উত্তর আতলান্তিক চুক্তি যে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে এক অতিপূর্ব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—ইহা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু প্রশ্ন হইল এই যে, ইহার দ্বারা তৃতীয় বিশ্ব সংগ্রামের সম্ভাবনা বিলম্বিত হইবে অথবা ত্বরান্বিত হইবে? ইতিপূর্বে যে স্বার্থবিরোধ ও শক্তি বিন্যাস পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বর্তমান চুক্তি তাহার পরিধি বিস্তৃত করিল পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধ অবধি। মার্শাল পরিকল্পনা সমরবিধ্বস্ত ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য আর্থিক আশীর্বাদ আনয়ন করিয়াছিল মাত্র। আতলান্তিক চুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ

হইতে তাহাদের নিমিত্ত সামরিক শক্তি পুনর্গঠনের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি লইয়া সমুপস্থিত। তাহা ছাড়া, চুক্তি সম্পাদন পর্ব এইখানেই পরিসমাপ্ত নয়: ভূমধ্যসাগরীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তিদ্বয় ইতিমধ্যে আলোচনাধীন। চুক্তি বন্ধনের এই বাহুল্য ও পৌনঃপুনিকতার দ্বারা যদি কোন কিছু সূচিত হয় তবে তাহা হইল—সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে শক্তিসমূহের স্নায়বিক সন্ত্রাস, আত্মশক্তির উপর অপ্রত্যয় এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস। শঙ্কা ও সংশয়াচ্ছন্ন আবহাওয়ার এই আবছা অন্ধকারে যে কোন তুচ্ছতম ঘটনা আশ্রয় করিয়াই যে কোন মুহূর্তে বিশ্ববিপর্যয় সংঘটিত হওয়া সম্ভব।

———

জাপানী শান্তি চুক্তি আলোচনা

জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন বহু দিন হইতে ইঙ্গ-মার্কিণ কর্তৃপক্ষের মনকে আন্দোলিত করিতেছে। বিশেষ করিয়া কম্যুনিষ্ট চীনের অভ্যুত্থানের পব সে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে অত্যন্ত জুরুরী আকারে।

জাপান নিজেও শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের আশু প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। জাপান ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন ১১৩টি রাজ্যের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে; এই সব দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য যাহাতে সত্বর ও সুচারুরূপে পরিচালিত হয়, তজ্জন্য কন্‌সাল নিযুক্ত করা আশু প্রয়োজন। অথচ শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের পরে স্বায়ত্তশাসনশীল দেশসুলভ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন না করিলে কনসাল নিয়োগের প্রশ্ন অবান্তর। অন্য কোন কারণে না হইলেও

অন্ততঃ এই জন্যই শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের আবশ্যকতা তাহার পক্ষে আশুলভ্য অধিকাররূপে দেখা দিয়াছে। এই কারণে জাপ প্রধান মন্ত্রী শিগেরু যোশিদা পার্লামেণ্টে তাঁহার গভর্ণমেণ্টের নীতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ভাষণ দিতে দাঁড়াইয়া বলেন :

"Japan's most fervent wish is the conclusion of a Peace Treaty at the earliest possible date." অর্থাৎ "যত সত্বর সম্ভব শান্তি-চুক্তি সম্পাদনই এখন জাপানের একান্ত কাম্য।"

কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিণ ও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের পারস্পরিক স্বার্থদ্বন্দ্ব ও তজ্জনিত পরস্পরবিরোধী কূটনৈতিক কর্মতৎপরতা চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনাকে বিলম্বিত ও বিঘ্নিত করিতেছে।—এই স্বার্থ-সংঘাত কেবলমাত্র ইঙ্গ-মার্কিণ ও সোভিয়েট ব্লকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিলে, তাহা সমাধানের অযোগ্য সমস্যারূপে বিবেচিত হইত না ; এই উক্তির সমর্থনে বার্লিন ও জার্মাণীর দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য : সেখানে ব্রিটিশ ও মার্কিণ স্বার্থ সমস্বার্থের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। কাজেই সোভিয়েট স্বার্থের বিরোধিতা সত্ত্বেও পশ্চিম জার্মাণ রাষ্ট্রগঠন ও পশ্চিম বার্লিনের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বিঘ্ন কিংবা বিলম্ব সৃষ্টি হয় নাই। সোভিয়েট প্রতিরোধ সত্ত্বেও ইঙ্গ-মার্কিণ কর্তৃপক্ষ সেখানে স্বচ্ছন্দে স্বতন্ত্র নীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং এক যোগে তাহা অব্যাহত গতিতে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু জাপানের ক্ষেত্রে, শুধু জাপান কেন, সমগ্র প্রাচ্য মহাদেশের বহু ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ ও মার্কিণ স্বার্থে আজ অনৈক্য রহিয়াছে ; তাই স্থানে স্থানে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে নীতিগত বিরোধ সংঘটিত হওয়া খুবই সম্ভবপর এবং কার্যতঃ হইতেছেও তাহাই। অন্যান্য নানা বিষয়ের মধ্যে কম্যুনিষ্ট চীনের রাষ্ট্রিক স্বীকৃতির প্রশ্ন লইয়া আলোচনার জন্য সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ কূটনীতিকগণের যে সম্মেলন সম্প্রতি সমাপ্ত হইয়া গেল, তাহাতে ব্রিটিশ

রাষ্ট্র-ধুরন্ধরগণ কর্তৃক কম্যুনিষ্ট চীনকে স্বীকার করিয়া লইবার সিদ্ধান্তই গৃহীত হইয়াছে এবং তাঁহারা সে সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ জ্ঞাপন করিয়াছেন। অথচ মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট এখন পর্যন্ত সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারেন নাই। অবশ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে কূটনীতিকগণের সুপারিশ এই মুহূর্তেই স্বীকার করিয়া লইবেন, তাহা নয়। আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ, জাপানের সহিত শান্তি চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি যে সব ব্যাপক বিচার-বিবেচনার উপর মার্কিণ স্বীকৃতি নির্ভরশীল, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনও তাহারই প্রতীক্ষায় প্রহর গণিবে। তথাপি, এই ব্যাপারের মধ্যে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঘটনা এই যে, ব্রিটিশ কূটনীতিকগণ মার্কিণ মতামত-নিরপেক্ষভাবেই কম্যুনিষ্ট চীনের স্বীকৃতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ইহাই প্রমাণিত করিলেন যে, ব্রিটিশ ও মার্কিণ নীতির সম্পর্ক ইউরোপে যাহাই হোক, এশিয়ায় সর্বক্ষেত্রে তাহা সুসঙ্গত নাও হইতে পারে।

জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদন ব্যাপারে এই মতদ্বৈধতাই আজ প্রকট হইয়া উঠিয়া তাহার সার্থক পরিণতির পথ কণ্টকিত করিতেছে। প্রথমতঃ সোভিয়েট বনাম ইঙ্গ-মার্কিণ বিরোধের কথাই আলোচনা করা যাক। সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ ভিসিনস্কি ইতিপূর্বেই তাঁহার প্রচারিত ঘোষণায় দাবী জানাইয়াছেন, জাপানের বুক হইতে দখলদার শক্তির নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রত্যাহার করিয়া লইয়া অবিলম্বে জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করা হোক এবং তাহা হোক কোন শক্তিবিশেষের একক উদ্যোগে নয়, পটস্‌ডাম চুক্তির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চতুঃশক্তি নিয়ন্ত্রণ পরিষদের মিলিত তত্ত্বাবধানে। সঙ্গে সঙ্গে এ দাবীও উত্থাপিত হইয়াছে, যেহেতু জাপানী শান্তি-চুক্তির সহিত চীনের ভাগ্য নিবিড়ভাবে জড়িত এবং যেহেতু সমগ্র চীন দেশের দুইতৃতীয়াংশের অধিক ভূখণ্ড চীনের নবগঠিত কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেণ্টের অধিকারে, অতএব চুক্তি সম্পাদন সম্বন্ধীয়

আলোচনায় উক্ত গভর্ণমেণ্টকে তাহার যথাযোগ্য স্থান দিতে হইবে। জাপান গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতেও জেনারেল ম্যাক্ আর্থারের নিকট এইরূপ অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে যে, সোভিয়েটকে বাদ দিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ কর্তৃপক্ষ যেন কেবলমাত্র তাঁহাদের নিজস্ব উদ্যোগে জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদনে অগ্রসর না হন; তাঁহাদের আশঙ্কা, বৃহৎ শক্তিচতুষ্টয় যদি জাপান সম্বন্ধে সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারেন এবং তাহার ফলে জাপান যদি বিরোধী ব্লকদ্বয়ের যে কোন একটির অধিকারভুক্ত দপ্তররূপে গণ্য রহিয়া যায়, তাহা হইলে জাপানকে অনিবার্যরূপে শক্তিব্লকের সংঘাতের মধ্যে পতিত হইতে হইবে; অস্ত্র-হীন, অসহায় ও অক্ষম জাপান আপনাকে সেই সাম্রাজ্যিক স্বার্থদ্বন্দ্বের ক্রীড়নকরূপে ব্যবহৃত হইতে দিতে প্রস্তুত নয়। জাপানের এই আশঙ্কা ও অসম্মতি নিতান্ত অযৌক্তিক নয় বটে, কিন্তু সোভিয়েটের দাবীর বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিণ কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েট যে কেবলমাত্র কোন অংশই গ্রহণ করে নাই তাহা নয়, পরন্তু ব্রিটেন এবং আমেরিকা যখন তাহার সহিত জীবনমরণ যুদ্ধে লিপ্ত, তখনও সোভিয়েট তাহার রাষ্ট্রিক স্বার্থ ও নিরাপত্তার অনুরোধে পূর্ব এবং পশ্চিম রণক্ষেত্রে যুগপৎ যুদ্ধে জড়িত হইবার ঝুঁকি এড়াইবার উদ্দেশ্যে অতিশয় সযত্নে জাপানের সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিতেছিল এবং অনাক্রমণ চুক্তির পবিত্র মর্যাদা পদদলিত করিয়া সে জাপানের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল মাত্র তখনই, আণবিক বোমার প্রহারে জর্জরিত হইয়া জাপান যখন আত্মসমর্পণের জন্য উদ্যত। এরূপ ক্ষেত্রে জাপানের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ব্যাপারে নৈতিক অথবা রাজনৈতিক কোনরূপ অধিকার সোভিয়েটের নাই, তাহা হইলে তাঁহাদের সে যুক্তি কি গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে?

তাহার পর কম্যুনিষ্ট চীনের কথা। জাপানের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত

আলোচনায় যুদ্ধকালীন সহযোগীদের অংশ গ্রহণ যদি অপরিহার্যই হয়, সে ক্ষেত্রেও কম্যুনিষ্ট চীনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবার অবকাশ কোথায়? বৃহৎ শক্তিচতুষ্টয় জাপানের সহিত যখন যুদ্ধরত, কম্যুনিষ্ট চীন তখনও জন্মলাভ করে নাই এবং চীনা জাতীয় সরকার যখন জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সহিত সংগ্রামরত, এমন কি, চীনের জাতীয় সত্তার সেই চরমতম দুর্দিনেও চীনা কম্যুনিষ্টগণ সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থচিন্তা সাময়িকভাবে বর্জন করিয়া জাতীয় বাহিনীর পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হয় নাই।

কাজেই জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদন প্রসঙ্গে চীনের কথা যদি উত্থাপিতই হয় তাহা হইলে সে প্রসঙ্গে জাতীয় চীনের নামই উত্থাপনযোগ্য প্রস্তাবরূপে বিবেচিত হওয়া উচিত।

নৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায্যান্যায্যতার কথা ছাড়িয়া দিলেও জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদন ব্যাপারে সোভিয়েটের অংশগ্রহণ সম্ভাবনা ইঙ্গ-মার্কিণ স্বার্থের পক্ষে অন্য দিক দিয়াও আশু-অনিষ্টকর। সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট চীনের মাধ্যমে প্রাচ্য ভূখণ্ডে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এক দিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং অপর দিকে দূরপ্রাচ্য অভিমুখে স্বীয় প্রভাব বিস্তৃত করিবার পথ সন্ধান করিতেছে। কাজেই জাপানে সে যদি কোনক্রমে তাহার অভিযানের সূচীমুখ প্রবিষ্ট করাইতে পারে, তাহা হইলে তাহার দূর প্রাচ্য-অভিমুখী গতি লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে পারিবে এবং শান্তি-চুক্তির সর্তানুযায়ী মার্কিণ অষ্টম বাহিনী জাপান হইতে অপসারিত হইলে সোভিযেট-প্ররোচিত জাপ-কম্যুনিষ্টগণের পক্ষে শাসনশক্তি করায়ত্ত করিবার পথ অধিকতর সুগম হইবে। সোভিয়েটের এ অভিসন্ধি সম্বন্ধে ব্রিটিশ ও মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট—উভয়েই সচেতন এবং তাহা ব্যর্থ করিবার জন্য উভয়েই সমপরিমাণ কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু তথাপি স্বতন্ত্র জাতীয় স্বার্থের অনুরোধে তাঁহারা সর্ববিষয়ে সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না।

কম্যুনিষ্ট চীনের অভ্যুত্থানের ফলে এশিয়ায় শক্তিসাম্যের ভারকেন্দ্র যেভাবে বিচলিত হইয়াছে, তাহাতে মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট মনে করেন, তাহাকে যদি পূর্ব সমতায় পুনঃসংস্থাপিত করিতে হয়, তাহা হইলে জাপানকে পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন এবং তাহা করিতে গিয়া তাহাকে কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিলে চলিবে না, মার্কিণ অভিভাবকত্ব প্রত্যাহৃত হইলে সে যাহাতে বহিরাক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ আঘাতের হাত হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, তাহাকে সেরূপ সামরিক সঙ্গতিও প্রদান করিতে হইবে। জাপানকে উদারতর গণতান্ত্রিক অধিকারের ভিত্তিতে স্থাপিত করিতে ব্রিটেনের অবশ্য অসম্মতি নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের সহিত এত দীর্ঘ পথ অগ্রসর হইতে সে অসম্মত এবং এই অসম্মতি দুইটি সংশয় হইতে সঞ্জাত: তাহার বিশ্বাস, এশিয়ার ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জাপানের পুনরভ্যুদয় নিঃসংশয়ে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতিকূল হইবে এবং তাহার সামরিক পুনঃসংগঠনের প্রস্তাব বর্তমানে আলোচনার অযোগ্য এই কারণে যে, গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি অনুরক্তি জাপানের জাতীয় জীবনের গভীর তলদেশে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই; তাহার নিতান্ত উপরিভাগ লঘু হস্তে স্পর্শ করিয়াছে মাত্র। কাজেই অবাধ সামরিক সংগঠনের অবকাশ পাইলে জাপানী সাম্রাজ্যলিপ্সা পুনরায় জীবিত ও জাগ্রত হইয়া উঠিবে। জাপান সম্বন্ধে ব্রিটিশ সংশয়ের ইহাই হইল যুক্তি, এতদ্ব্যতীত মার্কিণ সম্পর্কেও তাহার মন সংশয়মুক্ত নয়; সে সংশয় হইতেছে এই যে, মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট জাপানকে আশ্রয় করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং বিশেষ করিয়া সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে আপন প্রভাবের পরিধি বিস্তৃত করিতে চান, অথচ মধ্যপ্রাচ্যেই আজ ব্রিটিশ কূটনৈতিক সতরঞ্চের প্রধান আসর আস্তৃত। কাজেই মার্কিণ প্রতিযোগিতার আঘাতে পরাস্ত হইয়া তাহাকে যদি সেখান হইতে আসর গুটাইতে হয়, তাহা হইলে সমগ্র এশিয়ার

বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতেই তাহাকে অচিরে বিদায় লইতে হইবে। ব্রিটেনের পক্ষে এই আত্মসঙ্কোচনের সম্ভাবনা স্বচ্ছন্দচিত্তে মানিয়া লওয়া সম্ভব নয়।

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ক্যানবেরা কমনওয়েলথ কনফারেন্সে জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই কারণে আজও তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। উক্ত সম্মেলনে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এশিয়ার রাজনীতিক্ষেত্রে জাপানকে এরূপ কোন নেতৃত্বের ভূমিকা অভিনয় করিতে দেওয়া হইবে না, যাহার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের স্বার্থহানি সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর।

এই ইঙ্গ-মার্কিণ মতবিরোধের অবসান ঘটাইবার জন্য ইতিপূর্বে একাধিক বার চেষ্টা হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্রিটিশ কমিশনার জেনারেল মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড ও জেনারেল ম্যাক আর্থারের সহিত টোকিওতে এই প্রসঙ্গ লইয়াই আলোচনা হয় এবং বেভিন-একিসন সাক্ষাৎকারে ইহাই ছিল মূল আলোচ্য বিষয়। কিন্তু উচ্চতম কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত এই দুইটি আলাপ-আলোচনার ফলেও ইঙ্গ-মার্কিণ মতবিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে সিংহলে ক্যানবেরা কনফারেন্সের যে অসমাপ্ত অধিবেশন আহূত হইবার কথা আছে, সম্ভবতঃ তাহাতেও ইহাই প্রধান আলোচ্য বিষয়রূপে উপস্থাপিত হইবে। দেখা যাইতেছে, এক দিকে ইঙ্গ-মার্কিণ মতবিরোধ এবং অপর দিকে সোভিয়েটের সহিত তাহাদের যুক্ত মতদ্বৈধতা জাপানের সহিত চুক্তি সম্পাদনের পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান। ব্রিটিশ এবং মার্কিণ গভর্ণমেণ্টকে ত্বরায় হোক অথবা বিলম্বে হোক, সে মতবিরোধ সম্পর্কে মীমাংসায় উপনীত হইতেই হইবে এবং যে কোন মূল্যে তাঁহারা তাহা হইবেনও; কিন্তু সোভিয়েটের সহিত মতদ্বৈধতা কেবলমাত্র স্বার্থগত

নয়, তাহা আদর্শগত ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। কাজেই সে সম্পর্কে মীমাংসায় উপনীত হইবার মত সাধারণ ভিত্তিভূমি কোথায় ?

এই অসম্ভাব্যতার কথা উপলব্ধি করিয়াই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে রাশিয়াকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র ইঙ্গ-মার্কিণ উদ্যোগেই স্বতন্ত্রভাবে শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিণ কর্তৃপক্ষ ততদুর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হইবেন কি ?

ত্রিয়েস্ত সমস্যা

আড্রিয়াতিক সাগরের তীরবর্তী ত্রিয়েস্ত সহর ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রে সহসা গুরুত্বপূর্ণস্থান গ্রহণ করিয়াছে : যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স, রাশিয়া এবং ইতালির নিকট এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন যে, স্বাধীন নগরী ত্রিয়েস্ত ইতালীর হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। ফরাসী ও ইতালীর মধ্যে শুল্ক চুক্তি স্বাক্ষর কালে উপস্থিত উভয় দেশীয় প্রতিনিধিদলের সম্মুখে এ সংবাদ সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব এম, জর্জেস বিদো। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে এবং সম্পূর্ণ নাটকীয় ভঙ্গীতে তিনি বলেন, "ইতালীয় জনসাধারণের জন্য আমি একটি আশার ও আনন্দের সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছি"। এইরূপে কৌতূহল জাগ্রত করিবার পর উৎকর্ণ প্রতিনিধিবর্গের সম্মুখে মঃ বিদো এই শুভ সংবাদ ব্যক্ত করেন। এইস্থানে ত্রিয়েস্ত পরিস্থিতির কিঞ্চিত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও ত্রিয়েস্ত ছিল ইতালীর অধিকারভুক্ত সহর, কিন্তু যুদ্ধে তাহার পরাজয় ও আত্মসমর্পণের পর অন্যান্য ইতালীয় অধিকারের সহিত ত্রিয়েস্তও তাহার হস্তচ্যুত হয়।

কাজেই ইতালির সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদন সম্বন্ধীয় আলোচনাকালে ত্রিয়েস্তের ভাগ্য পররাষ্ট্র মন্ত্রি-সম্মেলনের বিচারাধীনে আসে। আমেরিকা, ফ্রান্স ও বৃটেনের প্রতিনিধিগণ তখন অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ত্রিয়েস্তে যেহেতু ইতালীয় অধিবাসীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, সেই কারণে তাহা ইতালির অধিকারে থাকাই বাঞ্ছনীয়। ত্রিশক্তির সমর্থন দ্বারা উৎসাহিত হইয়া ইতালি ত্রিয়েস্তের উপরে তাহার একচ্ছত্র অধিকারের দাবী উপস্থাপিত করিল। অপর দিক হইতে যুগোশ্লাভিয়া দণ্ডায়মান হইল তাহার একচেটিয়া অধিকারের দাবী লইয়া। বলা বাহুল্য যুগোশ্লাভিয়ার দাবীর পশ্চাতে সোভিয়েটের সক্রিয় সমর্থন বিদ্যমান ছিল। তাই সে দাবী উপেক্ষা করা ত্রিশক্তির পক্ষে সম্ভব হইল না। সঙ্কট এড়াইবার উদ্দেশ্যে আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স তখন এই মর্মে এক বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন যে, এমন এক ষ্ট্যাটিউট বলে ত্রিয়েস্ত ও তাহার সন্নিহিত অঞ্চলকে স্বাধীন নগরীরূপে ঘোষণা করা হোক। সংশ্লিষ্ট শক্তিবর্গ যাহার প্রভাবে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীগণের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে বাধ্য থাকিবেন। এই বিকল্প প্রস্তাবে উভয় পক্ষই সম্মত হইলেন, কিন্তু তখন সমস্যা দাঁড়াইল গভর্ণর নির্বাচন লইয়া। অবশেষে আলোচনান্তে স্থির হইল, যতদিন না নির্বাচিত গভর্ণর আসিয়া কর্তব্যভার গ্রহণ করেন ততদিনের জন্য বৃটেন ও আমেরিকার সামরিক-বাহিনী সহরের উত্তরাঞ্চল শাসন করিবেন এবং দক্ষিণাঞ্চল থাকিবে যুগোশ্লাভিয়ার সামরিক কর্তৃপক্ষের শাসনাধীনে। মূল সমস্যাটীর সমাধান হইয়া যাইবার পর গভর্ণর নির্বাচন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রশ্নের মীমাংসা হইতে বিলম্ব হইবে না। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ তখনই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, একদিকে ইঙ্গ-মার্কিণ ও ফরাসী এবং অপর দিকে সোভিয়েট রাশিয়া— পরস্পর বিরোধী এই দুই প্রভাবের অধীনে ইউরোপ পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপে বিভক্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা অনিবার্য। এরূপ অবস্থায়

ত্রিয়েস্ত সমস্যার সন্তোষজনক ও আশু সমাধান যদি না হয়, তাহা হইলে উভয় ইউরোপের সীমান্তবর্তী স্থানে অবস্থিত রহিয়া ত্রিয়েস্তকে যে বিরোধী পক্ষদ্বয়ের চিরন্তন মল্লক্ষেত্ররূপে বিরাজ করিতে হইবে একথা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় নাই। ত্রিয়েস্ত সমস্যার সত্বর ও সহজ সমাধানের ইহাই হইল সার কথা।

কিন্তু ইহার কিছুদিন পর হইতেই ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষ হইতে এই অভিযোগ দিনে দিনে উচ্চতর কণ্ঠে বিজ্ঞাপিত হইতে থাকে যে, যুগোশ্লাভিয়া তাহার সাময়িক শাসনাধীন অঞ্চলকে অতি দ্রুত আত্মস্থ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি, উভয় ইউরোপের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া ত্রিয়েস্তের সামরিক গুরুত্ব অত্যধিক। এরূপ ক্ষেত্রে অর্দ্ধ ত্রিযেস্ত যুগোশ্লাভিয়ার দ্বারা কবলিত হইতে দিতে বৃটেন ও আমেরিকা অত্যন্ত সঙ্গত কারণেহ সম্মত নহেন, কারণ যুগোশ্লাভিয়ার কর্তৃত্ব কার্যতঃ সোভিয়েট কতৃত্বেরহ নামান্তর মাত্র। তাই ইতালির অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য হস্তে ত্রিয়েস্ত প্রত্যর্পণ করিতে তাঁহারা ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা অবশ্য ত্রিযেস্ত সমস্যার একটা সাধারণ ও দূরপ্রসারী দিক; ইহা ব্যতীত তাহার একটা বিশিষ্ট ও আশু-প্রয়োজনীয় দিকও আছে। সে দিক হইল ইতালীর আসন্ন সাধারণ নির্বাচন। পশ্চিম ইউরোপের কমিউনিষ্ট প্রভাবিত ফ্রান্স এবং ইতালি শক্র শিবিরেব অভ্যন্তরে তাহার অগ্রবর্তী দুইটি ঘাঁটি স্বরূপ, কাজেই ইতালির সাধারণ নির্বাচন ব্যাপারের সহিত সোভিয়েটের স্বার্থ সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া, ইতালীয় কমিউনিষ্টগণ আশা করেন,বামপন্থী সোস্যালিষ্টদলের সহযোগিতায় আগামী নির্বাচনে তাঁহাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত। তথাপি নিশ্চয়তাকে নিশ্চিততর করিবার উদ্দেশ্যে ইতালীয় জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য সোভিয়েট নাকি ইতালীয় নৌবাহিনীর উপর যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ তাহার অতিরিক্ত দাবী প্রত্যাহার করিয়াছে। ইহারই

পাল্টা ব্যবস্থারূপে ইঙ্গ-মার্কিণ কর্তৃক ইতালির হস্তে ত্রিয়েস্ত প্রত্যর্পনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, কাজেই ত্রিয়েস্ত কার্যতঃ উভয়পক্ষের কূটনৈতিক জলক্রীড়ার পণরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। যুগোশ্লাভিয়া অবশ্য তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যথারীতি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া পাঠায়। কিন্তু পরে বিশেষ বিচার বিবেচনার পর সে প্রস্তাব করে—প্রায় ষোল মাস পূর্বে একদিকে মার্শাল টিটো এবং অপরদিকে ইতালির কমিউনিষ্ট নেতা তোগলিয়াত্তির মধ্যে ত্রিয়েস্ত সম্পর্কে চুক্তিমূলক যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহার ভিত্তিতে পুনরায় আলাপ আলোচনা আরম্ভ করিতে যুগোশ্লাভিয়া প্রস্তুত; তখন উভয় পক্ষের মধ্যে এইরূপ বোঝাপড়া হয় যে, ইতালি গোরিজিয়ার বিনিময়ে ত্রিয়েস্ত ফিরিয়া পাইতে পারে। অবশ্য সেদিনের সে আলাপ আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু এ প্রস্তাবও অন্য পক্ষেব নিকট হইতে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা লাভ না করার দরুণই হোক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক আলোচনাক্ষেত্রে স্থায়িত্ব লাভ করিল না। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, যুগোশ্লাভিয়া এ সম্পর্কে তাগার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিয়া বলিয়াছে, ত্রিযেস্তের উপর তাহাব দাবী সে কোন কারণেই পরিহার করিতে প্রস্তুত নয। ইতালীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সাধাবণ সম্পাদক সিনর তোগলিয়াত্তি এ ব্যাপাব সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া বলেন, ইহা ইতালিকে যুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য ইঙ্গ-মার্কিণের এক দুরভিসন্ধিমূলক কূটকৌশল মাত্র এবং যে উপায়েই হোক ইতালির কল্যাণেই ইহা ব্যর্থ করিতে হইবে; তাঁহার মতে, ইতালিতে যুগোশ্লাভিয়ার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন স্থায়ী গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইবার পূর্বে ত্রিয়েস্ত সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা অন্যায় ও অযৌক্তিক।

এদিকে প্রত্যর্পণ সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিয়েস্তের ইতালীয় অধ্যুসিত অঞ্চল পুষ্পে-পত্রে ও পতাকায় সজ্জিত হইয়া উৎসব ক্ষেত্রের আকার ধারণ করে: তাহাদের হস্তচ্যুত অধিকার এতদিন পরে পুনরায়

তাহাদের হাতে ফিরিয়া আসিতেছে, তজ্জন্য ইতালীয়গণের আনন্দ-উল্লাস খুবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। তথাপি ইতালির সম্মুখে দুইটী বিকল্প প্রস্তাব এককালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে : একদিকে ইঙ্গ-মার্কিণ কর্তৃক ত্রিয়েস্ত প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত এবং অপরদিকে সোভিয়েট কর্তৃক ইতালির নৌবাহিনীর উপর তাহার অতিরিক্ত দাবী প্রত্যাহারের প্রস্তাব : এই উভয় প্রস্তাবের মধ্যে যে কোন একটী চূড়ান্তভাবে তাহাকে বাছিয়া লইতে হইবে। অবশ্য ইহা বলাই বাহুল্য যে, প্রথম প্রস্তাবটীই ইতালি কর্তৃক সরকারীভাবে গৃহীত হইবে। কিন্তু ঘটনার পরিসমাপ্তি এইখানেই নয়, আরও দুইটী আশু লভ্য ইতালির জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে : সম্ভবতঃ এরিত্রিয়া ও ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডও ইতালির অছিগিরির অধীনে আসিবে এবং অচিরে উনোর সদস্য নির্বাচিত হইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দরবারে সে পাংক্তেয় হইবে। ইতিপূর্বে আর একবার উনোর আসরে সে প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, সোভিয়েট তাহার বিরুদ্ধে ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া বলে, বুলগেরিয়া ও রুমেনিয়াকে সদস্য নির্বাচন করা হইলে ইতালির নির্বাচনে তাহার কোন আপত্তি নাই। তখন পর্যন্ত সোভিয়েট তুষ্টির প্রয়োজন ছিল, তাই ইংলণ্ড ও আমেরিকা বাহ্যতঃ নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্য বশেই সে প্রস্তাব লইয়া আর বেশী পীড়াপীড়ি করে নাই। কিন্তু আজ সে প্রয়োজন নিঃশেষে ফুরাইয়া গিয়াছে, সুতরাং সৌজন্য ও চক্ষুলজ্জার আজ তার কোনই অবকাশ নাই। বর্তমানে একদিকে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা এবং অপরদিকে যুগোশ্লাভিয়া—প্রত্যেকের পাঁচ হাজার করিয়া সৈন্য ত্রিয়েস্তের স্ব স্ব অঞ্চল অধিকার করিয়া বসিয়া আছে : এখন প্রশ্ন হইল, প্রত্যর্পণ সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত হইবার সময় তাহারা কি নীরব ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা অভিনয় করিবে? ভবিতব্যতাই তাহার সাক্ষ্য দিবে।

———

চেকোশ্লোভাকিয়ার শাসনতান্ত্রিক পট পরিবর্তন

চেকোশ্লোভাকিয়ার বর্তমান ন্যাশনাল ফ্রণ্ট গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। নির্দলীয় দেশরক্ষা সচিব জেনারেল লুডভিক এবং এম্. নোসেক নামক অপর আর একজন মন্ত্রী যুক্ত বিবৃতি প্রচার দ্বারা এই বিদ্রোহ প্রচেষ্টার কথা জনসাধারণের গোচব করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচারিত বিবৃতিতে প্রকাশ, এই ষড়যন্ত্রে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছেন জেনারেল ল'র অনুচরবর্গ ঃ স্মরণ থাকিতে পারে লণ্ডনস্থ প্রবাসী চেক্ গভর্ণমেণ্টের বিরোধিতা করিতে গিয়া জেনারেল ল একদা পদচ্যুত হন। কিন্তু পরে কমিউনিষ্ট দেশ-রক্ষা সচিব ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক যে তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা আরও ব্যাপক ও গভীর ঃ তাঁহাদের মতে এম্. ব্রাভোমীর রাইহি এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক এবং ইতালিস্থ পোল বাহিনীর প্রাক্তন অধিনায়ক জেনাবেল অ্যাণ্ডার্স তাঁহার সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। শুধু তাহাই নয়, সোস্থালিষ্ট পার্টি, পিপ্‌লস পার্টি ও শ্লোভাক ডিমোক্রাট-কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাব এই তিনটি দক্ষিণপন্থী দলের বিরুদ্ধেও তাহারা গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। কমিউনিষ্ট প্রধান মন্ত্রী গট্‌ওয়ালড বলেন, প্রতিক্রীয়াশীল দলত্রয়ের ষড়যন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য হইল, দেশের দ্রুত সমাজ সংস্কার, সোভিবেট মৈত্রী এবং আগামী সাধারণ নির্বাচন। ইহা হইতেও যে গুরুতর অপরাধে তিনি দল তিনটীকে অভিযুক্ত করিয়াছেন—তাহা হইল এই যে, তাঁহারা সোভিয়েটের বিরুদ্ধে প্রেরিত বৈদেশিক গুপ্তচরকে চেকোশ্লোভাকিয়ার অভ্যন্তরে আশ্রয়দান করিয়াছেন এবং ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার পর তৎ সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্যে বাধাসৃষ্টি করিয়াছেন। মন্ত্রিসভার ত্রিদলীয় প্রতিনিধিগণ এই অভিযোগের প্রতিবাদে পদত্যাগ

পত্র পেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের পদত্যাগ পত্র এখনও গৃহীত হয় নাই, হইবার পর মন্ত্রিসভা কার্যতঃ কমিউনিষ্ট পার্টির করায়ত্ত হইবে এবং একমাত্র সোস্যাল ডিমোক্র্যাটিক দল ছাড়া ক্যাবিনেটে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব রহিবে না।

এই সূত্রে বর্তমান মন্ত্রিসভা গঠনের সংক্ষিপ্ত একটু ইতিহাস প্রদান অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রায় সাড়ে ছয় বৎসর নির্বাসিত জীবন যাপন করিবার পর লণ্ডনস্থ প্রবাসী চেকোশ্লোভাক গভর্ণমেণ্টের সভাপতি ডাক্তার বেনেস গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ সহ শত্রুকবলমুক্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ৯৪৫ সালের ৩রা এপ্রিল তারিখে। আসিবার পথে ডাক্তার বেনেস মস্কোতে গিয়া উপনীত হন এবং তথায় মার্শাল ষ্ট্যালিনের সহিত পরামর্শক্রমে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইল ৭ই এপ্রিল তারিখে এবং তাহা হইবার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনস্থ জাতীয় রক্ষা পরিষদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। চেকোশ্লোভাকিয়ায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল ১৯৪৬ সালের ২৬শে মে তারিখে, ১৯৩৫ সালের পর ইহাই প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টি বিজয় লাভ করিল বোহিমিয়া ও মোরাভিয়ায় এবং ক্রিশ্চান ডিমোক্র্যাট দল শ্লোভাকিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল। নির্বাচন শেষে দেখা গেল, পরিষদে বামপন্থী দল সমূহের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোয়ালিশন ক্যাবিনেট গঠনের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলি এক সাধারণ সভায় মিলিত হইলেন এবং আলোচনা শেষে সাব্যস্ত হইল, ডাক্তার বেনেস হইবেন নবগঠিত কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্টের সভাপতি এবং প্রধান মন্ত্রীরূপে মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন কমিউনিষ্ট নেতা গট্‌ওয়াল্ড। প্রধান মন্ত্রী ২০শে জুলাই তারিখে মস্কোতে উপনীত হইয়া উভয় রাষ্ট্রের সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সমস্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিত হাঙ্গারীর সন্ধি সর্তের প্রস্তাব রচিত হইল এবং

ইহাও সাব্যস্ত হইল যে, সোভিয়েট অধিকৃত জার্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার চেকোশ্লাভাকিয়ার সম্পত্তি, বিমান ও রেল চলাচলের ব্যবস্থা এবং ব্রুক্সে কৃত্রিম উপায়ে তৈল প্রস্তুতের জার্মাণ কারখানা চেকোশ্লোভাকিয়ার হস্তে অর্পণ করা হইবে।

এদিকে দক্ষিণপন্থী দলত্রয়ের দ্বাদশজন মন্ত্রীর পদত্যাগ পত্র সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এখনও স্থগিত রহিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ গট্‌ওযাল্‌ড পদত্যাগ পত্র গ্রহণের জন্য সভাপতির নিকট পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছেন, অন্যথায় নিজে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিবেন এরূপ অভিপ্রায় ইঙ্গিত করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। পাঁচটী প্রধান শিল্পকেন্দ্রের প্রতিনিধি স্থানীয শ্রমিক নেতৃবৃন্দ সভাপতির সহিত সাক্ষাৎ কবিষা বলিষাছেন, সাধারণ এক মহতী জনসভায এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, পদত্যাগকারী মন্ত্রিদেব পদত্যাগপত্র যেন অবিলম্বে গ্রহণ করিয়া, দায়িত্বপূর্ণপদ হইতে তাঁহাদিগকে অপসাবিত করা হয। অকমিউনিষ্ট মন্ত্রিদেব অপসাবণের জন্য এই অশোভন দ্রুততা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ঘটনার গতি কোন পথে। বিশ্বময যে দুইটী মত ও পথ পরস্পরের বিরুদ্ধে সজ্জিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় আজ তাহারই আসর আস্তীর্ণ: একদিকে গণতন্ত্র এবং অন্যদিকে সাম্যবাদ এখানে একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘাতশীল হইয়া উঠিয়াছে; সাম্যবাদ তাহার স্বভাবধর্ম্মবশে চাহিতেছে দলীয় একনাযকত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে এবং গণতন্ত্র আয়োজন করিতেছে তাহার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার, এই বিপ্লব প্রচেষ্টা ও তাহার দমন ব্যবস্থার মধ্যে এই তত্ত্বই নিহিত রহিয়াছে। কমিউনিষ্ট প্রধান মন্ত্রী মিঃ গট্‌ওয়াল্‌ড তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমস্যার স্বরূপ ও তাহা সমাধানের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব সভাপতির নিকট প্রেরণ করেন। প্রধান মন্ত্রী আশা করিয়াছিলেন, সমাধান প্রস্তাবে স্বাক্ষর করা ছাড়া সভাপতি মহাশয়ের আর কিছু

করণীয় নাই। কিন্তু ডাক্তার বেনেস তাহা করিলেন না, সমস্ত দিক হইতে দেখিয়া সমস্যার সামগ্রিক রূপটী উপলব্ধি করিতে ও বাদীপক্ষের নিকট উপস্থাপিত করিতে প্রয়াসী হইলেন। প্রধান মন্ত্রীর প্রস্তাবের উত্তরে ডাক্তার বেনেস কর্তৃক লিখিত পত্রখানি তত্ত্ব ও তথ্যের দিক দিয়া অতিশয় মূল্যবান। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, অবস্থা নিঃসন্দেহে গুরুতর এবং যে সমস্ত শক্তিশালী উপাদানের সাহায্যে সে অবস্থা গড়িয়া উঠিতেছে তাহাদের সঙ্কট সৃষ্টির ক্ষমতাও তিনি অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টিতে সমস্যাটিকে নিরীক্ষণ করা অথবা তাঁহার প্রস্তাবিত সহজ সমাধান মানিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই; কারণ, তাঁহার প্রস্তাবিত উপায়ে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে গেলে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট দলীয় ও নির্দলীয় দুই এক জন ব্যক্তি ব্যতীত মন্ত্রি-পরিষদে অপর কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির স্থান হইত না এবং তাহার ফলে কমিউনিষ্ট পার্টির দলীয় একনায়কত্বই প্রতিষ্ঠিত হইত। ডাক্তার বেনেস বলেন, গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি তাঁহার অবিচল নিষ্ঠা সে পথের পরিপন্থী। তাঁহার মতে গণতন্ত্রই একমাত্র নীতি—যাহা শ্রেষ্ঠতর ও সমৃদ্ধতর জীবন গঠন করিবার নিমিত্ত স্থায়ী ভিত্তি রচনা করিতে সক্ষম। অতঃপর ডাক্তার বেনেস অত্যন্ত বেদনার সহিত প্রধান মন্ত্রীকে স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন, যেসব রাজনৈতিকদল ন্যাশনাল ফ্রন্টের সাধারণ মঞ্চে একদা মিলিত হন, গণতান্ত্রিক নীতিকে স্বীকার করিয়া লইয়াই তাঁদের মিলন সম্ভবপর হয় এবং সমবেতভাবে তাঁহারা যে সাম্যবাদ স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত হন তাহা শুধু এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যে, গণতন্ত্র সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই আপনাকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করিবার সুযোগ লাভ করিবে। ডাক্তার বেনেসের বিশ্বাস, ন্যাশনাল ফ্রন্টের সাধারণ মিলন মঞ্চের নিম্ন হইতে মূলনীতির এই ভিত্তি যদি অপসারিত হয়, তাহা হইলে সে মঞ্চ একেবারে

ধ্বসিয়া পড়িবে এবং তৎসহ শাসন ও সমাজ ব্যবস্থাও সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইবে। তাই জাতীয় জীবনের সঙ্কটতম মুহূর্তে সভাপতি প্রধান মন্ত্রীর নিকট এই নীতির মর্যাদা রক্ষার জন্য আবেদন জানাইযাছেন এবং নির্ভুল ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের সুষ্ঠু সমাধান কেবল মাত্র এই পথেই সম্ভব।

কিন্তু সভাপতি ডাক্তার বেনেসের এই উদার ও আন্তরিক আবেদন প্রধান মন্ত্রীর অন্তর স্পর্শ করিল না; তিনি সভাপতি মহাশয়কে সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন, হয সভাপতিকে তাঁহার প্রস্তাবিত সমাধান স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, নয় দেশব্যাপী সাধারণ ধর্ম্মঘটের সম্মুখীন হইতে হইবে। ডাক্তার বেনেস প্রমাদ গণিলেন, আশ্রয এবং আশ্বাসের জন্য একবার চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, চেকোশ্লোভাকিয়ার জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটী ক্ষেত্র ইতিমধ্যে কমিউনিষ্টদিগের কবলিত হইয়াছে। কাজেই মিঃ গট্ওয়াল্ডের সমাধান প্রস্তাব বিনা সর্তে গ্রহণ করিয়া লওয়া ছাড়া অসহায় ডাক্তার বেনেসের পক্ষে গত্যন্তর রহিল না; ফলে চেকোশ্লোভাকিয়ার চব্বিশ জন সদস্য লইয়া নূতন মন্ত্রি-পরিষদ গঠিত হইল, তাহা নামে সর্ব্বদলীয় হইলেও, কার্যতঃ কমিউনিষ্ট পার্টির দলীয় একনায়কত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। নূতন মন্ত্রিসভা পরিষদ ভবনে আসন গ্রহণ করিলে সরকারী শাসন ব্যবস্থার সর্ব বিভাগে অকমিউনিষ্ট কর্মচারিগণের বিতাড়ণ-কার্য ব্যাপক আকারে সুরু হইয়া গেল। যুদ্ধকালে জার্মাণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লাউডস্পীকার সমূহে কমিউনিষ্ট পার্টির বিজয়-সঙ্গীত মহোল্লাসে বাজিয়া উঠিল।

ঘটনার অবাঞ্ছনীয় পরিণতি দেখিয়া বৃটেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্স বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ত্রিশক্তি কর্তৃক প্রচারিত মিলিত বিবৃতিতে তাঁহারা বলিলেন, চেকোশ্লোভাকিয়ার শাসন সঙ্কট কৃত্রিম উপায়ে এবং অত্যন্ত সুকৌশলে গড়িয়া তুলিয়া কমিউনিষ্টগণ সেখানে সেই কর্মনীতিরই

প্রয়োগ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—পৃথিবীর আরও অনেক স্থানে যাহার কার্যকারিতা ইতিপূর্বে বহুবার পরীক্ষিত। তাহার ফলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটিল এবং ন্যাশনাল ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের ছদ্মাবরণে যে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা বিশুদ্ধ দলীয় একনায়কত্ব। উপসংহারে বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, "চেকোশ্লোভাকিয়ার যে জনসাধারণ বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে স্বাধীনতার প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক অণুরাগ আর একবার প্রমাণিত করিয়াছেন, বর্তমান ব্যবস্থা তাঁহাদের স্বার্থের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর না হইয়াই পারে না। ত্রিশক্তি ঘটনার এই অবাঞ্ছনীয় পরিণতির বিরুদ্ধে নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন"। আসন্ন দুর্যোগ আপাততঃ ভাঙ্গিয়া পড়িল না বটে, কিন্তু বোহিমিয়ার আকাশ তথাপি মেঘ-মুক্ত নয়।

গ্রীসের গৃহযুদ্ধ

গ্রীসীয় গরিলাবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মার্কোসের নেতৃত্বে সম্প্রতি উত্তর গ্রীসে একটি বিদ্রোহী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। গত ২৪শে ডিসেম্বর অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের হেডকোয়ার্টার হইতে এই সংবাদ বেতার যোগে ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীস আলবেনিয়া সীমান্তবর্তী কোনিৎজা সহরের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ সুরু হয়। সরকারী সেনাবাহিনী তৎপরতার সহিত অগ্রসর হইয়া অগ্রগামী গরিলাবাহিনীর গতিরোধ করিয়াছে এবং সর্বশেষ সংবাদ হইতে জানা যায়, তাহাদিগকে কিছুদূর

ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। উভয় বাহিনীর অবস্থা ও অবস্থানগত সুখ-সুবিধার তুলনামূলক বিচার করিয়া দেখিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে নৈতিক ও বাস্তব দিক দিয়া সরকারী সেনাদল সবিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত। গরিলাবাহিনী গ্রীস আলবেনিয়া সীমান্তে গ্রীসের মাত্র কয়েক মাইল অভ্যন্তরে ঘাঁটী গাড়িয়াছে। সরকারী বাহিনীর চাপে তাহারা সচ্ছন্দে পশ্চাদপসরণ করিয়া আলবেনিয়া সীমান্তে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করে, কিন্তু আলবেনিয়া রাজ্যের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কায় সরকারী বাহিনী তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিতেছে না; ফলে সরকারী সেনাদল আলবেনিয়া সীমান্তবর্তী অঞ্চল হইতে যে মুহূর্তে পিছু হাটিতেছে, গরিলা বাহিনী তদ্দণ্ডে আগাইয়া আসিতেছে তাহাদের পূর্ব পরিত্যক্ত ঘাঁটীতে। শুধু তাহাই নয়, কোনিৎজা সহরের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের প্রত্যুত্তরে সরকারী গোলন্দাজ বাহিনী সচ্ছন্দচিত্তে পাল্টা গোলাবর্ষণ পর্যন্ত করিতে পারিতেছে না, পাছে নিক্ষিপ্ত গোলা আলবেনিয়া রাজ্যের অভ্যন্তরে পতিত হইয়া আলবেনিয়ার নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে। গ্রীক গভর্ণমেণ্ট যতক্ষণ অন্তর্বিপ্লব দমনের কার্যে ব্যস্ত, অন্ততঃ ততক্ষণ পর্যন্ত বহিঃশত্রু সৃষ্টি করিয়া, অথবা রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিলতর করিয়া বিপদের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত নহেন। ভারতবর্ষে কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্থান রাষ্ট্রের মধ্যবর্তিতার দরুণ হানাদারদের সম্বন্ধে ভারতীয় ইউনিয়নের যে সঙ্কোচ, গ্রীসে আলবেনিয়া রাজ্যের অন্তর্বর্তিতা হেতু বিপ্লবী সেনাবাহিনী সম্পর্কে গ্রীস গভর্ণমেণ্টের মনোভাব অনুরূপ সঙ্কোচের দ্বারা শাসিত ও সীমাবদ্ধ।

গ্রীসে বিদ্রোহী গভর্ণমেণ্ট গঠনে ও পরিচালনে উদ্যোগী হইয়াছেন প্রাক্তন প্রতিরোধ বাহিনীর নায়কগণ ও কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ। গভর্ণমেণ্ট গঠনের সংবাদ ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী পুলিশবাহিনী অত্যন্ত তৎপরতার সহিত এথেন্স ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল তন্ন তন্ন করিয়া

তল্লাসী করিবার পর প্রায় পাঁচ শতাধিক কমিউনিষ্টকে গ্রেপ্তার করে। বিদ্রোহী গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের উদ্দেশ্য ঘোষণা প্রসঙ্গে বেতারযোগে বিজ্ঞাপিত করেন যে, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ ও তস্য অনুচরদের প্রভাব হইতে গ্রীসের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে মুক্ত করাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। এই বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যে কে—সে সম্পর্কে কোনরূপ গোপনীয়তা অবলম্বন না করিয়া তাঁহারা বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপীয় 'পপুলার ডিমোক্রেসী' সমূহের বিরুদ্ধে গ্রীসকে অতি দ্রুত রাজনৈতিক ও সামরিক ঘাঁটীতে পরিণত করিতে চাহিতেছে। উদ্দেশ্য অতিশয় স্পষ্ট: একদিকে মার্শাল প্ল্যানকে আশ্রয় করিয়া পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিসমূহ যখন ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বে দ্রুত সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে, সোভিয়েট তখন তাহার প্রতিষেধ ব্যবস্থা স্বরূপ কোমিনফর্মের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপের শক্তিগুলিকে সজ্জিত ও সচেতন করিয়া তুলিতেছে। গ্রীসে বিদ্রোহী গভর্ণমেণ্ট গঠন যে প্রত্যক্ষভাবে সোভিয়েট প্রভাব ও প্ররোচনায় সম্ভব হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। গ্রীসের বর্তমান গৃহযুদ্ধ যে স্পষ্টতঃ সোভিয়েটের সাহায্য ও সক্রিয় সহানুভূতিতে পরিচালিত হইতেছে তাহাতে সংশয়ের অবকাশ মাত্র নাই। ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধী ব্লক গঠনের উদ্দেশ্যে গ্রীসকে গ্রহণ করার পক্ষে সোভিয়েটের আশু প্রয়োজনীয় আরও অন্যান্য হেতু আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্কটকালীন সময়েই সোভিয়েট নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়াছিল যে, পূর্ব ইউরোপের উপর তাহার প্রভাব ও প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়া নিজের নিরাপত্তা বজায় রাখিতে হইলে কৃষ্ণ সাগরীয় প্রণালী সমূহের উপর আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে গ্রীস ও বুলগেরিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টিদ্বয়ের মধ্যে যে গোপনচুক্তি সম্পাদিত হয় তদনুযায়ী সাব্যস্ত হইয়াছিল, গ্রীসকে খণ্ডিত করিয়া ম্যাসিডোনিয়া এবং স্যালোনিকা ও তৎসহ গ্রীসের অবশিষ্টাংশ যুক্ত করিয়া দুইটি স্বতন্ত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন

করা হইবে এবং দার্দেনেলিশ হইবে সোভিয়েটের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন একটী স্বায়ত্তশাসন সম্পন্ন রাষ্ট্র। সে পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হয় ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং বর্তমান গ্রীসীয় গৃহযুদ্ধে তাহাই পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। গ্রীসকে উপলক্ষরূপে নির্বাচন করিবার পক্ষে সোভিয়েটের যুক্তি দ্বিবিধ: প্রথমতঃ, গ্রীসই সম্ভবতঃ সোভিয়েট রাশিয়া হইতে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী সেই স্থান—সোভিয়েট যেখানে নিজের নিরাপত্তা বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত না করিয়া নিয়মিতরূপে সামবিক ও অন্যবিধ সাহায্য প্রেরণ করিতে পারে, দ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েট গ্রীসের উপরে যদি পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে দার্দেনেলিশ প্রণালীর উপর প্রভাব বিস্তার করা তাহার পক্ষে সহজ হইবে এবং তাহার ফলে সোভিয়েট সম্পর্কে তুরস্কের দৃষ্টিভঙ্গী এবং তৎসহ সমগ্র ইউরোপের শক্তির মানদণ্ডের সমতা একরূপভাবে পরিবর্তিত হওযা সম্ভব যাহার দরুণ দার্দেনেলিশ সংক্রান্ত চুক্তিপত্রের আমূল পরিবর্তন সাধিত হইবে।

এই সমস্ত ঘটনা পরম্পরা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ইউরোপীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে স্পেনে যে নাটক অভিনীত হইয়াছিল, গ্রীসে তাহারই পুনরাভিনয়ের উদ্যোগ আয়োজন আরব্ধ। পার্থক্য যাহা কিছু পক্ষাপক্ষ লইয়া: তখন স্পেনে প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল একদিকে জার্মাণী ও ইতালি এবং অপরদিকে সোভিয়েটের মধ্যে এবং বর্তমানে গ্রীসে তাহা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে সোভিয়েট বনাম ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিযোগিতায়। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় স্পেনে সোভিয়েট প্রবর্তিত যে আন্দোলন 'পপুলার ফ্রণ্ট' নাম পরিগ্রহ করিয়াছিল, গ্রীসে তাহাই 'পপুলার ডিমোক্রেসী' নামে পরিচিত হইতেছে। সোভিয়েটের দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত হস্তক্ষেপই স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে 'পপুলার ফ্রণ্ট' আন্দোলনের পরাজয়ের জন্য দায়ী, গ্রীসের গৃহ-যুদ্ধে সোভিয়েটের হস্তক্ষেপ কি তেমনি সঙ্কুচিত হইবে অথবা প্রয়োজনানুরূপ

সহজ ও সচ্ছন্দ হইবে—ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া মনে হয়, সোভিয়েট কৃতকার্যের পরিণতি ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হইয়াই সুনিশ্চিত পরিকল্পনা অনুযায়ী এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। সোভিয়েট প্রভাবিত দেশ সমূহের কর্ম-তৎপরতাই তাহার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ। গ্রীসে গৃহযুদ্ধ ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বুলগেরিয়া ও রুমেনিয়ার সামরিক বিভাগ হইতে অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তিদের অপসারণ কার্য দ্রুততার সহিত সম্পন্ন হইতেছে। যুগোশ্লাভিয়া যদি গ্রীসের বিদ্রোহী গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রে তাহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য মার্শাল টিটো তুরস্কের যুগোশ্লাভ রাষ্ট্রদূত মিঃ বোজিন সিমিককে যুগোশ্লাভিয়ায় আসিবার জন্য জরুরী আহ্বান প্রেরণ করিয়াছেন। মিঃ সিমিক যুগোশ্লাভিয়া যাত্রার প্রাক্কালে এক সাংবাদিক সম্মেলনের সম্মুখে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি গ্রীক গভর্ণমেণ্টকে বর্তমান হারে সামরিক সাহায্য ও সাজসরঞ্জাম প্রেরণ করিতে থাকেন, তাহা হইলে যুদ্ধ অনিবার্য এবং সেক্ষেত্রে যুদ্ধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বর্তাইবে যুক্তরাষ্ট্রের উপরেই। পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্র এ আহ্বান স্বীকার করিয়া লইয়াই ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে বৃহত্তম রণপোত বহর প্রেরণ করিয়াছে। রাজনৈতিক দাবার ছক প্রসারিত হইয়াছে এবং গুটী সজ্জিত হইয়া সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করিতেছে: এখন প্রশ্ন হইতেছে খেলা আরম্ভ করিবার জন্য ব'ড়ের চাল অগ্রে টিপিবে কোন্ পক্ষ?

সিরিয়ার সামরিক অভ্যুত্থান

সিরিয়ার শাসন ব্যবস্থায় সহসা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে : গত ৩০শে মার্চ তারিখে দামাস্কাস বেতারযোগে ঘোষিত হয় যে, সিরিয়ার সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্ণেল হুসনী জাইম সেনাদলের সাহায্যে পূর্বদিন মধ্যরাত্রে শাসন ক্ষমতা হস্তগত করিয়া নিজেকে ডিক্‌টেটাররূপে ঘোষণা করিয়াছেন। লেবানন ও ইজরাইলের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি স্বাক্ষরিত হইবার ফলে যে সব সৈন্যদল লেবাননের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সম্প্রতি দামাস্কাসে স্থানান্তরিত হইয়াছে, এই সামরিক অভ্যুত্থানে প্রধান অংশ গ্রহণ করে তাহারাই। ২৯শে মার্চ তারিখের মধ্যরাত্রে সেনাদল অতর্কিতে রাজ-ধানীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বিদ্যুৎবেগে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী স্থান ও ভবনগুলি অধিকার করে এবং সমগ্র মন্ত্রিপরিষদকে বন্দী করিয়া অজ্ঞাত স্থানে পৃথক পৃথক ভাবে অপসারিত করে। অভ্যুত্থান এমন দ্রুততা ও নিপুণতার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল যে, বস্তুতঃ রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই সর্বত্র সামরিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় এবং ৩০শে মার্চ প্রাতঃকালে দামাস্কাস রেডিও সামরিক অভ্যুত্থানের সংবাদ ও তাহা সংঘটিত হইবার হেতুর কথা দেশময় প্রচার করিতে থাকে। এইরূপ বিনা প্রতিরোধে ও শোণিতপাত ব্যতিরেকে প্রাক্তন শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটিল এবং বিশ্বস্ত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে কর্ণেল জাইম শাসন ক্ষমতা হস্তগত করিলেন।

শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক ডিক্‌টেটার কর্ণেল হুসনী জাইম বেতারযোগে তাঁহার প্রথম ঘোষণা প্রচার করিয়া বলেন,

শক্তিলোলুপতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন নাই, করিয়াছেন দেশের দ্রুত অবনতিশীল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া এবং রাষ্ট্র ও জনসাধারণকে তথাকথিত জাতীয়তাবাদীগণের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে। পরিশেষে তিনি এই বলিয়া প্রথম ঘোষণার উপসংহার করেন যে, যতদিন না যথারীতি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, অন্ততঃ ততদিনের জন্য সামরিক একনায়কত্ব বলবৎ থাকিবে। দ্বিতীয় ঘোষণা দ্বারা সমগ্র সিরিয়ার সামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সংবাদ ঘোষিত হয় এবং ইহাও প্রচারিত হয় যে, প্রতিটি পল্লীতে ও নগরে সকাল ছয়টা হইতে পুনরাদেশ প্রদত্ত না হওয়া পর্যন্ত সান্ধ্য আইন জারী করা হইল। তৃতীয় ঘোষণার দ্বারা এই মর্ম্মে এক আদেশ প্রচারিত হইল, যদি কেহ অস্ত্র বহনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহার প্রতি চরম দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইবে।

সামরিক প্রভুত্ব সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র কর্ণেল জাইম সিরিয়ার পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও প্রবর্তনের জন্য প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ফারিস এল খৌরীর সহিত আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, যতশীঘ্র সম্ভব একটি নূতন শাসনতন্ত্র ও একটি নূতন নির্বাচনী আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এক কমিটি গঠন করিয়া তৎসংক্রান্ত সমুদয় দায়িত্ব তাহার হস্তে অর্পন করা হইয়াছে। সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত ও সাফল্যমণ্ডিত হইবামাত্র কর্ণেল হুসনী জাইম সে সংবাদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিষদের গোচর করিয়াছেন এবং তৎসহ জাতিপুঞ্জ পরিষদের প্রতি বর্তমান সামরিক গভর্ণমেণ্টের অকুণ্ঠ আনুগত্যও নিবেদিত হইয়াছে। প্রাক্তন সিরিয়া সরকারের সহিত অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট সমূহের ইতিপূর্বে যে সব সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, কর্ণেল জাইম সে সমুদয়ের মর্যাদা রক্ষার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন এবং সদ্য সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থানকে

নিছক ঘরোয়া ব্যাপার রূপে বর্ণিত করিয়া দৃঢ়তা সহকারে ইহাও জানাইয়া দেন যে, শাসনতান্ত্রিক এই পরিবর্তনের দ্বারা সিরিয়ার বৈদেশিক নীতি আদৌ প্রভাবিত হইবে না।

যদিও প্রাক্তন গভর্ণমেণ্টের দুর্নীতি ও অনাচার এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের অবনতি প্রভৃতি ব্যাপারকে সামরিক অভ্যুত্থানের হেতুরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তথাপি পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রকৃত হেতু আরও গভীরতর তলদেশে নিহিত রহিয়াছে। যুদ্ধ-বিরতির জন্য সিরিযার সহিত ইজরাইলের যে আলোচনা আরম্ভ হয়—কিছুদিন যাবৎ তাহার বিরুদ্ধে গোঁড়া জাতীয়তা-বাদীদের পক্ষ হইতে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হইতে থাকে এবং লেবাননের সহিত ইজরাইলের আপোষ-রফার ফলে লেবানন-যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত সিরিয়ার সৈন্যবাহিনী সেই বিক্ষোভের অন্যতম লক্ষ্যরূপে নিন্দিত ও নিগৃহীত হয়। কর্ণেল জাইম যে উগ্র জাতীযতাবাদীগণের হাত হইতে দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দান করেন—সম্ভবতঃ তাহারাই এই বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীর দল এবং ইজরাইলের সহিত ইহাদের আপোষবিরোধী মনোভাবের দ্বারা প্রাক্তনমন্ত্রী পরিষদ হয়তো কিছুটা পরিমাণে প্রভাবিত হইযা থাকিবে। তাহা ছাড়া, 'বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃসঙ্ঘ' নামে যে জাতীয়তাবাদী দলটি কিছু দিন হইতে মিশরেও গোপন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে রত রহিয়াছে, সিরিয়াতে এই জাতীয়তাবাদীদলের সহিত তাহাদের সম্পর্কের সম্ভাবনা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। যে শাসন পরিষদকে আশ্রয় করিয়া সিরিয়ার এই দলটি শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল, কর্ণেল জাইম যথাসময়ে ও যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত তাহার বিলোপ সাধন করিলেন এবং তাহার স্থলে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইলেন এমন এক শাসন-ব্যবস্থা—যাহা গঠিত হইবে গণতান্ত্রিক

আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া এবং পরিচালিত হইবে ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ প্রগতিশীল রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের অনুপ্রেরাণয়। কর্ণেল জাইম যদিও স্পষ্টাক্ষরেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রপরিবর্তনের ফলে সিরিয়ার বৈদেশিক নীতি আদৌ পরিবর্তিত হইবেনা, তথাপি একটি বিশেষ পরিবর্তন সূচনাতেই লক্ষিত হইতেছে এবং তাহা হইল—তুরস্কের প্রতি অনুরক্তির আতিশয্য। প্রগতিশীলতার দিক হইতে তুরস্ক মুসলিম রাষ্ট্র-সমূহের শীর্ষস্থানীয়। কাজেই প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে সিরিয়া যে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে—ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আদর্শগত এই ঐক্য ব্যতীত অন্য কোন হেতু কি ইহার পশ্চাতে নিহিত নাই? ট্রান্সজর্ডানের রাজা আবদুল্লা সিরিয়া ও ট্রান্সজর্ডানের সমবায়ে বৃহত্তর সিরিয়া গঠনের যে প্রস্তাব ইতিপূর্বে উত্থাপন করেন—তুরস্কের প্রতি এই অনুরক্তির আতিশয্য কি তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক বিরহিত? সিরিয়ার পরবর্তী ঘটনাবলী এ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিবে।

এই সূত্রে সিরিয়ার অতীত ইতিহাসের পর্যালোচনা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। দুইটি মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে সিরিয়া ছিল ফ্রান্সের অধীন ম্যাণ্ডেট শাসিত রাজ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভিসি সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ইহা অধিকৃত হয় এবং ১৯৪১ সালে বৃটিশ ও স্বাধীন ফরাসী সেনাদল ভিসি বাহিনীকে বিতাড়িত করিলে সিরিয়া যদিও ভিসি শাসন হইতে মুক্ত হয়, তথাপি পরিপূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে তাহার আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া যায়। অতঃপর সিরিয়া হইতে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য অপসারণের দাবী দিনে দিনে প্রবলতর হইয়া উঠিতে থাকে। ইঙ্গ-ফরাসী এক সামরিক প্রতিনিধিদল নবজাগ্রত এই দাবী সম্বন্ধে আলোচনার জন্য প্যারিসে সম্মিলিত হন ১৯৪৬ সালে এবং স্থির হয়, বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যদল সিরিয়া ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিবে ১৯৪৬ সালের ১১ই মার্চ হইতে এবং ৩০শে এপ্রিল তারিখের মধ্যে ত্যাগপর্ব সম্পন্ন

করিতে হইবে। তদনুযায়ী ১৫ই এপ্রিল তারিখের মধ্যে সৈন্যাপসারণ কার্য সমাপ্ত হয় এবং সিরিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে তাহার স্বাধীনতা উৎসব সম্পন্ন করে ১৭ই এপ্রিল। অতঃপর সিরিয়ার মুদ্রানীতি ফরাসী ফ্রাঙ্কের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ জাতীয় মুদ্রানীতিতে পরিণত হয়। সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে যে মন্ত্রিপরিষদ সদ্য বিলুপ্ত হইল, প্রায় পক্ষকালব্যাপী শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের পর তাহা গঠিত হইযাছিল ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু আদর্শ ও কর্মপন্থাগত বিরোধের আবর্তে পড়িয়া অত্যল্প সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় মঞ্চ হইতে তাহাকে অপসারিত হইতে হইল। সিরিয়ার ঘটনাস্রোত অতঃপর কোন খাতে প্রবাহিত হয়—বিশ্বের রাজনীতিক মহল গভীর আগ্রহের সহিত তাহা লক্ষ্য করিবে।

আণবিক শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ

যদিও তখনও স্পষ্টতঃ জার্মাণীর প্রতিকূলে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের মোড় ফেরে নাই, তথাপি নব নব যুদ্ধক্ষেত্রে জার্মাণ বাহিনীর নিত্য নব বিজয় অর্জনের পালা তখন প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া প্রচণ্ড জার্মাণ আক্রমণের প্রথম আতঙ্ক ও বিহ্বলতা কাটাইয়া উঠিয়াছে। তাহারা তাহাদের বিরাট জনবল ও বিপুল রণসম্ভার সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মিলিত করিয়া চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় হিটলারের পক্ষে শত্রুপক্ষীয়

সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য প্রচণ্ডতর ধ্বংসাত্মক কোন নূতন মারণ অস্ত্রের সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। তিনি তাহা হইয়াছিলেনও। তাহা প্রমাণিত হয় তাঁহার তৎকালীন ভাষণের অংশ বিশেষ হইতে। হিটলার একদা এক ভাষণ প্রসঙ্গে কতকটা স্বগতভাবেই বলিয়াছিলেন, "যুদ্ধের শেষ কয়দিন আমি যে ভীষণ মারণাস্ত্র ব্যবহার করিব—ভগবান যেন তাহার জন্য আমাকে মার্জনা করেন।" কি সে মারণাস্ত্র তাহা জনসাধারণ না জানিলেও মিত্রপক্ষীয় সামরিক বিভাগ সম্ভবতঃ বুঝিয়াছিলেন যে, জার্মাণ বৈজ্ঞানিকগণ আণবিক শক্তি লইয়া গবেষণারত। কাজেই মেঘনাদকে যদি আক্রমণ ও নিহত করিতে হয়, তাহা হইলে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই যজ্ঞশালায় তাহাকে আক্রমণ করিতে হইবে, নতুবা প্রার্থিত মহাশক্তি যদি একবার তাহার করায়ত্ত হয়, তাহা হইলে পরাজয় ও তৎসহ সর্ব্বনাশ অনিবার্য ; তাই পূর্বদিক হইতে সোভিয়েট এবং পশ্চিম হইতে বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স যুক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী সর্বশক্তি লইয়া জার্মাণীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। জার্মাণী সে আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করিল বিজেতৃগণের নিকট। ফলে জার্মাণ বৈজ্ঞানিকগণের আরব্ধ গবেষণা অসমাপ্ত রহিয়া গেল এবং যে অমোঘ মারণাস্ত্র ব্যবহারের জন্য হিটলার ভগবানের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা কার্যতঃ ব্যবহার করিবার পাপ তাঁহাকে অর্জন করিতে হইল না। কে জানে—হিটলার-পরিকল্পিত অস্ত্র আণবিক মারণাস্ত্র কি না, কে জানে—বন্দী জার্মাণ বৈজ্ঞানিকগণ আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ায় বসিয়া তাঁহাদের অসমাপ্ত গবেষণাকার্য সম্পন্ন করিলেন কিনা!

জার্মাণী আত্মসমর্পণ করিলেও জাপান তখনও পর্যন্ত যুদ্ধরত। কিন্তু চতুঃশক্তি পরিবেষ্টিত একক জাপানের পরা .য়ের জন্য যে মার্কিণ অস্ত্র-শালায় সঙ্গোপনে সর্বধ্বংসী মহাস্ত্র নির্মিত হইতেছে, তাহা সেদিন কেহ

কল্পনাও করিতে পারে নাই। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখে অকস্মাৎ ঘোষণা করিলেন সেইদিন প্রাতে জাপানের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র হিরোশিমায় প্রথম আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ধ্বংসকাণ্ডের ধূলি ও ধূমকুণ্ডলী মিলাইয়া যাইতে দুইদিন সময় লাগিল এবং তাহার পর পর্যবেক্ষণরত মার্কিণ বিমান শূন্য হইতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, দশ বর্গ মাইলব্যাপী নগরীর প্রায় চারিবর্গ মাইল-পরিমিত স্থান সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, ধ্বংস-কার্যের পরিধি তাহারও বাহিরে আরও বহুদূর বিস্তৃত। দ্বিতীয় এবং অধিকতর শক্তিশালী আণবিক বোমা জাপানের জাহাজ ও সমর-সম্ভার-নির্মাণ-কেন্দ্র নাগাসাকির উপর নিক্ষিপ্ত হয় ৯ই আগষ্ট তারিখে। দুইটি মাত্র বোমার আঘাতজনিত ধ্বংসকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিযা জাপান বুঝিল, অতঃপর যুদ্ধ পরিচালনা আত্মহত্যারই নামান্তর মাত্র, সে আত্মসমর্পণের আবেদন দাখিল করিল ১০ই আগষ্ট। জাপান পরাজিত হইল বটে, কিন্তু আণবিক বোমা নির্মাণ ব্যাপারে কার্যতঃ সংশ্লিষ্ট মার্কিণ, বৃটেন ও ক্যানাডা সেই মহামারণাস্ত্রের ব্যবহারজনিত নৈতিক ভীতি ও বাস্তব ভয়াবহতার আঘাত কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। তাহারা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিল, আণবিক বোমার গোপন তথ্য আজ যদিও কেবলমাত্র তাহাদেরই করায়ত্ত, তথাপি সে গোপনীয়তা অন্যান্য শক্তির নিকট অধিকদিন অবিদিত থাকিবে না, তাহারা সহস্তে যে মারণাস্ত্র আজ জাপানের উপর প্রয়োগ করিল, কাল সে অস্ত্র অপর যে কোন শক্তির দ্বারা তাহাদের উপর প্রযুক্ত হইতে পারে। ১৯৪৫ সালের ১৫ই নবেম্বর তারিখে মিঃ ট্রুম্যান, মিঃ এটলী ও মিঃ ম্যাকেঞ্জী কিং ওয়াশিংটনে সমবেত হইয়া প্রস্তাবের আকারে এক যৌথ ঘোষণা প্রচার করিলেন। তাহাতে তাঁহারা বলিলেন যে, ধ্বংসাত্মক কার্যে আণবিক শক্তির ব্যবহার যাহাতে সম্পূর্ণ বন্ধ হয় এবং শিল্পোন্নয়ন ও

অন্যান্য জনহিতকর কার্যে তাহা ব্যবহৃত হয়, সেই উদ্দেশ্যে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনে একটি কমিশন গঠন করা হোক।

অতঃপর ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স—এই ত্রিশক্তির পররাষ্ট্র সচিবদের এক সম্মেলন মস্কোতে আহূত হয়। এই সম্মেলনেই আণবিক কমিশন গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইল। পরে ফ্রান্স, চীন ও কানাডা তাহাদের সহিত যুক্ত হইয়া সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় এই সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করে, ১৯৪৬ সালের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্য ও কানাডাকে লইয়া যে আণবিক শক্তি কমিশন গঠিত হয় ১৯৪৬ সালের ১৪ই জুন তারিখে নিউইয়র্কে তাহার প্রথম অধিবেশন আহূত হয়। আলোচনার ভিত্তি রচনার উদ্দেশ্যে কমিশনের সম্মুখে নিম্নলিখিত দুইটি পৃথক প্রস্তাব উপস্থাপিত হইল :

(১) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রস্তাবিত বারুচ-পরিকল্পনা :—এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল, এমন একটি আন্তর্জাতিক আণবিক এজেন্সী গঠন করা—আণবিক অস্ত্রের খণিজ উপাদান আহরণ হইতে আরম্ভ করিয়া নির্মাণ কার্যের প্রতিটি পর্যায় নিয়ন্ত্রণ করা যাহার পক্ষে সম্ভব হইবে। আণবিক শক্তি-ব্যবহারের ব্যাপারে এই এজেন্সীর অনুমতি দানের অধিকার ভিটো প্রয়োগ দ্বারা কোনক্রমেই খর্ব করা চলিবে না ;

(২) সোভিয়েট পরিকল্পনা :—এই পরিকল্পনার মোটামুটি কথা হইল, আণবিক অস্ত্র-নির্মাণ নিষিদ্ধ ও নির্মিত অস্ত্রসম্ভার বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে অচিরে একটি কন্‌ভেনশন আহ্বান করিতে হইবে।

পরস্পর বিরোধী এই দুইটি প্রস্তাব, তাহাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও টীকা-ভাষ্য লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে যে তুমুল বিতণ্ডা সুরু হইল—শত

চেষ্টাতেও তাহার আপোষ রফা সম্ভব হইল না। এই বিরোধ আণবিক-শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পথে আজও অনতিক্রম্য অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। মার্কিণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোভিয়েটের আপত্তির সারমর্ম এই যে, আমেরিকার হাতে যে নির্মিত আণবিক অস্ত্রসম্ভার মজুত আছে, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই সে আণবিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বলবৎ করিতে চায়। তাহার গোপন উদ্দেশ এই যে, এই ব্যবস্থার কল্যাণে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যখন আণবিক অস্ত্র নির্মাণের অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবে, মার্কিণ সমর-বিভাগ তখন মজুত মারণাস্ত্র তাহাদের মাথার উপর উদ্যত করিয়া সচেষ্ট হইবে সমগ্র বিশ্বের উপরে একচ্ছত্র মার্কিণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে। সোভিয়েট রাশিয়া সম্ভবতঃ তখনও আণবিক শক্তি সম্পর্কিত গবেষণা সম্পন্ন করিযা উঠিতে পারে নাই। কাজেই মার্কিণ অভিপ্রায় সম্বন্ধে তাহার মনে এই ধরণের সংশয় জাগ্রত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে সোভিয়েট পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মার্কিণ কর্তৃপক্ষ এই আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, আণবিক শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোরভাবে প্রযোগ না করিয়া নির্মিত অস্ত্র নষ্ট করাই সোভিয়েটের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু একথা স্বীকার করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন যে, নির্মিত অস্ত্র নষ্ট হইলেই পুনর্নির্মানের পথ রুদ্ধ হইবে। পুনর্নির্মানের পথ বন্ধ করিতে হইলে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক আণবিক অস্ত্র নির্মাণ পদ্ধতির প্রতিটি পর্যায় নিয়মিতরূপে ও পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে পরীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। সোভিয়েট রাশিয়া যদি প্রস্তাবিত নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পরীক্ষা করিবার অবাধ অধিকার স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে মজুত অস্ত্র-সম্ভার কমিশনের হাতে সমর্পণ করিতে আমেরিকা কোন আপত্তি করিবে না। কিন্তু বিরোধী পক্ষদ্বয়ের কেহই স্ব স্ব ক্ষেত্র হইতে স্বল্পমাত্র সরিয়া দাঁড়াইতেও সম্মত হইলেন না। ফলে আণবিক

শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আলোচনা শেষ পর্যন্ত অচল অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

পক্ষদ্বয়ের মধ্যে মৌলিক মতবিরোধ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কমিশনের কাজ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্থগিত হইল না। নিতান্ত মন্থর গতিতে হইলেও সে কাজ অভিষ্ট পথে অগ্রসর হইবার জন্য সচেষ্ট হইতে লাগিল। কমিশন তাহার প্রথম বিবরণী প্রকাশ করিল ১৯৪৬ সালে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে। প্রকাশিত বিবরণের মর্ম হইল এই যে, আণবিক শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কার্যতঃ সম্ভবপর এবং সে শক্তি যাহাতে ধ্বংসাত্মক কার্যে ব্যবহৃত হইতে অথবা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গোপনে অপসারিত হইতে না পারে, তজ্জন্য নির্মাণ পদ্ধতির প্রতিটি পর্যায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বলবৎ হওয়া উচিত। কমিশনের দ্বিতীয় বিবরণী নিরাপত্তা পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত হইল ১৯৪৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর। যে দুইটি মুখ্য বিষয় উক্ত বিবরণীতে স্থান লাভ করিল— তাহার একটি হইল পূর্ব-প্রস্তাবিত সোভিয়েট পরিকল্পনার কিঞ্চিৎ পরিবর্ধিত সংস্করণ এবং অপরটি, সংখ্যাধিক্যের দ্বারা গৃহীত মার্কিণ প্রস্তাব ও তাহা কার্যকরী করিবার পক্ষে কয়েকটি নির্দেশাত্মক ধারার সন্নিবেশ। ১৯৪৮ সালের ১৭ই মে তারিখে কমিশন কর্তৃক পক্ষে ৯ ও বিপক্ষে ২ ভোটে তৃতীয় বিবরণী গৃহীত হইল। কমিশন উক্ত বিবরণীর মারফতে প্রস্তাব করিলেন, কমিশনের স্থায়ী সদস্য-গণের মধ্যে যতক্ষণ না পূর্বাহ্নে অনুষ্ঠিত আলাপ-আলোচনার সাহায্যে মতৈক্যের ভিত্তি রচিত হয়—ততক্ষণ পর্যন্ত কমিশনের তৎপরতা স্থগিত রাখা হোক। কারণ, আণবিক নিয়ন্ত্রণ-ক্ষেত্রের ঐকমত বৃহত্তর রাজনীতি-ক্ষেত্রে যে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল বর্তমানে তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয় না। প্রস্তাবে ইহাও উল্লিখিত হইল যে, এই বিবরণী ও তৎসহ পূর্ব প্রচারিত বিবরণী দুইটিও বিশেষ

বিচার্য বিষয়রূপে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে।

কমিশনের বিবরণী আলোচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইল ১৯৪৮ সালের ১১ই জুন তারিখে। মার্কিণ কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব করিলেন, কমিশনের প্রথম ও তৃতীয় বিবরণীর অন্তর্গত তথ্য ও সুপারিশসমূহ পরিষদ সমর্থন করুন, কিন্তু দ্বিতীয় বিবরণী সম্বন্ধে আনীত বিশেষ প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়া কর্তৃক ভিটো প্রযুক্ত হওয়ায় তাহা পরিত্যক্ত হইবার উপক্রম হইল। ইঙ্গ-মার্কিণ কর্তৃপক্ষ আণবিক শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে এমন এক স্থানে স্থাপিত রাখিতে চাহিয়াছিলেন—যেখানে ভিটো প্রয়োগ দ্বারা তাহার কার্য ব্যাহত করিবার কোন সুযোগ থাকিবে না। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার জিদ হইল তাহাকে উপর্যুপরি ভিটো প্রহার-প্রপীড়িত নিরাপত্তা পরিষদে আনয়ন করা। শেষ পর্যন্ত তাহা আনীত হইল এবং পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ সোভিয়েট ভিটো সম্বন্ধে যে আশঙ্কা পোষণ করিতেছিলেন তাহা কার্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না। পরিষদ-সভাপতি ঘোষণা করিলেন, মার্কিণ প্রস্তাব যেহেতু কার্য-বিধি সম্পর্কিত এবং মৌলিক কোন ব্যাপার-সম্পর্কিত নয়, অতএব তাহা আইনতঃ ভিটোর অধীন হইবার অযোগ্য। কাজেই নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনা ও মন্তব্য সম্বলিত তিনটি বিবরণই সাধারণ পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার জন্য ক্যানাডা যে প্রস্তাব আনয়ন করে—তাহা নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক ৯—০ ভোটে গৃহীত হইল।

ক্যানাডার প্রস্তাব অনুযায়ী বিষয়টি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার সম্মুখে উপস্থাপিত হইলে, সভা কর্তৃক তাহা আলোচনার জন্য গৃহীত হইল ১৯৪৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে যে সকল বাধার সম্মুখীন হইয়া আলোচনা অগ্রসর হইতে পারে

নাই,এখানেও তৎসমুদায় অপসারিত হইবার কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। ফলে আলোচনার ধারা প্রতিপদে ব্যাহত হইতে হইতে শম্বুকগতিতেই অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন পর্যন্ত যে ছয়টি প্রস্তাব পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত ছিল, সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি সাব কমিটি গঠিত হইল ৭ই অক্টোম্বর তারিখে। ১৮ই অক্টোবর রাজনৈতিক কমিটি কর্তৃক উক্ত সাব-কমিটির বিবরণী আলোচনার্থ গৃহীত হইল এবং আলোচনান্তে কমিটি সোভিয়েট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ও কিঞ্চিৎ সংশোধিত আকারে ক্যানাডার প্রস্তাব অধিকসংখ্যক ভোটে গ্রহণ করিলেন। সংশোধিত ক্যানাডীয় প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের সম্মুখে স্থাপিত হইল ৪ঠা নবেম্বর তারিখে এবং সেখানেও আলোচনান্তে সংশোধিত ক্যানাডীয় প্রস্তাব গৃহীত ও সোভিয়েট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যখন ভোটাধিক্যের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইলেন না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এক প্রস্তাব আনয়ন করিলেন। সে প্রস্তাবের মর্ম এই যে, প্রস্তাবক পক্ষগণ যতক্ষণ না বলিতেছেন যে, তাঁহাদের মধ্যে সঙ্গতি সাধনের সম্ভাবনা বর্তমান—ততদিন পর্যন্ত কমিটির অধিবেশন স্থগিত রাখা হোক। আলোচনা শেষে সোভিয়েট রাশিয়া ব্যতীত বাকী স্থায়ী সদস্যগণ পরিষদের সম্মুখে এক বিবরণী দাখিল করিলেন। তাহার মর্ম এই যে, কমিশন স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে পরিপূর্ণ সঙ্গতি সাধন করিতে সক্ষম না হইলেও, পূর্বের অসঙ্গতি কিছু পরিমাণে বিদূরিত করিতে পারিয়াছেন। তখন পর্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে মতগত যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা হইল এই যে, সোভিয়েট রাশিয়া ব্যতিরেকে আর সকল স্থায়ী সদস্যই বিশ্বশান্তিকে সর্বোপরি স্থাপন করিয়া তাহাকে অগ্রাধিকার দান করিতে সম্মত। কিন্তু সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট কোন কারণেই তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় সার্ব্বভৌমত্ব অণুমাত্র সঙ্কুচিত করিতে প্রস্তুত নহেন।

ইতিমধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ায় বিদীর্ণ আণবিক বোমা ১৯৪৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে সশব্দে ঘোষণা করিয়া দিল যে, আণবিক রহস্য সোভিয়েটের নিকট আর দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকা নয়। বহু বাক্-বিতণ্ডার পর ১৯৫০ সালের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে আণবিক শক্তি কমিশনের স্থায়ী সদস্যদের যে সভা আহূত হয়, জাতীয় চীনের প্রতিনিধির উপস্থিতির প্রতিবাদে সোভিয়েট প্রতিনিধি তাহা বর্জন করিয়া বাহির হইয়া যান। সোভিয়েটের অসহযোগিতার দরুণ তদবধি কমিশনের পথে যে বাধা সৃষ্ট হইয়াছে, আজও তাহা দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় রূপে একই স্থানে দণ্ডায়মান। অবস্থা উপলব্ধি করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আণবিক বোমা হইতে বহুগুণে বিধ্বংসী মারণাস্ত্র আবিষ্কারে মনোনিবেশ করিলেন। অচিরে হাইড্রোজেন বোমার অস্তিত্ব সম্ভাবনা আত্মপ্রকাশ করিল এবং প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ১৯৫০ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে ঘোষণা করিলেন, হাইড্রোজেন বোমা ও অতিকায় হাইড্রোজেন বোমা সমেত আণবিক শক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়মিত গবেষণা চালাইবার জন্য মার্কিণ আণবিক শক্তি কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আণবিক শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্কল্প লইয়া যে কার্যের সূচনা হয়—তাহা সমাপ্তি লাভ করিল—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উন্নততর মারণাস্ত্র নির্মাণের অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতায়। সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার হইল এই যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে নীরব সাক্ষিরূপে সে প্রতিযোগিতা প্রত্যক্ষ করিতে হইতেছে। আতঙ্ক বিহ্বল বিশ্ব আসন্ন বিনাশের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য আবেদন জানাইবে কাহার নিকট!
